আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

ইসলামী জীবন বিধান

তরজমায়

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

(9) دستورِ حیات از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: مولانا فرید الدین مسعود

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামী জীবন বিধান

মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

প্রকাশকাল

অগ্রায়হণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

মহরম, ১৪৩৪ হিজরী

ডিসেম্বর, ২০১২ ঈশায়ী

প্রকাশক

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ফোনঃ ০২-৭১২-১১২১; মোবাঃ ০১৮২২-৮০৬১৬৩

অক্ষর সংযোজনে

মারজিয়া কম্পিউটারস্

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে

মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস

৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৮৩৫৮৩৪৯

প্রচ্ছদ

সালসাবীল, ফোন ঃ ০১৭১-২৬৬৮৪৫

ISBN: 978-984-90178-6-8

মূল্য ঃ ১৮০.০০ (একশত আশি) টাকা মাত্র

ISLAMER ZIBAN BIDHAN (DASTUR-E-HAYAT) : The Islamic Code of Life, written by Allama Syeed Abul Hasan Ali Nadavi in Urdu, translated by Moulana Farid Uddin Maswood into Bengali and published by Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka—1100, Printed by M/S. Tawakkal Press,, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.

Price : Taka 180.00 Only

Phone: 02-712-1121; Cell: 01822-806163

E-mail: roufster@gmail.com Web site: www.muhammagbrothers.com

উৎসর্গ

ফারহানা চৌধুরাণীকে

—মাসউদ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মানব জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে ইসলামী দর্শন। এ বসুন্ধরায় মানব জীবন বড়ই কন্টকাকীর্ণ। জীবন প্রবাহে নানা জঞ্জাল ও পদস্খলনের সম্ভাব্য অন্তরায় মানব জীবনকে করে তোলে দিকভ্রান্ত। জীবন পরিক্রমায় মানুষ বড়ই অসহায়। সে আত্মরক্ষার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী। তার এই পরমুখাপেক্ষিতা তাকে সঠিক পথে চলার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। তবে মানুষের স্রষ্টা পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক পথে পরিচালনার জন্য হিদায়াতের মশাল সহকারে যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর এই হিদায়াতের ধারাবাহিকতার পরিপূর্ণতা লাভ করে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের ফলে।

মানব জীবনে এমন কোন শাখা-প্রশাখা নেই যেখানে রাসূল করীম (সা)-এর আদর্শিক কর্মপন্থা ও চিন্তা-চেতনার স্থান নেই। রসূলের জীবনচরিত অনুপম আদর্শে ভরপুর। এই সর্বংসহা মেদিনীর বুকে অনাগত কালের মানব-গোষ্ঠীর জন্য জীবন নির্বাহের পাথেয় হিসাবে তিনি উপস্থাপনা করে গেছেন একটি কালজয়ী আদর্শ। দেশ-কাল, জাতি-বর্ণ-গোত্র ও ভৌগোলিক সীমারেখা নির্বিশেষে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত তাঁর এই আদর্শ। ইহ্ ও পারলৌকিক জীবনধারায় তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ যেমন কার্যকর, তেমনি ফলপ্রসূ। এর গণ্ডীর বাইরে মানব কল্যাণের চিন্তাও করা যায় না। হিদায়াতবঞ্চিত দিশেহারা মানবকুলকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার নিমিত্ত অনুকম্পাময় আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তিরোধানের সাথে সাথে নবুওয়াত ও রিসালতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর নবীদের উত্তরাধিকারী হিসাবে হক্কানী 'আলিম সম্প্রদায় আল্লাহ্প্রদত্ত দীনের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এসব সংস্কারধর্মী মহাপুরুষের অক্লান্ত সাধনা,

ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর বদৌলতে ইসলাম আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-তাঁর জীবনকে ঘিরে রেখেছিলেন ইসলামী সংস্কার আন্দোলন ও তাহযীব-তমদ্দুনকে জিইয়ে রাখার জন্য। ইসলামী জীবনধারার সাথে তাঁর জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ছিল। ইসলামী জীবন বিধান (দস্তুর-ই হায়াত) নামক পুস্তিকায় তিনি ইসলামী আদর্শকে অতি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। বর্তমান বাত্যা-বিক্ষুব্ধ বিশ্বের বস্তুবাদী দর্শনের মরীচিকার কবলে দিশেহারা মানব জাতির সামনে তিনি উপহার দিয়েছেন 'ইসলামী জীবন বিধান' নামের অনবদ্য এ পুস্তকটি।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা অত্র পুস্তকটির প্রকাশনার কাজ হাতে নিয়ে মুসলিম সমাজের কাছে উপহার দিয়েছে একটি সোনালী সওগাত। পুস্তকটি যাতে সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হয় এবং এটি অধ্যয়ন করে পাঠক সমাজ তাদের আত্মার খোরাক হাসিল করতে পারেন–এটাই পরম কামনা।

আল্লাহুম্মা আমীন!

প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

ইসলাম সকল মানুষের জন্য একমাত্র মনোনীত দ্বীন। এর বাইরে মানুষের কোথাও কল্যাণ নেই। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে রাসূল (সা) পর্যন্ত আম্বিয়া-কিরামের এক মহান ধারা দুনিয়াতে এসেছিলেন এরই হিদায়াত নিয়ে। আখিরী নবী রাসূল (সা)-এর এসে ঘটেছিল এই ধারার পূর্ণতা। কুরআন হচ্ছে আখিরী কিতাব আর রাসূল (সা) হচ্ছেন আখিরী নবী। তাঁর পর নতুন কোন দ্বীন বা নয়া কোন নবীর আগমন ঘটবে না কখনও।

ইসলাম ও ইসলামের মৌলিক আকায়িদ ও আমল সম্পর্কে জানা, যারা হিদায়াত পেতে চায়, তাদের সকলের জন্যই জরুরী। এই উদ্দেশে প্রতি যুগেই 'আলিম ও মুসলিম সংস্কারগণ যুগোপযোগী মন-মানসিকতার প্রেক্ষিতে সহজ সরলভাবে ইসলামকে তুলে ধরার জন্য সংক্ষিপ্ত, অথচ পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেছেন। এই মহান মনীষীদের মধ্যে হযরত ইমাম ইব্নে তায়মিয়া, ইমাম গাযালী, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান যুগ, যে যুগ আমরা অতিবাহিত করছি, বিভিন্ন কারণে বহু জটিলতা নিয়ে তা আমাদের সামনে আজ প্রতীয়মান। বর্তমান যুগের মন-মানসিকতা ঠিক তদ্রূপ নেই যেরূপ ছিল এক'শ দু'শ বছর আগে। সুতরাং যুগ-মানসের প্রেক্ষিতে ইসলামের সত্যতা, যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা সহজ সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত, অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে অনেক দিন থেকে।

এই প্রয়োজনীয়তার ডাকে এগিয়ে এলেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। এই যুগকে তিনি চেনেন ও জানেন খুবই নিকট থেকে। ইসলাম ও আধুনিক যুগ সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন বিপুল ও বিস্তৃত। সারা জীবনের গভীর পড়াশোনা ও যুগ-মানসের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিংড়ে রচনা করেছেন তাঁর ভাষায় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'দস্তুরে হায়াত'।

বিগত ১৯৮৪ ইং সনে তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে। সে সময় তাঁর লেখা 'শিরক ও বিদ'আত' বইখানা তিন দিনের মধ্যে অনুবাদ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপিয়ে সফর শেষ হওয়ার আগেই তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার তওফীক হয়েছিল এই অধমের। তখন তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম রচনা এই বইটিও অনুবাদ করার। আল্লাহর মেহেরবানীতে অল্প সময়ের ভেতরে অনুবাদ কার্য শেষ হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ১৯৮৬ সালে প্রথম তা জাতির সামনে পেশ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

অধমের অক্ষম ও অপটু হাত কতটুকু সফল হয়েছে তা জানি না। তবে ইচ্ছা ও চেষ্টার যে ত্রুটি হয়নি তা বলতে পারি। ত্রুটি ও অপারগতা সব অধমের, পূর্ণতা ও মঙ্গল সব আল্লাহ্‌র।

মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম (বাংলাদেশ) হযরতের বইগুলো অনুবাদ করে প্রকাশের পরম দায়িত্ব নিয়ে 'নবীয়ে রহমত'সহ বেশ কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে এ বইটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করায় মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে শর্তসাপেক্ষ বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে এক্ষণে এ বইটি মুহাম্মদ ব্রাদার্সের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ্ পাক এ বইকে এর প্রকাশের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত সকলের নাজাতের উসিলা বানান এবং সুপ্রিয় পাঠকদের এ থেকে উপকৃত হবার তৌফিক দিন। আমীন!

ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ

সূচীপত্র

ভূমিকা ১৩-২৫

তারবিয়্যাত ও সংস্কারমূলক পূর্ণাঙ্গ অথচ সংক্ষিপ্তাকারে রচিত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা ও আধুনিককালে এই ধরনের নয়া একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা :

ইসলামের মৌল প্রকৃতি ও এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ২৬-৬৩

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস ৬৪-৯০

সঠিক ও বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের মূল উৎস এবং এগুলোর নির্ভরযোগ্য ভিত্তিমূল; ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাসমূহ; তাওহীদ, বিশুদ্ধ দ্বীন ও শির্কের তাৎপর্য; শির্কমূলক কাজ এবং জাহিলী প্রথা ও কুসংস্কারসমূহ; নবী প্রেরণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীব্যাপী শির্কী ভাবধারামণ্ডিত জাহিলিয়াতের উৎখাত সাধন , প্রকাশ্য ও জাহিরী শির্কের গুরুত্ব কম করে দেখা এবং একে উপেক্ষা করা জায়েয নয় ; বিদ'আত, বিদ'আতের অপকারিতা এবং পরিপূর্ণ ও চিরন্তন শরীয়তের সাথে এর বিরোধ।

ইবাদত ৯১-১৪০

ইসলামে ইবাদতের স্থান; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি ; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের সিয়াম (রোযা) পদ্ধতি; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের হজ্জ ও ওমরা পদ্ধতি ; বিশেষ বিশেষ স্থান ও সময়ের যিকির এবং মসনুন দু'আসমূহ; সাধারণ যিকির ও ওয়াজীফা ; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের কতিপয় ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জনাময় দু'আ।

আল্লাহর পথে জিহাদ ১৪১-১৪৯

দ্বীন ও সীরাতে নববীর আলোকে জিহাদ; জিহাদের ফযীলত, এর আদব ও উপকারিতা ; ইসলামের প্রচার ও প্রসার।

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংগঠন ১৫০-১৬৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য; মানুষ গড়ার এক সার্বক্ষণিক কারখানা ; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুমহান ও সর্বব্যাপক গুণাবলী ; এক নজরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্রমাধুরী ; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের শামাইল বা সুন্দরতম আকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতি।

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের রাব্বানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৭০-১৮৯

আধ্যাত্মিক রোগ ও নাফসানী শয়তানিয়াতের প্রতিষেধক ; কতিপয় আয়াত ; কতিপয় হাদীস।

ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের গুরুত্ব ও এর প্রয়োজনীয়তা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এর বৈপরীত্য কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু পরামর্শ।

ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের গুরুত্ব এর প্রয়োজনীয়তা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এর বৈপরীত্য ১৯০-২১৮

ইসলামী জীবন বিধান

ভূমিকা

তারবিয়্যাত ও সংস্কারমূলক পূর্ণাঙ্গ অথচ সংক্ষিপ্তাকারে রচিত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা ও আধুনিককালে এই ধরনের নয়া একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ -

ইসলামের শিক্ষা, মূল্যবোধ ও দীনের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ইসলামের শুরু থেকেই বহু গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও সংকলনের সিলসিলা চলে আসছে। রাজ্যসীমা ও তামাদ্দুনিক উন্নয়নের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমদের জীবনেও সম্প্রসারণ ঘটে এবং এতে রকমারি বিষয়াদির উদ্ভব হয়। নয়া নয়া পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাদের। নব নব সমস্যা, তাদের কমজোরী ও দুর্বলতা, সমাজ জীবনের তাগাদা ও চাহিদা চিন্তাবিদ লেখক ও সচেতন সংস্কারকদের সামনে নয়া নয়ারূপে প্রতিভাত হতে থাকে। ফলে ইসলামী গ্রন্থাগারের পরিধিও দিনে দিনে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। আজ অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমানে একজন মুসলিমের পক্ষে এই ধরনের গ্রন্থাদির ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন এবং এর পরিমণ্ডল নির্ধারণ তো দূরের কথা, যুগের প্রেক্ষিত ও স্বীয় পছন্দ মতো একটা গ্রন্থের নির্বাচন ফল মোটামুটিভাবে এ থেকে উপকার লাভ করাটাও মুশকিল হয়ে পড়েছে।

এই উম্মতের সমস্যাবলী সম্পর্কে যারা গভীরভাবে জড়িত, মুসলিম সমাজ জীবনের আবেগ, প্রেরণার নির্ভুলতা, বিশুদ্ধতা ও এর ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে রয়েছে যাদের সুগভীর ও সত্যাশ্রয়ী সঠিক দৃষ্টি এবং যাঁরা ছিলেন সমকালীন মুসলিম মানস, তাঁদের আবেগ-অনুভূতি, অস্থিরতা, পেরেশানী, তাঁদের চাহিদা ও অন্বেষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের এমন একটি গাইড বুক ও এ বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে যে গ্রন্থটি ইবাদাত ও মু'আমালাত, ব্যবহারিক বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম, নৈতিক বিধি-বিধান ও রীতিনীতিসহ সকল বিষয়ে মুসলিমদের জন্য দিগ্‌দর্শন ও সার্ভিস বুক হিসাবে

কাজ দেবে। এটি এমন এক মানবীয় প্রয়োজন ও স্বভাবগত চাহিদা যা থেকে কোন যুগ, মুসলিমদের কোন জেনারেশন ও অঞ্চল খালি থাকে নি। এর প্রয়োজনীয়তা থেকে তাদের ব্যতিক্রম দেখা যায় নি কোথাও।

নববী যুগ সারাটাই ছিল কল্যাণ ও বরকতের যুগ। আমলের আগ্রহ ও হিম্মতও ছিল সে যুগে অত্যন্ত উঁচু স্তরের। সে যুগেও আমাদের উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। হাদীসে আছে, জনৈক বেদুঈন সাহাবী রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে একদিন আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান তো বহু। আমার মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তা আয়ত্তে আনা কঠিন। মেহেরবানী করে সংক্ষেপে একটা কিছু বলে দিন, যা আমি মযবুত করে আঁকড়ে ধরতে পারি।"

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পুরো মনোযোগ দিয়ে তাঁর এই কথা শুনলেন। এই বেদুঈন প্রশ্নকর্তাকে কোনরূপ ভর্ৎসনা করলেন না তিনি। তাঁর এই প্রশ্নকে সাহস তথা হিম্মতের স্বল্পতা ও দীনের বিষয়ে দুর্বলতা বলে ভাবলেন না। দীনের পুরোপুরি জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে এ তার উপেক্ষা প্রদর্শন বলেও গণ্য করলেন না, বরং স্নেহার্দ্র হৃদয়ে বিষয়টি বিবেচনা করলেন এবং তার এই প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করলেন ঃ

لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

আল্লাহ্‌র যিকরে যেন তোমার যবান হামেশা সিক্ত থাকে।[১]

হযরত আবূ আম্‌র (রা), আবূ উমরা, সুফয়ান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ বর্ণনা করেনঃ আমি একদিন নবীজীর কাছে আরয করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যা আপনার পরে যেন আর কাউকে আমার জিজ্ঞেস করতে না হয়।"

জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -

বল, ঈমান আনলাম। পরে এতে মযবুত হয়ে থেকো।[২]

এই ধরনের রিওয়ায়েতসমূহ মুসলিমদের কল্যাণকল্পে সামগ্রিক ইসলামী বিষয়সমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখতে মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণকামী চিন্তাবিদদের উৎসাহিত

১. ইবনে মাজা
২. সহীহ মুসলিম

করেছে। এমন এক গ্রন্থ লিখতে তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছে যাতে থাকবে দ্বীনের যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি, দৈনন্দিন দায়িত্বাবলী ও আমলসমূহ, ইসলামী নৈতিক ও চরিত্র গঠনমূলক বিধি-বিধান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য সঠিক পথ-নির্দেশনা। মধ্যম ধরনের একজন মুসলিমের চলার জন্য এটি হবে যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট একটি গ্রন্থ এবং যেটিকে তারা গ্রহণ করতে পারবে নিজের জীবনবিধানরূপে।

আমার জ্ঞান ও অধ্যয়ন অনুসারে যতটুকু আমি জানি এই বিষয়টির প্রয়োজন সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে যিনি অনুভব করেছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (ইমাম গাযালী, মৃ. ৫০৫ হি.)। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'ইহয়াউ 'উলুমিদ্‌দীন' (সাধারণভাবে যা 'ইহয়াউল 'উলুম' নামে প্রসিদ্ধ) রচনা করে এই প্রয়োজনীয় ও কল্যাণময় ধারার সূচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থটিকে সত্যান্বেষীদের জন্য একজন ধর্মীয় শিক্ষক ও অভিভাবকের স্থানে এবং বহুলাংশে ইসলামী গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্তরূপে সংকলিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এটিতে আকাইদ ও মৌল ইসলামী বিশ্বাস, মাসআলা-মাসাইল, নাফসের তাযকিয়া ও সংশোধন, রূহানা প্রশিক্ষণ, চরিত্র শুদ্ধি বিষয়ক দরজা-ই-ইহসান ও প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌কে সমক্ষে প্রত্যক্ষ করার মর্যাদা ও তা লাভের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস, আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় ও পুণ্যের আশা, প্রতিশ্রুতিসম্বলিত কুরআন করীমের আয়াত ও বর্ণিত হাদীস, হিকমতসম্বলিত প্রভাবশীল ওয়াজ-নসীহত এবং প্রাণে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম ও আবেগ-ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে এমন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। ফলে এই মহাগ্রন্থটি ঈমান, নেক আমল, বাতিনী ও রূহানী শুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিষেধকের কাজ দেয়। মানুষের রূহানী ও আত্মিক রোগ-বালাইগুলোকে চিহ্নিত করে এর চিকিৎসারও যথাযথ ব্যবস্থা প্রদান করে।

সন্দেহ নেই, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক এই গ্রন্থটিতে লেখকের গ্রীক দর্শন অধ্যয়নের ছাপ দেখতে পাবেন সত্য, যদিও লেখক তথাকথিত গ্রীক দর্শনের কঠোর সমালোচক ছিলেন, কোথাও কোথাও হাদীসবিদগণের দৃষ্টিতে যঈফ ও দুর্বল হাদীসের মাধ্যমেও তাঁকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দলীল দিতে দেখতে পাবেন বটে, এ ছাড়া আরো সমালোচনাযোগ্য কিছু কিছু বিষয় হয়ত এতে সন্ধানীদের সামনে পরিলক্ষিত হতে পারে ঃ তবু এতসব কিছু সত্ত্বেও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদ ও ন্যায়নিষ্ঠ গবেষক সকলেই গ্রন্থটির প্রভাবশীলতা ও

এর উপকারিতা স্বীকার করেন, এমন কি আল্লামা ইবনুল জাওযী ও শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়ার মতো সমালোচকগণও এই গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মর্যাদার খোলাখুলি স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১] এটি ঐতিহাসিক সত্য, এই গ্রন্থটিই সার্বজনীন জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দীনী ও শিক্ষিত সমাজে এটির যে পরিমাণ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রদর্শিত হয়েছে, যে খ্যাতি, নির্ভরযোগ্যতা ও আস্থা এটি পেয়েছে, সিহাহ সিত্তা ও আর সামান্য কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে তা শোনা যায় না। ইসলামী জগতের কোণায় কোণায় এক জেনারেশন থেকে অপর জেনারেশন ধরে যুগ যুগব্যাপী মানুষ এই গ্রন্থটিকে নিজেদের পথ-নির্দেশনা ও জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইমাম গাযালীর পর এই ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়নি। ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭)-এর মতো সুবিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সমালোচক, 'তালবীস ইবলীসে'র মতো তীর্যক ও সমাজ নিরীক্ষামূলক গ্রন্থের রচয়িতাও উক্ত মহান গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করার ও এটিকে নয়ারূপে বিন্যাস করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং 'মিনহাজুল কাসিদীন'[২] নামে এর একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেছিলেন। বড় বড় আলিম এই ইহয়াউল উলূমের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন এবং নানাভাবে এর খেদমতে নিজেদের নিজড়িত করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আল-আলফিয়ার সংকলক আল্লামা যায়নুদ্দীন ইরাকী 'ইহয়াউল উলূমে'র উল্লিখিত হাদীসসমূহের তাখরীজ বা বরাত সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। উপমহাদেশের গৌরব আল্লামা মুরতাযা বিলগিরামী 'ইতহাফুস সাদাত আল-মুত্তাকীন' নামে বিশ ভল্যুমে ইহয়াউল 'উলূমের ব্যাখ্যা লিখেছেন। হাদীস, ফিক্‌হ, কালাম ও তাসাওউফশাস্ত্রে এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি বিশ্বকোষের মর্যাদা রাখে।

ইহয়াউল 'উলূমের ওপর ভিত্তি করে সুলূক ও তাসাওউফের ক্ষেত্রে তরীকা-ই-গাযালিয়া নামে স্বতন্ত্র এক চিন্তাধারা, সংস্কারমূলক ও ইসলাহী সিলসিলার প্রবর্তন ঘটে। হাযরামওত ও অপরাপর আরব অঞ্চলে এই তরীকার খুবই প্রচলন ঘটেছিল।

ইহয়াউল 'উলূমের পদ্ধতি অনুসারে ইমাম গাযালী ফার্‌সীতেও একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে অনারবদের শিক্ষার মান, তাদের প্রয়োজন ও মেযাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে এটি রচিত। বলতে গেলে

১. দ্রষ্টব্য আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযিয ৯ ঃ ১৬৯-৭০; ফাতাওয়া ইব্ন তায়মিয়াহ ২ ঃ ১৯৪।
২. আল্লামা ইব্ন কুদামা মাকদিসী 'মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন' নামে এটির একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন।

ইহয়াউল 'উলূমেরই ফারসী ভাষায় রচিত একটি সংক্ষিপ্তসার এটি। তিনি এই গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন কীমীয়া-ই-সা'আদত। এই গ্রন্থটি ফার্সী সম্পর্কে বিজ্ঞ, সংক্ষিপ্ত ও সরলীকরণপন্থী দীনদার পাঠকদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১]

ইহয়াউল 'উলূমের পরে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিবিশিষ্ট রচনারীতির প্রতিকৃতি ও যথাযথভাবে যুগের চাহিদা পূরণের সফল ও বরকতময় প্রচেষ্টা হিসাবে যে গ্রন্থটির উল্লেখ করতে হয়, সেটি হলো হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (মৃ. ৫৬১ হি.)-এর 'গুনিয়াতুত্ তালিবীন'। যারা ইসলাহ্ ও নিজেদেরকে সংশোধন করতে অভিলাষী তাদের জন্য বিশেষ করে সালিক ও মুরীদদের পথ প্রদর্শনের মূল্যবান দিকদর্শন রয়েছে এটিতে। গ্রন্থটির পুরা নাম হচ্ছে ঃ

الغنية طلبي طريق الحق عزوجل -

এটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই উম্মতের সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্মীয় নেতা এবং রূহানিয়াতের ইমাম হযরত আবদুল কাদির জিলানী তাঁর সঙ্গে জড়িত ও সংশ্লিষ্ট এবং ভবিষ্যতের আল্লাহ্র পথ অনুসন্ধানী সত্যনিষ্ঠ সত্তাদের জন্য লিখেছেন এটিকে। ফরয, সুন্নতসমূহ, এর আদব ও নীতিমালা, আল্লাহ্র মারিফাত ও অভিজ্ঞান লাভে সহায়ক বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে থাকা প্রমাণাদি, খোদ মানুষের মধ্যে বিরাজিত নিদর্শনাদি, কুরআন কারীমে ও হাদীস পাকের নির্যাস, সুমহান পূর্বসূরী সালাফ ও বুযুর্গানের চরিত্র, সুমহান আদর্শ ও অবস্থার আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী এমনভাবে সংকলিত ও একত্র করা হয়েছে যাতে এর আলোকে আল্লাহ্র পথে চলা সম্ভব হয়ে ওঠে, আল্লাহ্র সকল হুকুম মেনে চলা সহজ হয়ে যায় এবং হারাম ও নিষেধসমূহ থেকে ফিরে থাকা যায়। তাহারাত, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি জরুরী আহ্কাম ও আদেশ-নিষেধসহ কুরআন, সুন্নাহ ও সীরাত পাকের আলোকে প্রমাণিত, প্রয়োজনীয় সকল আদব ও রীতি-পদ্ধতির বিবরণ একজন মুসলমানের জন্য এই গ্রন্থটিতে রয়েছে। যে ব্যক্তি ইসলামের বিধি-বিধান জানার জন্য কোন সুবিজ্ঞ ফকীহ ও আলিম পান নি বা রূহানী বিষয়সমূহের জন্য কোন অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আধ্যাত্মিক শিক্ষক যার নসীবে ঘটেনি—তাদের সকলের জন্য এ গ্রন্থটি একজন পথপ্রদর্শক ও মুরশিদের কাজ দেবে।

১. আরবী ভাষায় এই বিষয়ে ইমাম গাযালীর 'বিদায়াতুল হিদায়া' নামে একটি গ্রন্থ রয়েছে। হালাবের সুপ্রসিদ্ধ আলিম শায়খ আল-হাজ্জারের সম্পাদনায় টীকাসহ মাকতাবুদ দাওয়া হালাব থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটির মহান রচয়িতা এটিতে নিজস্ব অভিজ্ঞতাসমূহও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বিষয়াবলীর আলোচনা ও বিশ্লেষণ সকল ক্ষেত্রে সুন্নতের ওপর সুদৃঢ়, উচ্চ স্তরের ফকীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারী প্রাজ্ঞ এক আলিম হিসাবে গ্রন্থকারের উজ্জ্বল উপস্থিতি পরিদৃষ্টমান। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কে এটিতে পৃথক একটি অধ্যায় রয়েছে। আকাইদের ক্ষেত্রে হযরত আহমদ ইবন হাম্বলের অনুসারী মুতাকাল্লিম ও আকীদাতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে আল্লাহ্‌র সিফাত ও গুণাবলীর বিষয়ে এবং গুমরাহ ও ভ্রষ্ট ফির্কাসমূহের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে এতে।

মহান গ্রন্থকার হযরত শায়খ জিলানী ওয়াজ ও নসীহতমূলক বিষয়েরও সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন এতে। বিশেষ বিশেষ দিন ও মাসের ফযীলতসমূহের বিবরণও এতে শামিল করেছেন তিনি। এটিকে সমকালীন বাগদাদে প্রচলিত ওয়াজ ও যিকর মজলিসসমূহের স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি। এর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদসমূহে তিনি মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত কঠোর পন্থা অবলম্বন না করে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ফায়দা ও উপকারের নিমিত্ত অনেকটা উদার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। মুরীদদের আদব, তাদের আখলাক ও চরিত্রের বিবরণের মধ্যে গ্রন্থটির সমাপ্তি টেনেছেন তিনি।

হযরত শায়খ জিলানীর শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত ব্যক্তিগণ ও যারা কুরআন, সুন্নাহ, সালফে সালিহীন ও সুমহান পূর্বসূরীদের অনুসৃত আকীদা ও প্রত্যয়ের আলোকে নিজেদের জীবনকে সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল করতে অভিলাষী, যারা নিজের চরিত্র শোধন ও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি লাভে আগ্রহী, তাদের সকলের কাছেই এই মহান গ্রন্থটি নীতিমালা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকা—উভয় মহাদেশে এই গ্রন্থটির মাধ্যমে উপকৃত লোকদের সংখ্যা হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ, কোটি কোটি।

এই ধারারই পথ বেয়ে ও এই মহান লক্ষ্যকেই সামনে রেখে প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাতাত্ত্বিক, আভিধানিক ও প্রখ্যাত আরবী অভিধান আল-কামূসের লেখক ও সংকলক আল্লামা মাজদুদ্দীন ফীরূয আবাদী (মৃ. ৮১৭ হি.) 'সাফরুস্‌সা'আদা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মাননীয় গ্রন্থকার এতে সংক্ষেপে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাতের আলোচনা করে ইবাদাত, লেনদেন ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অবস্থায় তাঁর সুন্নত, শিক্ষাসমূহ ও তাঁর পবিত্র উক্তিও-ইরশাদসমূহ উল্লেখ করে তাঁর পবিত্র চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ লিপিবদ্ধ

করেছেন। এভাবে গ্রন্থটি মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন—সকল ক্ষেত্রে পবিত্র সীরাত ও মহান সুন্নতসমূহের সমন্বিত সংকলনরূপে প্রতিভাত। ফলে প্রত্যেক মুসলমানই এটিকে স্বীয় জীবনের নীতিমালা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অনুসৃত চিকিৎসা নীতিও এই গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি মধ্যম সাইজের। পৃষ্ঠা এক শত পঞ্চাশ।[১]

তবে এই ধারার সবচেয়ে সফল প্রয়াস, এই বিষয়ে ও এই লক্ষ্যে রচিত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান গ্রন্থ হচ্ছে আল্লামা হাফিজ ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়া (মৃ. ৭৫১ হি.) রচিত 'যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল 'ইবাদ' গ্রন্থটি। সীরাত ও সুন্নত, ফিকহ ও ব্যবহারশাস্ত্র, কালাম ও আকীদা বিষয়ক, তাযকিয়া ও ইহসান বা চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি বিষয়ক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আলোচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। ইসলাহ ও তারবিয়্যাত, চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য ইহয়াউল 'উলূম-এর পরে এত সমন্বিত, এত সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সম্ভবত আর রচিত হয়নি, বিশেষ করে তথ্যের বিশুদ্ধতা, সনদের নির্ভুলতা, কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যশীলতার ক্ষেত্রে এটি ইহয়াউল উলূমের চেয়েও উচ্চ মানের। মাননীয় গ্রন্থকার দীন ও ইসলামী গ্রন্থের বিরাট ও সুবিশাল সমুদ্রকে একটি পেয়ালায় আবদ্ধ করার সুসফল প্রয়াস পেয়েছেন এটিতে। একজন স্নেহবৎসল অভিভাবক ও মুরশিদ, একজন ফকীহ ও মুহাদ্দিসের স্থলে কাজ দেওয়ার হক আদায় করে দিয়েছে গ্রন্থটি। হাদীসশাস্ত্রের রসবোধ যাদের আছে, নবীজীর সুন্নত ও রীতিনীতি অনুসরণের যাদের তীব্র আগ্রহ রয়েছে—সেই সব অনুসন্ধিৎসু সত্তা ও আলিমগণ সব সময়ই এই গ্রন্থটিকে হৃদয়ের মালা হিসাবে বানিয়ে রেখেছেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, হাদীস, ফিকহ, কালাম, আরবী ব্যাকরণ ও শব্দ প্রকরণ ইত্যাদি সব ধরনের বিষয়ের নির্যাস হচ্ছে এই গ্রন্থটি। বহু বিষয়বিদ, প্রাজ্ঞ ও জ্ঞান-সাগর, সকল বিষয়ে যার সুগবেষণালব্ধ বিদগ্ধতা বিদ্যমান—সেই ধরনের আলিমের প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা আদায় করতে পারে এই গ্রন্থটি।

এই উদ্দেশে রচিত গ্রন্থ তালিকায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো রুকন-ই-ইসলাম বা ইসলামস্তম্ভ। ওয়াইজুল কাওম বা জাতির উপদেশদাতা খেতাবে ভূষিত আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আবী বকর সামারকান্দী রচিত

১. পুস্তিকাটির মূল নাম সীরাত মুস্তাকীম, সাফরুস্ সা'আদা নামে খ্যাত। মূলত ফারসী ভাষায় লেখা। হিজরী নবম শতাব্দীর শুরুতে আবুল জাওদ মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ মাখযূমী এটির আরবী অনুবাদ করেন।

'শির'আতুল ইসলাম ইলা দারিস-সালাম' গ্রন্থটির পরিচিতি দান করতে গিয়ে তিনি নিজে লেখেন ঃ

> মুসলিম শিশুদের সর্বপ্রথম এই গ্রন্থটির পাঠ দেয়া উচিত এবং য়াকীন ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারীদেরও কর্তব্য এটিকে সব সময়ের জন্য নিজের সামনে রাখা। যে সত্য পথের পথিক নফস ও কুপ্রবৃত্তির অন্ধকূপে ধ্বংস হতে চায় না এই গ্রন্থটি ব্যতীত তার আর কোন পথ নেই।[১]

ভবিষ্যৎ বংশধর যেন এই গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হয় এবং তারা যেন এটিকে নিজেদের দিক-নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করে, মনে হয় এ-ই ছিল গ্রন্থকারের ইচ্ছা। সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ আকাইদের বিবরণ তিনি এটিতে উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে তথ্যবিশারদ ও গবেষক পূর্বসূরীদের ও সুন্নাহ্‌র আবেগমণ্ডিত আহ্‌বায়কের পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন গ্রন্থটিতে। পরে আলিমদের আখলাক ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও গবেষণামূলক চিন্তার ফলশ্রুতিও তিনি তুলে ধরেছেন এটিতে। গ্রন্থকারের সৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে কিছু এমন তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে যা হাদীস সমালোচনাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে কিছুটা আপত্তিকর।

উপস্থাপনার সহজবোধ্যতা ও সারল্যের দরুন যে গ্রন্থটি থেকে সমকালীন যুগের হাজারো লাখো মানুষ হয়েছে উপকৃত, সেই বিপুল জনপ্রিয় গ্রন্থটি হলো যুগের বায়হাকী সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (মৃ. ১৩২৫ হি.)-এর 'মালাবুদ্দা মিনহু'। গ্রন্থটিতে প্রথমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকাইদের সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর নামাযের ফযীলত, তাহারাতের মাসআলা-মাসাইল, নামাযের বিস্তারিত বিধি-বিধান, যাকাত, রোযা ও হজ্জের হুকুম-আহকাম সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে যে সমস্ত মাসআলা-মাসাইলের প্রয়োজন পড়ে বেশি এবং যে সমস্ত বিষয়ে মানুষ সাধারণভাবে লিপ্ত হয় অধিক, রচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটিতে সে সবেরই নির্বাচন করা হয়েছে। কিছু কিছু বিরল মাসআলা-মাসাইলেরও অবশ্য এতে উল্লেখ রয়েছে। তাকওয়া সম্পর্কেও বিশেষ একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে এতে। মোটকথা, যুগ-মানসের খেয়াল রাখা হয়েছে এটির রচনায়। ব্যক্তি ও সমাজের সাধারণ ব্যাধিসমূহ, বিকিকিনির নীতিমালা, শরীয়তসম্মত কার্যাবলীর বিবরণ রয়েছে এতে। লেখকের যুগে শরীয়তবিরোধী যে সমস্ত বিষয়ের প্রচলন ছিল এগুলোরও

১. আমাদের কাছে যে সমস্ত জীবন ও চরিত্র অভিধানমূলক গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোতে এই লেখক সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ চরিত অভিধান কাশফুয-যুনুন গ্রন্থে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থটি খুবই ভাল ও উপকারী। নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীর গবেষক বন্ধু মুহাম্মদ নায়নার এই গ্রন্থটি আবিষ্কার করেছেন এবং সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন গ্রন্থটিতে। সামাজিক আদব, রীতিনীতি, হুকূকুল 'ইবাদ বা বান্দার হক সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম ও তাঁর যুগে প্রচলিত পাপাচার ও সাধারণভাবে মানুষ যেগুলোকে সামান্য বলে ধারণা করে, সেই ধরনের নিষিদ্ধ কার্যাবলীর বিবরণের জন্য স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। নৈতিকতার দৃষ্টিতে দূষণীয় কাজকর্ম, নফসের কুমন্ত্রণা ও জাহিলী কুসংস্কার ও রীতিনীতির প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এটিতে। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করতে ও মহান চারিত্রিক গুণাবলীতে নিজেকে বিভূষিত করে তুলতে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে এতে। পরে আরেকটি পরিচ্ছেদে তাযকিয়া, আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, ইখলাস, নিষ্ঠা, দীনের মূল সার ও হাকীকত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। সব বিষয়ই এতে উপস্থাপিত হয়েছে খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে।

গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো একজন মধ্যম শ্রেণীর মুসলিমের জন্য যা জানা জরুরী তা সবই উল্লেখ করা হয়েছে এতে, বিশেষ করে মুসলিম কিশোর—যারা বালক ও যুবার ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তাদের মন-মানসিকতা ও প্রয়োজনের আঙ্গিকে লেখা এই গ্রন্থটি। তাই এক শতাব্দীরও বেশি কাল ধরে ভারত উপমহাদেশের শরীফ ও দীনী পরিবারসমূহে পাঠ্য বই হিসাবে পঠিত হয়ে আসছে এটি। তৎকালীন উপমহাদেশে দীনী ও একাডেমিক ভাষারূপে প্রচলিত সহজ ফার্সিতে লেখা গ্রন্থটি মধ্যম সাইজের, পৃষ্ঠা সংখ্যা এক শত বায়ান্ন।

উক্ত ধারার ও উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রচিত যে সমস্ত গ্রন্থ তার যুগমানস, চিন্তাধারা, চরিত্র ও আমল গঠনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং যেগুলোর উপমাদিতে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদৃঢ় বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হলো 'সীরাত মুস্তাকীম'। এটি হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জিহাদ ও ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের প্রধান ইমাম ও নেতা সুমহান মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (মৃ. ১২৪৬ হি.)-এর বচন ও উক্তিসমূহের একটি সংকলন। তাঁর সহচর ও অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (মৃ. ১২৪৬ হি.) ও প্রধান খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল হাই বুঢানবী (মৃ. ১২৪৩ হি.) ফার্সি ভাষায় এই গ্রন্থটি প্রস্তুত করেছিলেন। সঠিক পথে চলার ও শরীয়তে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় হয়ে কায়েম থাকার ও সুন্নতে নববীসমূহ অনুসরণ করে চলার জন্য অত্যন্ত পরিষ্কার উজ্জ্বল হিফাযত ও শিক্ষা রয়েছে গ্রন্থটিতে। বেলায়াত পদ্ধতির ওপর নুবূওয়াত পদ্ধতির ও নফলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের তুলনায় ফরযসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ পদ্ধতির প্রাধান্য প্রমাণ করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

আকীদার বিশুদ্ধতা, সঠিক নির্ভেজাল তওহীদের শিক্ষা প্রদান ও সাথে সাথে শির্ক ও বিদ'আতের রদকরণ হচ্ছে গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন সূফী-দরবেশ ও পীরদের মাঝে প্রচলিত ও তাদের পরিমণ্ডলে অনুসৃত বিদ'আতসমূহ ও গ্রীক তর্কশাস্ত্রের অনুসারী ধর্মদ্রোহিতার নিশানবাহী ও বাতিনী মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত সূফী, শীআ ও গোড়া বিদ'আতপন্থীদের প্রভাবে যে সমস্ত শরীয়তবিরোধী মতাদর্শ ও আচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল মুসলিম সমাজে এবং যে সমস্ত অনাচার ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের সমাজ পরিমণ্ডলে, সেই সব কিছু সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। অমুসলিমদের সাথে মেলামেশার দরুন শোক ও আনন্দের অনুষ্ঠানাদিতে যে সমস্ত জাহিলী কুসংস্কার ও রীতিনীতি মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছিল এবং মুসলিম সমাজের চেহারা ও পরিচয় বিগড়ে দিচ্ছিল, কিতাব ও সুন্নত থেকে দূরে সরবার কারণে ও সেই সম্পর্কে অজ্ঞানতার দরুন, বিশেষ করে হাদীস সম্পর্কে অনবহিতির কারণে মুসলিম সমাজ জীবনে যে সমস্ত দূষণীয় জীবাণুর সম্প্রসারণ ঘটছিল সেই সবের বিরুদ্ধে মুকাবিলার ও সেই সমস্ত থেকে আত্মরক্ষার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে গ্রন্থটিতে। মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়া এই ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে এতে। চরিত্র গঠন, আত্মশুদ্ধি ও রূহানী চিকিৎসার উপায় বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করে মানবীয় ও ঈমানী গুণাবলী ও পরিপূর্ণতা লাভের পথে যে সমস্ত বন্ধুরতার সম্মুখীন হতে হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এগুলোকে কাবু করার উপায়ও বাতলে দেয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যিকির-আযকার, ইবাদত-উপাসনা, আকীদা ও বিশ্বাসের সংস্কার ও বিশুদ্ধতা অর্জন, সলূক ও অধ্যাত্মবাদের বিবরণের পাশাপাশি দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ, আল্লাহর পথে জিহাদ ও সংগ্রামের, আমলের উচ্চস্তরে সুদৃঢ় থাকা, উম্মতের কল্যাণে চিন্তা-ভাবনা, আল্লাহর নামকে সুউচ্চ রাখা, তাঁর দীনের পতাকা তুলে ধরা, পৃথিবীতে ইসলামের শৌর্য প্রতিষ্ঠার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উদাত্ত ও বলিষ্ঠ আহ্বান জানানো হয়েছে এতে।

সংস্কারধর্মী ও প্রশিক্ষণমূলক এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তালিকায় হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) রচিত 'তা'লীমুদ্দীন' গ্রন্থটির কথাও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা যায়। এক শত চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটিতে ঈমান ও আকাইদ, আমল ও ইবাদত, মু'আমালাত ও লেনদেন, সমাজ জীবনের আদব-কানূন ও

সলূক ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশনা রয়েছে। এই গ্রন্থটির চেয়ে বেশি জনপ্রিয়, প্রসিদ্ধ ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে তাঁরই লেখা 'বেহেশতী যেওর'। দীন ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি, কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের মূলোৎপাটন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম মহিলা ও নাবালিকাদের জন্য মূলত এটি রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আলিম-উলামা পর্যন্তও এটি থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

একজন গৃহশিক্ষক, একজন ওয়াইজ ও মুফতীর কাজ দেয় এটি। উর্দূ ভাষায় এমন খুব কম গ্রন্থই রয়েছে যার অনেক সংস্করণ বেরিয়েছে এবং এত সংখ্যক কপি মুদ্রিত হয়েছে যত সংখ্যা ও যতবার এই গ্রন্থটির ক্ষেত্রে হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে এই বিষয়টির গুরুত্ব ও বর্তমান যুগের জন্য এই ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে গেছে। কারণ বর্তমান যুগ সংক্ষিপ্ত সময়ে বেশি অর্জনের যুগ। বর্তমান যুগে সংক্ষিপ্ত কারণে সংক্ষেপ প্রিয় হয়ে গেছে প্রায় সবাই। সময়ের মূল্য ও এর গতির অনুভূতি এত সুতীব্র হয়ে উঠেছে যে, আজ তা অনুভূতির চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। জটিল দীর্ঘ, শ্রমসাপেক্ষ, সূক্ষ্ম ও গভীর বিষয়বস্তুসম্বলিত কোন গ্রন্থ অধ্যয়নের সাধারণ মেযাজ আর নেই। তদুপরি বর্তমান যুগকে বেশ খানিকটা শারীরিক দৌর্বল্য ও কম হিম্মতীর শিকার হতে দেখা যাচ্ছে। সমাজ জীবনের জটিলতা এবং জীবনের সীমাহীন দাবি ও চাহিদায় যারা আগ্রহী তাদেরকেও আজ আরো সংক্ষেপ-প্রিয় করে তুলেছে। বর্তমান যুগকে স্যান্ডউইচ যুগ বলেই অভিহিত করেছেন অনেকেই। আর তাই দীর্ঘদিন থেকে এই ধারায় এমন একটি নয়া গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল, অতীতের সমস্ত গ্রন্থের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে যেটি। শব্দ এক হওয়া সত্ত্বেও প্রতি যুগেরই বিশেষ এক ভাষা হয়ে থাকে। এ ছাড়া সমকালীন যুগকে কিছু বোঝান সম্ভব হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া প্রতি যুগেরই রয়েছে বিশেষ ধরনের স্বতন্ত্র মন-মানস, প্রতি যুগেই উদ্ভব ঘটে নয়া নয়া রোগ ও দুর্বলতার। স্বভাব ও মানসিকতার ক্ষেত্রে জন্ম ঘটে নয়া নয়া চোরাই পথের। ইসলামী চিন্তাধারা ও মুসলিম সমাজ বাইরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে থাকে। স্ব স্ব যুগে বিভিন্ন বিষয়ে মহান সংস্কারক ও মুখলিস ইসলামী ব্যক্তিত্বদেরকে পর্যন্ত এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার রেয়ায়াত করতে হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী ও এর পরবর্তী যুগ গ্রীক দর্শন-চিন্তা, সমকালীন বুদ্ধি ও যুক্তিপূজারীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

তেমনিভাবে বর্তমানের নব্যশিক্ষিত যুগ-মানস পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শন, তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, তাদের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার নয়া ফরমেশন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে।

যে গ্রন্থ কখনো নির্জীবতার ও স্পন্দনহীনতার শিকার হয়নি এবং কালের বিবর্তনের প্রভাব যে গ্রন্থটিকে কখনও প্রভাবান্বিত করতে পারেনি, সেটি হলো অবিনশ্বর মু'জিযা আল্লাহর কালাম কুরআনুল কারীম। আর এর পরে হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে সপ্রমাণিত সহীহ্ হাদীসসমূহের অমূল্য ভাণ্ডার। এ ছাড়া যত গ্রন্থ রয়েছে সবই তো পরিবর্তনশীলতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ। পরিমার্জন ও পরিবর্ধন, সংস্কার ও পরিবর্তন, নির্ধারণ ও সংক্ষিপ্তকরণের মুখাপেক্ষী।

কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু উল্লিখিত ধারা অনুকৃতিতে একটি গ্রন্থ বিরচনের পরামর্শই নয়, বলতে গেলে অবিরাম তাগিদ দিয়ে যাচ্ছিলেন এই অধমকে। অতীতের বিভিন্ন যুগে এই প্রেক্ষাপটে লিখিত গ্রন্থসমূহ হতে যেমন সমকালীন সমাজ উপকৃত হয়েছে তেমনি একটি গ্রন্থ বিরচনে তাঁরা আমাকে জোর করছিলেন যে গ্রন্থটি দ্বারা বর্তমান যুগ উপকৃত হতে পারবে এবং সেটিকে তারা নিজেদের জীবনের নির্দেশিকা ও নীতিমালা হিসাবে বরণ করতে পারবে।

এই ধারায় রচিত গ্রন্থসমূহের রচয়িতাদের স্বর্নোজ্জ্বল তালিকার প্রতি যখনই আমার দৃষ্টি পড়ত তখনই তাঁদের ইখলাস, আন্তরিকতা ও জ্ঞানরাজির খেয়াল হতো, সাথে সাথে অধমের জ্ঞানশূন্যতা ও পুঁজিহীনতা প্রকট হয়ে উঠত এবং এই ধরনের কাজে কলম তুলতে অধমকে ফিরিয়ে রাখত, বাধা হয়ে দাঁড়াত তা। তদুপরি অন্যান্য জরুরী রচনাকর্ম, একাডেমিক ব্যস্ততা, সুদীর্ঘ সফর এই বিষয়ে শান্ত ও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করারও অবকাশ দিচ্ছিল না অধমকে।

যা হোক, শেষে অধমের ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, জীবন-অভিজ্ঞতা ও বর্তমান ইসলামী সাহিত্যে এর শূন্যতাবোধ এই অধমকে তাড়িত করে তুলল এবং স্বীয় পুঁজি ও সামর্থ্যানুসারেই এই কাজটি আঞ্জাম দিতে মন তৈরি হয়ে উঠল। শরহে সদর হলো অধমের। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে এই বোধ ও চিন্তাও প্রবল হয়ে উঠল, এই বিষয়ে আরো বিলম্ব করা একটা অত্যাবশ্যক দীনী ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শনের নামান্তর বলে সাব্যস্ত হবে এবং এর জন্য আখিরাতে জওয়াবদিহিরও হয়ত সম্মুখীন হতে হবে। ফলে কেবল রাহমানুর রাহীমের ওপর ভরসা করে ইস্তিখারা[১] ও দু'আ করে কাজ শুরু করে দিলাম। হাজারো বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কেবল আল্লাহর দেয়া তাওফীকে পূর্ণ করা সম্ভব হলো তা।

১. মঙ্গল ও কল্যাণ সন্ধান করা। হাদীসে বর্ণিত যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কাজের ভবিষ্যত মঙ্গল-অমঙ্গল জানা যায় সেই বিশেষ সালাত ও দু'আ পদ্ধতিকে ইস্তিখারা বলা হয়।

গ্রন্থটিতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সার ও স্বীয় অধ্যয়নের নির্যাস পেশ করে দেয়া হলো। দীনের দাওয়াত ও রচনার ময়দানে দীর্ঘদিন বিচরণের মাধ্যমে যে সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং এই উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে সরাসরি মিশে যা জানা সম্ভব হয়েছে সব কিছুরই নির্যাস তুলে ধরা হলো এতে। আমার পূর্ববর্তী রচনাসমূহের যে সমস্ত উদ্ধৃতি বিষয়বস্তুর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ছিল সে সমস্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে কোন দ্বিধা করিনি এতে।

সুমহান রাহীম ও কারীম, দয়ালু ও মেহেরবান নুকতানাওয়ায সত্তার কাছে আশা, তিনি খোদ লেখককে এর মারফত উপকৃত হওয়ার তাওফীক দেবেন এবং যারা আমল ও উপকার লাভের নিয়্যতে এটি অধ্যয়ন করবেন সেই সব সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য উপকারী ও কার্যকর গ্রন্থ হিসাবে পরিণত করবেন। আমীন!

৭ শা'বান ১৪০২ হি. আবুল হাসান আলী নদভী

৩১ মে ১৯৮২ খ্রি. দাইরা শাহ আলামুল্লাহ হাসানী, রায়বেরেলী

ইসলামের মৌল প্রকৃতি ও এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই পৃথিবীর প্রতিটি জীবন্ত এবং সঞ্চরমান বস্তুর এক-একটি বিশেষ মেযাজ ও প্রকৃতি রয়েছে। প্রতিটি বস্তুরই বিশেষ কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং দর্শনীয় আকৃতি ও গঠন-শৈলী রয়েছে। এইগুলির সাহায্যেই একটি বস্তুর নিজস্ব সত্তা গঠিত হয়ে থাকে এবং তা দিয়ে এই বস্তুটিকে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করা যায়। আর এই বিশেষ বিষয়গুলোই সেই বস্তুটির স্বাতন্ত্র্য-বোধক বৈশিষ্ট্য ও গুণ বলে চিহ্নিত হয়। ব্যক্তি, সমাজ, দল, জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম ও দর্শন নির্বিশেষে সবকিছুতেই এই বিষয়টি নিহিত। এই সবকিছুই নিজস্ব কিছু স্বাতন্ত্র্যবোধক বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণীয় কিছু চিহ্ন রাখে যা সকলের সামনে বস্তুটিকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে দেয়।

সুতরাং দীন-ই-ইসলামের স্বাতন্ত্র্যবোধক বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? এর নিজস্ব সত্তাই বা কি? এর যথার্থ গঠন ও রূপ-ই-বা কি? এই ধরনের প্রশ্ন কারো মনে জাগা নিতান্তই স্বাভাবিক। এই ধরনের অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়াতে যথার্থই একজনের অধিকার রয়েছে।

দীন ও ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে এর শিক্ষা, হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনাসমূহ এবং এর সুনির্ধারিত আইন ও নীতিমালাসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের আগে আমাদেরকে উল্লিখিত মূল সত্য ও বুনিয়াদী তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। কেননা, দীন ও ইসলাম থেকে পুরোপুরি উপকার লাভের এবং নিজেকে এর রঙে রাঙিয়ে তোলার পথে এ-ই হল স্বভাবগত পদ্ধতি এবং এই বদ্ধ তালার প্রধান চাবিকাঠিও তা-ই।

সবার আগে এই সত্যটি আমাদের অনুধাবন করে নিতে হবে যে, দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবী, নীতিজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী, দিগ্বিজয়ী বা আইনবিদ, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, কাল্পনিক অশ্বধাবনকারী চিন্তাবিদ, উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতা এবং কোন জাতি বা দেশের লীডারদের মারফত এই দীন আমাদের কাছে আসেনি, আমরা এই দীন ও জীবন-পদ্ধতিকে পেয়েছি সেই সব পবিত্র সত্তার মারফতে, সেই সব সুমহান আম্বিয়া-ই-কিরামের ওয়াসীলায় যাঁদের কাছে আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে আসত ওয়াহী, খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াতী যিন্দেগীতে এসে এই মহান ও পবিত্র ধারার ঘটেছে পরিসমাপ্তি। বিদায় হজ্বের সময় আরাফার দিনে নাযিল হয়েছিল এই আয়াত ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত আর পছন্দ করে নিলাম তোমাদের জন্য দীন ও জীবন বিধানরূপে ইসলামকেই। [সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩]

সে রাসূল সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى -

তিনি নিজের প্রবৃত্তির বশে কথা বলেন না, এই (কুরআন) তো ওয়াহী–আল্লাহ্‌র নির্দেশ যা (তাঁর কাছে) পাঠানো হয়েছে। [সূরা আন্-নাজ্‌ম ঃ ৩, ৪]

১. আল্লাহ্‌র মনোনীত এই দীনের সর্বপ্রথম স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো অন্তরের আকীদা বা বিশ্বাসের ওপর জোর প্রদান। সবার আগে এই বিষয়টির সমাধানের ওপরই তা জোর তাগিদ দেয়। হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী নির্দিষ্ট এক আকীদা, সুনির্ধারিত এক বিশ্বাস, ওয়াহীর মাধ্যমে যে বিশ্বাস ও আকীদার কথা তাঁরা জেনেছিলেন—এরই দাওয়াত মানুষকে দিয়েছিলেন, এরই আহ্বান ও এরই দাবী তাঁরা মানুষকে জানিয়ে গিয়েছেন। এর বিপরীত, এর মুকাবিলায় কোন কিছুর সাথে তাঁরা আপোষ করেন নি, সমঝোতা করতে যান নি কারো সাথে। কোন্ কিছুর বিনিময়ে তাঁরা তাঁদের এই দায়িত্ব থেকে সরে আসেন নি কখনো। উত্তম থেকে উত্তমতর কোন নৈতিক সুষমামণ্ডিত জীবন, উচ্চ থেকে উচ্চতর চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী কোন সত্তা, সৎ ও সততার, নিরাপত্তা, নিরুপদ্রবতা ও যুক্তিযুক্ততার কোন জীবন্ত প্রতিমূর্তি ও কোন আদর্শ প্রতিকৃতি—হোক না কেন তা যত কল্যাণময় কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, হোক না কেন যত ভাল ও সৎ সমাজ ব্যবস্থার জন্ম—হোক না কেন তা যত কল্যাণকর বিপ্লবের অভ্যুদয়—কোন কিছুরই মূল্য তাঁদের কাছে নেই, কোন

কিছুই তাঁদের দৃষ্টি কাড়তে পারে না, যতক্ষণ না তা সেই আকীদা ও বিশ্বাসের আশ্রয়ী হয়—যে আকীদার দাওয়াত তাঁরা নিয়ে এসেছেন, যে আহ্বান ও যে মিশন ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। কোন কিছুই তাঁদের কাছে মর্যাদা রাখে না, যতক্ষণ না মানব জীবনের এই সব প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে এই আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

এ-ই হচ্ছে সেই স্বাতন্ত্র্যবোধক সীমারেখা, আর এ-ই হচ্ছে সেই সুস্পষ্ট ও সুউজ্জ্বল অন্ত-সীমা, যা আম্বিয়া-ই-কিরামের দাওয়াত ও মিশন, জাতীয় নেতা ও রাজনৈতিক প্রধান, বিপ্লবী নায়কও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবধান সূচিত করে যারা আম্বিয়া-ই-কিরামের শিক্ষা ও জীবন-দর্শনের স্থলে অন্য কিছুকে নিজেদের চিন্তাধারা ও আদর্শের উৎসস্থল হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।[১]

কুরআন মজীদ সকল ধরনের বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত একমাত্র আসমানী কিতাব যা কিয়ামত পর্যন্ত যথাযথভাবে বলবৎ থাকবে। আম্বিয়া-ই-কিরামের সীরাতসমূহের মধ্যে আখিরী নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাতই হচ্ছে একমাত্র জীবনচরিত–ঐতিহাসিক ও একাডেমিক সকল দিক থেকেই যার ওপরে আস্থা রাখা যায় এবং প্রতি যুগেই যা থেকে বাস্তব ও কার্যকরী উপকার লাভ করা যায়। আমরা ওপরে যে সত্যটির, যে হাকীকতটির উল্লেখ করে এসেছি কুরআন মাজীদে এর সপক্ষে বহু দলীল ও প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখই যথেষ্ট বলে মনে করি।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো ঐ আয়াতটি যে আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খলীল ও বন্ধু, মহান নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সাল্লামের সহিষ্ণুতা ও হৃদয়ের কোমলতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ -

নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু, কোমল হৃদয় ও আল্লাহ্ অভিমুখী। [সূরা হূদ ঃ ৭৫]

১. বর্তমান যুগের বিগড়ানো অবস্থা ও পরিবেশের ওপর বিরক্ত হয়ে অনেকের মধ্যেই এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেছে, তারা কাউকে কোন বিপ্লবের স্লোগান দিতে দেখলে বা জাগতিক কোন বড় শক্তিকে এর মুকাবিলায় চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসতে দেখলে তাকেই বিরাট একটা কিছু মনে করে বসে। তার আকীদা ও বিশ্বাসের সব বিকৃত চিন্তাধারা ও আদর্শের সব বিচ্যুতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, তার আকীদার বিষয়টিকে বিলকুল উপেক্ষা করে বসে। শুধু তা-ই নয়, বরং যারা আকীদার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চান, যারা এই সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন উল্টো তাঁদের নিন্দা ও মালামতের লক্ষ্যে পরিণত করে, এমন কি অনেক সময় বাতিল শক্তির সাথে যোগসাজশের অপবাদও তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। মূলত এই ধরনের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি দীনের সহীহ্ মেযাজ-বিরোধী, নবীদের অনুসৃত পদ্ধতির সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই।

নিম্নোক্ত এই আয়াতটিতে তাঁর সহচর ও অনুসারীদের কার্যপদ্ধতি, জীবন-দর্শন, এর নীতিমালা ও তাঁর মেযাজ ও রুচি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۔

ইবরাহীম ও তাঁর সহচরদের নেক আচরণে রয়েছে তোমাদের জন্য সুন্দর আদর্শ। তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিলেন ঃ তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তেমনিভাবে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যে সমস্ত প্রতিমার তোমরা পূজা-অর্চনা কর সে সব থেকেও আমরা নিঃসম্পৃক্ত। আমরা কখনও তোমাদের উপাস্যদের স্বীকৃতি দিতে পারি না; যতদিন তোমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ওপর ঈমান না আনবে, ততদিন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে। ইবরাহীম অবশ্য তাঁর কাফির পিতাকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র দরবারে আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করব। আল্লাহ্‌র কাছে আপনার সম্পর্কে আমি অবশ্য কোন বিষয়েরই ক্ষমতা রাখি না।

হে আমাদের রব! আমরা তো তোমার ওপরই ভরসা রাখি, তোমার দিকেই আমরা ফিরি আর তোমায় কাছেই তো ফিরে যেতে হবে আমাদের। সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ৪

কারো কারো মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে, হযরত ইবরাহীম মূর্তিপূজক পিতার জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করার ওয়াদা কেন করেছিলেন? সূরা বারাআতের ১১৩-১১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ঃ হযরত ইবরাহীম তাঁর এই ওয়াদা পূরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন—এ তো আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন তিনি তার সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে যান এবং তার সঙ্গে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেন। আর বর্তমানে এটিকেই হামেশার জন্য নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে।

আকীদা ও অন্তরের বিশ্বাস অর্জনের গুরুত্ব এবং কারো সাথে মিলনের বা সম্পর্ক ছিন্ন করার মাপকাঠি এটিই—সে বিষয়ে সূরা আল-কাফিরূন অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে? মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছিল সূরাটি। তখনকার অবস্থা ও পরিবেশের চাহিদা ছিল কাফিরদের সাথে সমঝোতা, নরম ও কোমল আচরণ প্রদর্শনের এবং ইবাদত ও আকীদার ওপর ভিত্তি করে কারো সাথে দুশমনী ও শত্রুতা সৃষ্টি না করার, যতদিন ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তি সুসংহত না হয়েছে, যতদিন নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি না হয়েছে, অন্তত ততদিনের জন্য বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার, এটিকে মুলতবী রাখার। কিন্তু কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে তখনকার মতো পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেও কুরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও খোলাখুলি ঘোষণা দিচ্ছেন ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ج وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ لا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ط لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ -

> হে নবী! ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বলে দিন ঃ হে কাফিরগণ! তোমরা যাদের (যে সমস্ত প্রতিমার) পূজা কর আমি তাদের উপাসনা করি না আর যে মহান সত্তার (আল্লাহ্র) আমি ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত কর না। আমি আবার বলছি, তোমরা যাদের আরাধনা কর আমি তাদের আরাধনাকারী নই। আর না তোমরা সেই যাতের উপাসনাকারী (বলে মনে হচ্ছে) যে মহান সত্তার বন্দেগী আমি করি। তোমরা তোমাদের দ্বীনে আর আমি রয়েছি আমার দ্বীনে।
>
> [সূরা আল-কাফিরূন]

সত্য বলতে কি, যদি কারো বেলায় আকীদা ও ঈমানের বিষয়টি উপেক্ষা করার কথা হতো তবে এর জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালিব। জীবনভর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দিয়ে এসেছেন; কেবল তাঁরই জন্য জানমাল নিয়ে কুরবান হতে প্রস্তুত থেকেছেন। সীরাতকারগণ একবাক্যে লিখেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জন্য আমৃত্যু ঢাল হিসেবে ছিলেন এবং ছিলেন তাঁর একটি মযবুত আশ্রয়স্থল। স্বীয় সম্প্রদায় ও গোত্রের বিরুদ্ধবাদিতার মুকাবিলায়ও সারা জীবন তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী, সহযোগী ও তাঁর প্রতিই তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এতসব কিছু সত্ত্বেও সহীহ্ রিওয়ায়াতে আছে, আবূ তালিবের ইন্তিকালের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

যখন তার কাছে গেলেন তখন আবূ জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমায়্যাও সেখানে বসা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ তালিবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ চাচা ! লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্‌–এর কথা বলুন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার স্বীকৃতির সাক্ষ্য দেব। আবূ জাহ্‌ল ও ইবনে আবী উমায়্যা তখন বলে উঠল ঃ আবূ তালিব! পিতা আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নেবে? শেষে আবূ তালিব এই বলে মৃত্যুবরণ করল, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপরই রইলাম। সহীহ্‌ রিওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্বাস একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেছিলেন ঃ আবূ তালিব তো আপনার হিফাযত করতেন, আপনাকে সাহায্য করতেন, আপনার প্রতি তার মনে খুবই মর্যাদাবোধ ছিল। ফলে আপনার ব্যাপারে তিনি অন্যান্য লোকের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির কোন পরওয়া করতেন না। এসব আমল কি তার কোন উপকার পৌঁছাতে পারবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন ঃ তাঁকে আমি পেয়েছিলাম অগ্নি গহ্বরে, সেখান থেকে উঠিয়ে এনেছি মামুলী আগুনে।[১]

এমনিভাবে ইমাম মুসলিম হযরত আইশা (রা) থেকে একটি রিওয়ায়েত নকল করেছেন, হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে একদিন বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জাহিলী যুগে ইব্‌ন জাদ'আন আত্মীয়-স্বজনের খুবই হক আদায় করত, গরীব-মিসকীনদের আহার করাত, এই সব আমল তার কোন ফায়দায় আসবে কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না, এসব তার কোন ফায়দায় আসবে না। কারণে সে কখনও বলেনি ঃ

رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين -

হে আমার রব! কিয়ামতের দিন আমার ত্রুটিগুলো মাফ করে দিও।[২]

হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত অপর একটি রিওয়ায়েত এর চেয়েও সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। তিনি বলেন ঃ বদরের জিহাদে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হয়েছেন। তিনি হাররাতুল ওয়াবরা নামক স্থানে পৌঁছলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে হাযির হলো। এই লোকটি সাহসিকতা ও বাহাদুরীর জন্য তৎকালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাকে দেখে সাহাবা-ই-কিরাম খুবই আনন্দিত হলেন। সেই জিহাদে সাহাবীদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ' তের জন। তাঁরা ভাবলেন, এর মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান

১. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান।
২. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান।

একটি সংযোজন হলো। কেননা সেই পরিস্থিতিতে সাধারণ একজন লোকের সংযোজনও অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। সে স্থলে এমন একজন অভিজ্ঞ বাহাদুর সৈনিকের সংযোজনের বিষয়টির তো কোন কথাই নেই! লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ আপনার সাথে আমি এই অভিযানে যেতে চাই আর গনীমত সম্পদে শরীক হতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বলল ঃ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা হলে তুমি ফিরে যাও! মুশরিক থেকে আমি সাহায্য গ্রহণ করতে পারি না। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ সে কিছু দূর চলে গেল। আমরা যখন শাজ্‌রা নামক স্থানে পৌঁছলাম সে আবার এল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে পূর্বের প্রস্তাব পেশ করল। তিনিও তাকে পূর্বের মতোই উত্তর দিলেন। বললেন ঃ যাও, আমি মুশরিক থেকে সাহায্য নেই না। সে তখন চলে গেল। আমরা যখন বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলাম সে আবার এল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনতে পার? এবারে সে বলল ঃ হ্যাঁ, ঈমান এনেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে এবার আমাদের সাথে চলতে পার।[১]

২. আম্বিয়া-ই-কিরাম আলায়হিমুস সালাম (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান যাত যাঁদের মধ্যে প্রধানতম)—এর বেলায় দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এই দাওয়াত ও তাবলীগ, দীনের প্রতি আহ্বান ও এর প্রচার, জিহাদ ও আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম সাধনা এবং তাঁদের সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সকল কিছুর পেছনে যে জিনিসটি তাঁদেরে উদ্বুদ্ধ করত তা হলো আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহ। এই মহান উদ্দেশ্যটিই ছিল তাঁদের সকল তৎপরতার পেছনে একমাত্র বুনিয়াদী কারণ। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশা এমন একটি ধারাল তলওয়ার যা এই মহান বিষয়টি ছাড়া বাকি সকল ধরনের উদ্দেশ্য ও মকসুদকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে; বাকি আর সকল কিছুকেই নিষিদ্ধ ও খতম করে দেয়। একজনের মধ্যে এই চেতনাবোধ জাগরিত হওয়ার পর দুনিয়ার কোন সম্পদের আর কামনা থাকে না তার, আর থাকে না তার রাজ্য ও ধন বা বাদশাহী ও সাম্রাজ্যের কোন লিপ্সা অথবা সুউচ্চ আসন আর মর্যাদা লাভের অভীপ্সা, ক্ষমতা লাভের কোন লালসা, আর না থাকে ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসনের কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা। এমন কি তার মধ্যে তখন ক্রোধ ও

১. মুসলিম শরীফ ঃ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্‌সিয়ার।

প্রতিশোধ গ্রহণের জয্‌বা কিংবা জাহিলী ধরনের মর্যাদাবোধের জোশও আর থাকে না। এইসব ধরনের কোন বিষয়ই তাকে জিহাদ ও সংগ্রামের পথে এবং প্রয়াস ও তৎপরতার পথে উদ্বুদ্ধ করে তোলে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর একটি দু'আয় এই মূল সত্যটির সুস্পষ্ট প্রতিফলন সবচেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। তায়েফবাসীরা তাঁর ওপর এমন বর্বরোচিত ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল, দাওয়াত ও নুবুওয়াতের ইতিহাসে যার উদাহরণ মেলা দুষ্কর। সেই সময় তিনি এই দু'আ করেছিলেন। যে মহান উদ্দেশে তিনি সেখানে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন (বাহ্যত) তা পূরণ হয় নি; তায়েফের একটি লোকও সেদিন ইসলামের কোলে আশ্রয় নিল না। এই ধরনের নাযুক পরিস্থিতি ও কঠিন মানসিক অবস্থাতেও যে কয়টি শব্দ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দু'আ হিসাবে তাঁর যবান মুবারক থেকে বেরিয়েছিল তা হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَّتَجَهَّمُنِىْ اَمْ اِلٰى عَدُوٍّ مَّلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ -

আল্লাহ্ গো ! তোমার কাছেই আমি ফরিয়াদ জানাই আমার দুর্বলতার, আমার নিঃসম্বলতার এবং মানুষের কাছে আমার নিকৃষ্টতার। তুমিই তো রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রহম প্রদর্শনকারী। তুমিই তো অসহায় ও দুর্বলদের প্রভু আর আমার রবও তো তুমিই। আল্লাহ্ গো! তুমি কার হাতে সোপর্দ করছ আমাকে? অনাত্মীয় রুক্ষ চেহারাওয়ালাদের কাছে, না এমন দুশমনদের কাছে ঠেলে দিচ্ছ যারা আমার কাজে-কর্মে আমার ওপর কাবু পেয়ে যেতে পারে—তার কাছে?

যে নবীর মেযাজ ও স্বভাব আল্লাহ্ তাঁর নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন–এই স্থানটিতে এসে তা আরো পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। তিনি এই দু'আয় আরো আরয করলেন ঃ

اِنْ لَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلَا اُبَالِىْ غَيْرَ اَنَّ عَافِيَتَكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ -

তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক, আল্লাহ্, তবে এরও কোন পরওয়া করি না আমি। তবে তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আফিয়্যাতই আমার জন্য অধিক বিস্তৃত।[১]

সুদৃঢ় সংকল্প ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী উলুল আজম নবীদের অন্যতম হযরত নূহ আলায়হিস সালামের প্রতি লক্ষ্য করুন। কুরআন মজীদ তাঁর সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا -

তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে পঞ্চাশ কম হাযার বছর অবস্থান করেছিলেন।

[সূরা আল-'আনকাবুত ঃ ১৪]

তিনি এই সুদীর্ঘ সময় আল্লাহ্র রাহে দাওয়াত ও তাবলীগ, দীনের প্রচারে ও আহ্বানে কায়মনে সর্বতোভাবে মশগুল থেকেছেন; সমকালীন মানুষদের বোঝানোর জন্য, তাদের মনে আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে যত সঙ্গত ও মুনাসিব পন্থা ছিল সবই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আল-কুরআনে তাঁর উক্তি উল্লেখ করে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا -

তিনি আল্লাহ্র কাছে আরয করলেন, হে পরওয়ারদিগার! আমি আমার জাতিকে রাত-দিন আহ্বান জানিয়েছি। [সূরা নূহ ঃ ৫]

আরো বললেন ঃ

ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا - ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا -

আমি তাদের খোলাখুলিভাবে আহ্বান করেছি এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থায়ই তাদেরে বুঝিয়েছি। [সূরা নূহ ঃ ৮, ৯]

কিন্তু এত সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালানোর পরও ফল কতটুকু হয়েছিল ? ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ -

অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তাঁর সাথে আর কেউ ঈমান আনে'নি।

[সূরা হূদ ঃ ৪০]

১ যাদুল মা'আদ, ১ ঃ ৩০২; আস-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ইবন কাছীর, ২ ঃ ১৫০।

এতদ্‌সত্ত্বেও হযরত নূহ আলায়হিস সালামকে কোনরূপ অভিযোগ করতে বা ভগ্নোৎসাহ হতে দেখা যায় নি। তিনি তাঁর এই কঠিন পরিশ্রম ও প্রয়াসকে বিফল বলে ভাবছেন না। আর এজন্য আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর মর্যাদা, নৈকট্য ও উলুল আজম নবী হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র তারতম্য সৃষ্টি হয়নি, বরঞ্চ আল্লাহ তাঁর ওপর ছিলেন একান্ত সন্তুষ্ট আর তিনিও ছিলেন তাঁর আল্লাহ্‌র ওপর সন্তুষ্ট। তিনি আল্লাহ্‌র পয়গাম আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে পৌঁছিয়ে গেছেন, আল্লাহ্‌র রাহে তিনি তাঁর প্রয়াসের চূড়ান্ত করে গেছেন, এর পুরোপুরি হক আদায় করে গেছেন। এর পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন এই কুরআনী মর্যাদা ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ - سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ -

আর তাঁর (সপ্রশংস) আলোচনা পরবর্তীতে যারা আসছে তাদের মাঝে বাকি রেখেছি। সালাম নূহের ওপর সারা জাহানে। এমনিভাবে আমি বদলা দিয়ে থাকি সৎকর্মশীলদের। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। [সূরা আস-সাফফাত ঃ ৭৮-৮১]

যারা দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে নিয়োজিত এবং দীনী জিহাদ ও তৎপরতায় বিজড়িত তাদের কুরআন শরীফ এই রীতি ও আদব শিক্ষা দেয় ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

এই পরকালীন আবাস, এটি তৈরি করেছি আমি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে জুলুম ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিপ্রায় করে না। আর উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকী ও পরহেযগারদের জন্যেই। [সূরা আল-কাসাস ঃ ৮৩]

তবে এর অর্থ এই নয়, মুসলিমরা যে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করতে পারলে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কামের প্রচলন সম্ভবপর হয়ে ওঠে, ইসলামী দাওয়াত ও জিহাদের পথের বাধাসমূহ দূরীভূত করা যায় এবং যে শক্তির মাধ্যমে পৃথিবী থেকে অরাজকতা, জুলুম ও বাতিলের আগুন নির্বাপিত করা সম্ভব হয়, আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়া যায়, সুসভ্য ও দীনাশ্রিত ঈমানী সমাজ গঠনের সহায়ক পরিবেশ প্রস্তুত করা যায়, সেই শক্তি ও সামর্থ অর্জনের প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন নেই বা এর কোন গুরুত্ব নেই। এই ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি কখনও আমার আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এই ধরনের চিন্তাধারাই তো ইসলাম বিরুদ্ধ

চিন্তাধারা! এ তো রাহবানিয়্যাত বা সন্ন্যাসবাদেরই নামান্তর। এই সন্ন্যাসবাদের পক্ষে তো আল্লাহ্ কোন দলীল ও সনদ নাযিল করেন নি। এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহ ও দয়ার উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْنَ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ وَلَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি তাদের অবশ্যই পৃথিবীর খিলাফতের অধিকারী করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের তিনি খিলাফতের অধিকারী করেছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য যে দীনকে পছন্দ করেছেন সেই দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করে দেবেন এবং ভীতির পর তাদের তিনি নিরাপত্তা দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আর আমার সাথে শরীক বানাবে না কিছুকে। এরপরও যারা কুফরী করবে ওরাই তো ফাসিক, সৎকর্মত্যাগী! [সূরা আন-নূর ঃ ৫৫]

আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

সত্যদ্রোহীদের সাথে লড়তে থাকবে যতদিন ফিতনা (কুফরীর অরাজকতা) খতম না হবে আর দীন সর্বতোভাবে না হবে কেবল আল্লাহর জন্যই।

[সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ

তাদের আমি পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে তারা কায়েম করে সালাত, আদায় করে যাকাত আর সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্র কাছেই হলো সকল কিছুর পরিণাম।

[সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৪১]

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য বিজয়, ক্ষমতা, ইয্যত ও প্রাধান্য অর্জনের ওয়াদা করেছেন বটে, কিন্তু শর্ত হলো তাদেরকে ঈমানী গুণে হতে হবে গুণান্বিত, আর তাদের সকল কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। সম্মান ও ক্ষমতা লাভ তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ মকসুদ ও উদ্দেশ্য নয়, বরং তা হলো কাজের বিনিময় ও ফলাফল। এ হলো আল্লাহপ্রদত্ত পুরস্কার যা কখনও মানুষের লক্ষ্যস্থল ও উদ্দেশ্য-বিন্দু নয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

দেখ, তোমরা হতবল হয়ো না, তোমরা চিন্তিত হয়ো না, তোমরা যদি সত্যই মু'মিন হও তবে বিজয় ও প্রাধান্য তোমাদেরই।

[সূরা আলে-'ইমরান ঃ ১৩৯]

কুরআন করীমের বহু স্থানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বান্দা থেকে আল্লাহ্ যে জিনিসটি চান, আর যে জিনিস আল্লাহ্র কাছে বান্দার কাজে আসবে তা হলো 'কলবে সালীম' বা সকল ধরনের বক্রতা থেকে মুক্ত রোগহীন বিমলিন নিষ্কলুষ হৃদয়।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ - اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

সেইদিন (কিয়ামতের দিন) ধন-সম্পদ কোন উপকার করতে পারবে না, আর না পারবে সন্তান-সন্ততি। তবে যে আল্লাহ্র কাছে আসবে নিষ্কলুষ ও সুপবিত্র হৃদয় নিয়ে (সে পারবে বাঁচতে)। [সূরা আশ-শু'আরা ঃ ৮৮, ৮৯]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذْ جَاءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

যখন তিনি এলেন তাঁর প্রভু পরওয়ারদিগারের কাছে নিষ্কলুষ ও সুপবিত্র হৃদয় নিয়ে। [সূরা আস-সাফফাত ঃ ৮৪]

সুতরাং হৃদয়ের বিমলিনতা ও সুপবিত্রতার পরিপন্থী প্রতিটি বস্তু থেকে, যা হৃদয়কে কলুষ করে, সেই ধরনের প্রতিটি বিষয় থেকে যে জিনিস সম্পর্কে প্রতিমা উপাস্যরূপে পরিগণিত হওয়ার আশংকা হয় এবং যা কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর শরীক ও অংশী হওয়ার ভয় হয় সেই সব কিছু সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ

ও সতর্ক থাকতে হবে; যে কোন মূল্যে এই ধরনের বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ـ

সেই ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করেছেন কি যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে উপাস্য ও মা'বুদ বানিয়ে রেখেছে ? [সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ـ

শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরার রক্তের মতো ছুটে যায়।[১]

৩. এই দীনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, আম্বিয়া-ই-কিরাম যে দাওয়াত ও পয়গাম এবং যে শরীয়ত ও আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে আসেন সেই সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন থাকেন। এসব সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও গভীর হয়ে থাকে। কোন অবস্থাতেই, এমন কি সে দাওয়াত ও মিশনকে জনপ্রিয় করে তোলার বা সফল করার তথাকথিত মুসলিহাত বা সুযোগ গ্রহণের খাতিরেও তাঁরা কখনও স্বীয় পয়গাম ও শরীয়তের মধ্যে যে কোন প্রকার বেশ-কম বা অদল-বদলের সুবিধাবাদী পন্থা গ্রহণ সহ্য করেন নি। তাঁদের এখানে আপোসমূলক সুবিধাবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন, কোন সুযোগ নেই। আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে হুকুমই আপনি পেয়েছেন তা শুনিয়ে দিন, আর মুশরিকদের কোন খেয়াল করবেন না। [সূরা আল-হিজর ঃ ৯৪]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ

হে রাসূল! আপনার প্রভুর তরফ থেকে যা কিছু আপনার ওপর নাযিল হয়েছে সব কিছু লোকদের পৌঁছিয়ে দিন। যদি এরূপ না করেন তবে

১. বুখারী, মুসলিম।

আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তখন ত্রুটিপূর্ণ রইলেন। আর আল্লাহ্ মানুষ থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। [সূরা আল-মায়িদা ঃ ৬৭]

আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَدُّوْا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ -

এরা চায় তুমি যদি নরম হও সুবিধাবাদী পন্থা গ্রহণ কর তবে তারাও নরম পন্থা গ্রহণ করবে। [সূরা আল-কলম ঃ ৯]

তাওহীদ ও ইসলামের সকল বুনিয়াদী আকীদা ও বিশ্বাস, এমন কি দীনের রুকন-আরকান ও ফরযসমূহের ব্যাপারে পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোনদিন আপোসমূলক সুবিধাবাদের নীতি গ্রহণ করেন নি। চটকদার করে কোন কিছু পেশ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এই চাটুকারিতা ও সুবিধাবাদ হলো সর্বকালের ও সর্বযুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য, নিজেদের যারা স্বীয় ধারণায় অতি বাস্তববাদী ও কাজের মানুষ বলে মনে করে থাকেন।

তায়েফ বিজয়ের পর তৎকালীন আরববিশ্বে কুরায়শদের পর সবচেয়ে সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় কবিলা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে হাযির হলো। দরখাস্ত জানাল, ইসলাম গ্রহণের পরও যেন তাদের লাত নামক দেবীকে তিন বছরের জন্য পূর্বাবস্থায় রাখার অবকাশ দেওয়া হয়; এটির সাথে অন্যান্য প্রতিমার মতো যেন আচরণ না করা হয়। এই প্রতিমার কারণেই সে যুগে মক্কার পর তায়েফের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সবার কাছে বেশি এবং তা ছিল আরবের দ্বিতীয় ধর্মীয় কেন্দ্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার 'না' করে দিলেন। তারা দুই বছর, পরে অন্তত এক বছরের অবকাশ চাইলে তা দিতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তারা এতটুকুতে নেমে আসল, তারা আরয করল ঃ তায়েফ যাওয়ার পর অন্তত এক মাসের অবকাশ আমাদের দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই শেষ আবেদনটিও গ্রাহ্য করলেন না, অধিকন্তু হযরত আবূ সুফিয়ান (তায়েফের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল) ও বানু ছাকীফ গোত্রের অন্যতম সদস্য মুগীরা ইবন শু'বাকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন তায়েফে গিয়ে লাত ও এর মন্দিরটি ধূলিসাৎ করে দেন।

উক্ত প্রতিনিধি দল তাদের দরখাস্তে এই কথাও বলেছিল, তাদের জন্য যেন নামাযের হুকুম মাফ করে দেয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ যে দীন ও ধর্ম ব্যবস্থায় সালাত নেই সেই দীনে কোন মঙ্গল নেই।

আলোচনা শেষে তারা তাদের এলাকা তায়েফে ফিরে গেল। এদের সাথে হযরত আবূ সুফিয়ান ও হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাও (রা) গেলেন এবং নবীজীর নির্দেশ মতো লাত মন্দিরটি ধূলিসাৎ করে দিলেন। ছাকীফ গোত্রে ইসলাম প্রচার লাভ করে এবং পুরো তায়েফ এলাকা ইসলামের ছায়াতলে এসে শামিল হয়।[১]

এ-ও আম্বিয়া-ই-কিরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাঁরা দীনের তবলীগ ও আহ্বানের ক্ষেত্রে, তাঁদের কথাবার্তা ও প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে সব সময় এমন ধরনের রীতি ও পরিভাষা ব্যবহার করেন যে রীতি ও পরিভাষা তাঁদের দাওয়াত ও পয়গামের মূল প্রাণ এবং নবূওয়াত ও রিসালাতের মেযাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। তাঁরা খোলাখুলিভাবে, পূর্ণ বিবরণ ও সুস্পষ্টতার সাথে মানুষকে আখিরাতের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, জান্নাত, এর নিয়ামতসমূহ ও এর আস্বাদনের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, জাহান্নামও এর আযাব ও ভয়াবহতা সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন, জান্নাত ও জাহান্নামের এমনভাবে তাঁরা আলোচনা করেন যেন সব কিছু তাঁদের চোখের সমক্ষে। বুদ্ধি ও মেধাভিত্তিক দলীল-প্রমাণ, জাগতিক সুবিধা ও লাভালাভের স্থলে তাঁরা গায়েবের প্রতি ঈমানের আহ্বান জানান।

তাঁদের যুগও বস্তুতান্ত্রিক দর্শন ও আদর্শ থেকে একেবারে শূন্য ছিল না। অবশ্য সেই বস্তুতান্ত্রিকতা সমকালীন পরিস্থিতি ও মান অনুসারেই হতো বটে, কিন্তু সেই সময়ও তো বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ বিশেষ পরিভাষা প্রচলিত ছিল। আম্বিয়া-ই-কিরাম এই সমস্ত পরিভাষা সম্পর্কে বেখবর হতেন না। তাঁরা নিজ নিজ যুগকে ভালভাবেই জানতেন। তাঁরা জানতেন যুগের পরিভাষাসমূহ আর এও জানতেন এইগুলো হচ্ছে চালু মুদ্রার মতো। এতদ্সত্ত্বেও মানুষকে কাছে টানার জন্য নিজের দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে তাঁরা এই সব চালু পরিভাষার সাহায্য গ্রহণ করতেন না, বরং তারা আল্লাহ্র সকল গুণ ও কার্যাবলী অনুসারে তাঁর প্রতি ঈমানের ও ফিরিশতা, তাকদীর (ভাল হোক বা মন্দ) ও মৃত্যুর পর উত্থানের প্রতি ঈমানের আহ্বান জানাতেন। কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ ও হীনমন্যতা ছাড়াই জোরের সাথে ঘোষণা করতেন, তাঁদের এই আহ্বান কবূল করার এবং এসব কিছুর ওপর ঈমান আনার বিনিময় ও পুরস্কার হলো জান্নাত এবং আল্লাহ্ তা'আলার রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জন।

১. যাদুল মা'আদ ১ ঃ ৪৫৮-৫৯।

আকাবায়ে ছানিয়ার বায়'আতের ঘটনাটি হলো দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে, দীনের প্রতি আহ্বান ও এর প্রচারের ক্ষেত্রে আম্বিয়া-ই-কিরামের মেযাজ ও তাঁদের অনুসৃত রীতি ও কর্ম পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সময়েই হয়েছিল হিজরতের কথা। বাহাত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সমবায়ে গঠিত ইয়াছরিব (মদীনা শরীফের প্রাচীন নাম)-এর একদল লোক তখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসে। তারা আকাবার সমীপবর্তী উপত্যকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য একত্র হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব (তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি) সমভিব্যাহারে উক্ত স্থানে তশরীফ আনেন। তিনি তাদের কুরআন পাক তিলাওয়াত করে শোনালেন। তাদের এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের আহ্বান জানালেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করলেন। শেষে বললেনঃ আমি তোমাদের থেকে এই কথার বায়'আত ও অঙ্গীকার নিতে চাই, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে যেভাবে হিফাজত করে থাক আমার হিফাজতেরও তদ্রূপ খেয়াল করবে। আনসারীরা সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকেও তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন, তিনি তাদেরে ছেড়ে নিজের কবিলায় আর ফিরে আসবেন না।

এই আনসারীরা বুদ্ধিমান বা হুঁশিয়ার ছিলেন না, তা নয়। তাঁরা এই বায়'আত ও চুক্তির সুদূরপ্রসারী ও আশংকাজনক ফলাফল সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এই চুক্তির অর্থ হচ্ছে, চতুষ্পার্শের কবিলাগুলোর, এমন কি সারা আরবের কবিলাগুলোর দুশমনী বরণ করে নেয়া। তাঁদের অত্যন্ত অভিজ্ঞ এক সাথী হযরত আব্বাস ইবন উবাদা আনসারী তাদেরে উক্ত ধরনের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ও হুঁশিয়ারও করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই একবাক্যে জবাব দিয়েছিলেন ঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদের ক্ষতি ও আমাদের খান্দানের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যার আশংকা স্বীকার করেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে যাচ্ছি।

অতঃপর তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যদি এই ওয়াদা পূরণ করে দেখাতে পারি তবে আমরা কী পাব?

এই ধরনের কোন নাযুক পরিস্থিতির সম্মুখীন যদি কোন রাজনৈতিক বা জাতীয় নেতা, এমন কি রাজনীতি সচেতন মামুলী কোন মানুষও হতো তবে তার কাছে এই প্রশ্নের নির্ঘাত উত্তর হতো ঃ অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার পর এর ফলে

তোমাদের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে, একটি সাধারণ কবিলা হিসাবে বর্তমানে তোমরা যে অবস্থায় আছ, তদস্থলে সারা আরবে তোমাদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, বিরাট এক শক্তি হিসাবে তোমাদের অভ্যুদয় ঘটবে। এই ধরনের কিছু ঘটা কাল্পনিক বা অযৌক্তিক কোন কিছু ছিল না। তখনকার অবস্থায় এই বিষয়টি একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হওয়ার সকল সম্ভাবনা ও আলামত সুস্পষ্ট ছিল। এই ইয়াছরিববাসীদেরই একজন কিছু আগেই আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছিল ঃ

"আমরা এমন এক সম্প্রদায় থেকে এসেছি, যাদের মতো এত অনৈক্য ও ভেদাভেদের শিকার আর কোন জাতি আছে কিনা সন্দেহ! আমাদের আশা, আপনার ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে একতা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি। তাদের সামনে আমরা আপনার এই দাওয়াত পেশ করব। যে দীন আমরা গ্রহণ করেছি সেই দীনের প্রতি আমরা তাদের আহ্বান জানাব। আপনার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদের এক করে দেন তবে আপনার চেয়ে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী কোন ব্যক্তি হবে না"।[১]

রাসূল (সা) উত্তরে এদিকে গেলেনই না, এই ধরনের কিছুই বললেন না। 'হে আল্লাহ্র রাসূল! বিনিময়ে আমরা কী পাব?' এই জিজ্ঞাসার উত্তরে কেবল বললেন ঃ জান্নাত। তাঁরা তখন হাত বাড়িয়ে আরয করলেন ঃ আপনি মেহেরবানী করে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর তাঁরা সকলেই বায়'আত হয়ে গেলেন।[২]

এই গায়রত, মর্যাদাবোধ, নববী কার্যক্রমের পরিপূর্ণতা ও চূড়ান্ত পর্যায় তার ফলশ্রুতিতেই দেখা যায়, কোন নবী বা রাসূল কোন শর'ঈ বিধি-বিধানের বেলায় কোন ধরনের শিথিলতা ও পরিবর্তনের বা কারো সুপারিশ ও প্রভাবে কোন হুকুমকে স্থগিত রাখতে বা মুলতবী করতে কখনও প্রস্তুত হন না। নিকট ও দূর, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের ওপর সমানভাবে আল্লাহ্র হুদূদ ও আইন তাঁরা প্রয়োগ করেন। সম্ভ্রান্ত বানূ মাখযূম কবিলার জনৈকা মহিলা একবার চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিশেষ স্নেহাস্পদ হযরত উসামা ইব্ন যায়দ এর জন্য সুপারিশ করতে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত রাগ করে ধমক দিয়ে বলেছিলেন ঃ

১. সীরাত ইব্ন হিশাম, ক ১ ঃ ৪২৯।
২. সীরাত ইব্ন হিশাম, ক ১ ঃ ৪২৯।

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হুদূদ সম্পর্কে সুপারিশ করতে এসেছ? পরে লোকদের একত্র-করে ইরশাদ করেছিলেন ঃ লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তীরা এজন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে কোন প্রতিপত্তিশীল বা খান্দানী বংশের কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো আর কোন দুর্বল বা সাধারণ কেউ চুরি করলে তার ওপর আইন জারী করা হতো। আল্লাহ্‌র কসম! আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে তার হাত কাটতেও আমি দ্বিধা করব না।[১]

আম্বিয়া কিরামের সাথী সাহাবী, নায়েব ও স্থলাভিষিক্তরাও উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছেন এই গায়রত ও দীনী মর্যাদাবোধ। তাঁরাও জাগতিক সফলতা বা অসফলতা ও লাভ-লোকসান থেকে চক্ষু বন্ধ করে কুরআনী শিক্ষা, শর'ঈ হুকুম-আহকাম, ইসলামের রীতিনীতি ও আইন-কানূনের হিফাযত করে এসেছেন। জাফনা রাজপরিবারের অন্যতম প্রধান রাজা জাবালা ইবন আয়হাম গাস্‌সানীর সাথে ফারূকে আজম হযরত উমর (রা) যে আচরণ করেছিলেন তা হচ্ছে এই বিষয়ের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজো দেদীপ্যমান হয়ে আছে তা ইতিহাসের পাতায়!

আকক্ ও গাস্‌সান গোত্রের পাঁচ শ' সঙ্গীসহ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে জাবালা মদীনায় হাযির হয়েছিল। মদীনায় সে যখন প্রবেশ করছিল তখন তার ঠাটঠমক ও চাকচিক্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ দেখার জন্য মদীনার অন্তঃপুরবাসীরা পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। হযরত উমর (রা) হজ্জে রওয়ানা হলে সেও তাঁর সাথে রওয়ানা হলো। বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করার সময় বানূ ফুযারার জনৈক ব্যক্তির পায়ের নীচে তার তহবন্দের আঁচল লেগে তা খুলে যায়। জাবালা গোস্বায় উক্ত ফুযারীর নাকে থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। ফুযারী আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-এর কাছে নালিশ দায়ের করে। তিনি জাবালাকে ডেকে পাঠালেন। হাযির হলে তাকে বললেন ঃ তুমি এ কাজ করেছ? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! এ লোকটি আমার তহবন্দ খুলে ফেলে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মানের খেয়াল যদি বাধা না হয়ে দাঁড়াত তবে এর মাথায় তলওয়ারের আঘাত হানতাম। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ এবার তুমি স্বীকার করেছ। এখন হয় তুমি এই লোকটিকে সন্তুষ্ট করবে, নয়ত আমি বিচারে কিসাস নেব। জাবালা বলল ঃ কি করবেন? হযরত উমর (রা) বললেন ঃ উক্ত ফুযারীকে বলব, তার নাকে তুমি যেরূপ আঘাত করেছ সেও যেন তোমার নাকে তদ্রূপ আঘাত করে। জাবালা

১. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হুদূদ, বাবু হাদ্দিসসারকা ওয়া নিসাবিহ।

বিস্মিত হয়ে বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন! তা কেমন করে হয়? আমি আমার এলাকার সিংহাসনের অধিকারী, আর এ তো একজন সাধারণ মানুষ! হযরত উমর (রা) উত্তর দিলেন ঃ ইসলাম তোমাকে ও তাকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে। তাকওয়া ও গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার গুণ ছাড়া তুমি এর থেকে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ নও। জাবালা বলল ঃ আমার তো ধারণা ছিল, ইসলাম গ্রহণ করায় জাহিলী সময়ের তুলনায় আমার ইয্যত ও মূল্য আরো বাড়বে। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ কথা ছাড়। হয়ত একে সন্তুষ্ট করবে, নয়ত কিসাসের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

হযরত উমর (রা)-এর অবস্থা দেখে জাবালা বলল ঃ আমাকে আজ রাতটুকু ভাববার সময় দিন। হযরত উমর (রা) তার আবেদন গ্রহণ করে অবকাশ দিলেন। রাতের আঁধারে অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে জাবালা তার উট-ঘোড়া নিয়ে শামের দিকে পালিয়ে গেল। সকালে মক্কায় আর তার কোন নিশানা পাওয়া গেল না। বহুদিন পর জাবালার দরবার সঙ্গী জুছামা ইবন মুসাহিক কিলানীর কাছে জাবালার শাহী ঠাটঠমক ও দাপটের কথা শুনে হযরত উমর (রা) কেবল বলেছিলেন ঃ বেচারা মাহরূম রইল! আখিরাতের বিনিময়ে সে দুনিয়া খরিদ করেছে। তার এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি।[১]

আমাদের উক্ত আলোচনার অর্থ এই নয়, আম্বিয়া কিরাম দাওয়াত ও তাবলীগ, দীনের প্রচার ও প্রসার সাধনের ক্ষেত্রে হিকমতের ধার ধারতেন না বা সমকালীন মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির মানানুসারে তাঁরা এর উপস্থাপন করতেন না। আমাদের কথার মর্ম কখনও তা নয়। এ তো কুরআনের স্পষ্ট আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনে সংঘটিত বহু ঘটনার পরিপন্থী কথা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ -

আর আমি সকল নবীকে তাঁর স্বজাতির (প্রচলিত) ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি; যেন তাঁরা লোকদের (আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম) সুস্পষ্ট করে বলে দিতে পারেন। [সূরা ইবরাহীম ঃ ৪]

প্রচলিত ভাষা বলতে কেবল কতগুলো শব্দ বা বাক্যকে বোঝানো হয় নি। অধিকন্তু ভাষার ব্যঞ্জনা, বাক্যরীতি, উপস্থাপনা পদ্ধতি সব কিছুই এই শব্দটির অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এর অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো হযরত

১. বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ ঃ ১৪২; তারিখ ইবন খালদুন ১২ ঃ ২৮১।

ইউসুফ (আ) জেলে থাকাকালে তাঁর দুই সাথীকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (অ) স্ব-স্ব জাতি ও তাঁদের যুগের দুই আত্মগর্বী সম্রাটের সাথে যে আলোচনা করেছিলেন তা।[১] আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আখেরী নবী ও রাসূলকে লক্ষ্য করে এবং তাঁর মাধ্যমে কুরআনের প্রত্যেক পাঠক ও ইসলামের প্রত্যেক মুবাল্লিগ ও প্রচারকর্মীকে এই হিদায়াত ও উপদেশই দিয়েছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

হে নবী! আপনার প্রভুর পথে মানুষকে ডাকুন হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং বিতর্ক করুন তাদের সাথে সুন্দরতম পন্থায়।

[সূরা আন-নাহ্ল ঃ ১২৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে যখন তাবলীগ ও দীনের প্রতি দাওয়াতের কাজে প্রেরণ করতেন তখন তাদেরে কোমলতা, স্নেহ ও সহৃদয়তা, আসানী ও সহজ করে উপস্থাপন করার সাথে সাথে সুসংবাদ দানেরও বিশেষ উপদেশ দিতেন। হযরত মু'আয ইবন জাবাল ও হযরত আবূ মূসা আশ'আরীকে ইয়েমেন প্রেরণের সময় উপদেশ দিয়ে ইরশাদ করেছিলেন ঃ

يَسِّرَا وَلَاتُعَسِّرَا؛ بَشِّرَا وَلَاتُنَفِّرَا ـ

সহজ করো, কঠোর করো না; সুসংবাদ দিও, বিরক্তির সৃষ্টি করো না।

খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ

(হে মুহাম্মদ!) আল্লাহর মেহেরবানীতে আপনার মেযাজ তাদের জন্য কোমল। যদি আপনি খারাপ স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতেন তবে এরা ভেগে যেত আপনার চারপাশ থেকে। [সূরা আল-'ইমরান ঃ ১৫৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে সকল সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন ঃ

১. এই নসীহত ও আলোচনার সাহিত্যিক, বর্ণনাগত ও মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য–লেখকের "দা'ওয়াত ওয়া তাবলীগ কা মুজিযানা উসলুব।"

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ -

সহজ করার উদ্দেশে হয়েছে তোমাদের অভ্যুদয়, কঠিন করার জন্য তোমাদের অভ্যুদয় হয় নি।[১]

এই সম্পর্কে বহু আয়াত, হাদীস ও দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান, যার গণনা মুশকিল।[২] পূর্ববর্তী নবীগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও ছিল তা। একাধিক নবী ও রাসূলের নামোল্লেখসহ আলোচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা শেষে গিয়ে বলেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ -

ওঁরা ছিলেন তাঁরাই, যাঁদেরে আমি দিয়েছিলাম কিতাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি ও নুবূওয়াত। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৮৯]

তবে এই সহজীকরণ ও ক্রমপর্যায় নির্ণয়ের বিষয়টি হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং জুযয়ী বা দীনের শাখা-প্রশাখার সাথে বিজড়িত। আকাইদ, ঈমান ও ইসলামের বুনিয়াদী নীতিমালার সাথে এই বিষয় সম্পর্কিত নয়। আকাইদ ও আল্লাহ্র সাথে যে বিষয়সমূহ সম্পর্কিত ও বিজড়িত সেই সব বিষয়ে প্রতি যুগের নবীগণই ছিলেন লোহা থেকেও কঠোর, চাকচিক্যহীন রুক্ষ ও পাহাড় থেকেও মযবুত ও সুদৃঢ়।

৪. নববী বৈশিষ্ট্য ও আম্বিয়া কিরামের দাওয়াত ও মিশনের রূপ-প্রকৃতির লক্ষণীয় একটি দিক হলো, পরকালীন জীবন, সেখানকার সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের প্রতিই তাঁরা আসল জোর ও তাগিদ দিয়ে থাকেন। তাঁরা এত বেশি এই কথাটির আলোচনা করেন এবং এই কথাটির এত বেশি গুরুত্ব ও এর প্রতি ধ্যান দিয়ে থাকেন যে, এই বিষয়টিই তাঁদের দাওয়াত ও আহ্বানের কেন্দ্রবিন্দু এবং বৃত্তমূলে পরিণত হয়ে ওঠে। পরিষ্কার মানসিকতা নিয়ে একজন যদি তাঁদের বিভিন্ন কাহিনী ও তাঁদের বাণীসমূহ অধ্যয়ন করে তবে তার পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি হবে, আখিরাতই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য এবং তা যেন ছিল তাঁদের সামনে দৃশ্যমান ও সন্দেহাতীত বাস্তব সত্য হিসাবে প্রতিভাত! এই বিষয়টি যেন তাঁদের প্রকৃতিগত ও স্বভাবজ বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এর বিশ্বাস তাঁদের অনুভূতিকে এবং তাঁদের ধ্যান ও মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে ফেলেছিল। মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে যে সমস্ত নিয়ামত ও পুরস্কার রেখেছেন এবং কাফির ও অবাধ্যদের জন্য সেখানে যে আযাব

১. বুখারী শরীফ ১ ঃ ৩৫।
২. এই বিষয়ে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার তাফসীর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নির্ধারণ করে রেখেছেন এই সবের সার্বক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ও চিন্তাই হলো মূল নিয়ামক ও আবেদন যা তাঁদের প্রত্যয়ের বিশুদ্ধতা, জীবনের ইসলাহও সংশোধন, আল্লাহ্‌র সাথে আবদিয়্যাত ও দাসত্ব সম্পর্ক ঠিক করার প্রতি আহ্বানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলত। এই জিনিসই তাঁদেরকে করে তুলত অস্থিরতর—পেরেশান, হরণ করে নিত তাদের রাতের ঘুম ও দিনের সুখ। কোন অবস্থাতেই তাঁরা স্বস্তি পেতেন না তখন।

সীরাতের বোদ্ধা অধ্যয়নকারী প্রত্যেকেই স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন, কেবল নৈতিক ও চারিত্রিক প্রয়োজনের খাতিরে বা ইসলাহ ও সংস্কারের প্রয়োজন পূরণের জন্যই আম্বিয়ায়ে কিরাম 'দা'ওয়াত ইলাল আখিরা' বা আখিরাতের প্রতি আহ্বান জানান নি, আর এর জন্যই কেবল তাঁরা এর গুরুত্ব প্রচার করেন নি। ঠিক বটে চারিত্রিক, নৈতিক ও ইসলাহী সংস্কার ছাড়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কেন, কোন সুস্থ ও সৎ সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বও সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোন বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহযীব ও তামাদ্দুনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার চিন্তাও করা যায় না। এই কথাটি ঐতিহাসিক সত্য। মানব জাতির গোটা ইতিহাস এর সাক্ষী। কিন্তু আম্বিয়া কিরামের কর্মপদ্ধতি, তাঁদের সীরাত, এমনিভাবে তাঁদের স্থলাভিষিক্তগণের কর্মপদ্ধতিও হচ্ছে অন্যদের থেকে ভিন্নতর।

এই উভয় দলের দা'ওয়াত-পদ্ধতির মাঝে অন্যতম আরেকটি পার্থক্য হলো, আম্বিয়া কিরামের দা'ওয়াত ও তাবলীগ পদ্ধতি বলিষ্ঠ প্রত্যয়, আত্মিক প্রেরণা, হৃদয়াবেগ, দরদ ও মানুষের প্রতি অপার মমতাবোধে থাকে আপ্লুত। অন্যান্য সমাজ সংস্কারের কর্মপদ্ধতিতে তা কেবল বিধিবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে হয় নির্মিত। নৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের সীমা পর্যন্তই কেবল এর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে এবং তা গ্রহণের তালকীন ও পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। এই উভয় পদ্ধতির পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, তা যুক্তি-প্রমাণের অবকাশ রাখে না।

৫. পঞ্চম প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, সন্দেহ নেই, আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন প্রকৃত নির্দেশদাতা, তিনিই একক ক্ষমতাধিকারী সম্রাট আর বিধান প্রণয়নের অধিকার একমাত্র তাঁরই। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ -

নির্দেশ ও হুকুম কেবল আল্লাহ্‌র। [সূরা ইউসূফ ঃ ৪০]

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ -

এদের জন্য কি এমন শরীক রয়েছে যারা তাদের জন্য দীনের এমন সব বিধান নির্ণয় করে দিয়েছে যেগুলোর হুকুম আল্লাহ্ দেন নি?

[সূরা আশ-শুরা ঃ ২১]

কিন্তু একথাও সত্য, খালিক ও মাখলুক, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, 'আব্‌দ ও মা'বূদ, বান্দা ও আরাধ্যের সম্পর্ক মূলতই শাসক ও শাসিত, নির্দেশদাতা ও নির্দেশ পালনকর্তা এবং একজন বাদশাহ ও তাঁর প্রজার মধ্যকার সম্পর্কের চেয়ে বহু বিস্তৃততর, ব্যাপকতর, তুলনামূলকভাবে অনেক গভীর, অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও নাযুক। কুরআন করীমে যেভাবে ও যত বিস্তারিতভাবে ও হৃদয়গ্রাহী ব্যঞ্জনায় আল্লাহ্‌র সিফাত ও নামসমূহের উল্লেখ হয়েছে[১] সেগুলো লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কাছ থেকে কেবল এতটুকুই চান না যে সে তাঁকে শুধু একজন সর্বোচ্চ সম্রাট ও শাসক, একক এক নির্দেশদাতা হিসাবেই জ্ঞান করুক আর এই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারের বেলায় আর কাউকে শরীক বলে বিশ্বাস না করুক। অধিকন্তু এই সমস্ত আল্লাহ্‌র নাম, তাঁর সিফাত ও কার্যাবলী কুরআন করীমের সর্বত্র যেগুলোর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় এবং যে সমস্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতি মুহব্বত ও ভালবাসা[২] তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অধিক হারে তাঁর যিকর ও স্মরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে সেই সব কিছু সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, আল্লাহ্‌কে আমাদের ভালবাসতে হবে জান-প্রাণ দিয়ে, তাঁরই অন্বেষায় ও তাঁর সন্তুষ্টির পথে মন ও প্রাণ ঢেলে দিতে হবে, তাঁরই হাম্‌দ ও প্রশংসার গীত গাইতে হবে উঠতে, বসতে—সর্বাবস্থায় যেন তাঁরই নামের আলোচনা করা হয়, মন ও মগজে সর্বক্ষণ তাঁরই ধ্যান যেন ছেয়ে থাকে, তাঁরই ভয়ে যেন মানুষ ভীত থাকে, সন্ত্রস্ত থাকে, কেবল তাঁরই সামনে যেন যাচ্ঞার হাত প্রসারিত করে, তাঁরই অপার সৌন্দর্য অবলোকনে চক্ষু নিবদ্ধ থাকে, তাঁরই পথে সব কিছু বিলিয়ে দেয়ার, উজাড় করে উৎসর্গ করে দেয়ার, এমন কি নিজের জান পর্যন্ত লুটিয়ে দেয়ার উন্মাতাল প্রেরণা সর্বদা যেন জাগরুক থাকে।

৬. দ্বীনের মেযাজ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনায় এই বিষয়টিরও সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত, আম্বিয়া কিরাম (আ), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা হচ্ছেন যাঁদের মধ্যে প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম, যে জাতির

১. উদাহরণস্বরূপ সূরা হাশর-এর শেষের আয়াতগুলো وَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

২. যেমন (وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ-وَیُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَهٗ) ইত্যাদি যে সমস্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকর ও স্মরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং যেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রতি নবীগণের প্রেম, ভালবাসা ও প্রিয়তম সব কিছু কুরবানীর কথার উল্লেখ রয়েছে, সে আয়াতগুলো দ্রষ্টব্য।

নিকট তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন সেই সমস্ত জাতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেবল এমন কোন ডাক পিয়ন বা পত্রবাহকের মতো ছিল না, ঠিকানামত পত্র বা ডাক পৌঁছে দেয়া পর্যন্তই যার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ, পরে আর এই বিষয়ে তার কোনরূপ সম্পর্ক বা দায়-দায়িত্ব থাকে না, তেমনিভাবে যাদের কাছে ডাক প্রেরণ করা হয়েছে তাদেরও কোন সম্পর্ক থাকে না মাঝের এই মাধ্যম ও বাহকের সাথে। এরা নিজেদের ক্ষমতা ও কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আম্বিয়া কিরাম যাদের কাছে প্রেরিত হন স্ব-স্ব নবী ও রাসূলের সাথে তাঁদের সম্পর্ক সাময়িক বা তা একটা আইনের সম্পর্ক মাত্র, তাঁদের সীরাত, আচার-আচরণ, চলাফেরা, ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতি, তাঁদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সাথে এদের কোন আগ্রহ বা কৌতূহল থাকতে পারে না—ইত্যাকার ধারণা অত্যন্ত ভুল, ত্রুটিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন। অতীতে যারা নুবূওয়াত ও আম্বিয়া-কিরামের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত ছিল তাদের মধ্যেই ঈদৃশ ধারণা প্রচলিত ছিল। আমাদের যুগেও তাদের মধ্যে এই ধরনের চিন্তাধারার প্রচলন দেখা যায় যারা সাধারণত ইসলামে সুন্নতের মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং হাদীস ও এর দলীল হওয়া অস্বীকার করে থাকে। এমনিভাবে যাদের মাঝে দীন সম্পর্কে খ্রিস্টীয় ভাবধারার প্রভাব বিদ্যমান, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে যারা চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং এর প্রাবল্য যাদের মধ্যে অধিক—মূলত তারাই বর্তমানে উক্ত রূপ ধারণার শিকারে পরিণত।

এর বিপরীতে আসল সত্য হলো এই, আম্বিয়া-কিরাম আলায়হিমুস সালাম হলেন সমগ্র মানবতার জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ, সুমহান ও অনুকরণীয় নমুনা। স্বভাব-চরিত্র, চেতনা ও চিন্তাধারা, মেযাজ ও রুচি গ্রহণ ও বর্জন, সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা হলেন সবচে' পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত মাপকাঠি। তাঁরাই হচ্ছেন ইলাহী করুণার অবতরণস্থল, তাঁর আলতাফ ও তাজাল্লিয়াতের অপার মহিমা ও মেহেরবানীর কেন্দ্রস্থল। তাঁদের অভ্যাস ও আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, জীবনের সকল নকল-হরকত ও রীতিনীতি আল্লাহ্‌র কাছে খুব প্রিয়। সকল জীবন ব্যবস্থার মাঝে তাঁদের অনুসৃত জীবনব্যবস্থা, অন্য সব মানুষ ও দলের চরিত্রের মাঝে তাঁদের অন্য সকলের বিভিন্ন অভ্যাস ও আদতের মাঝে তাদের আদত ও অভ্যাসই হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র অধিক পছন্দের। তাঁরা যে পথ ও যে পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন তা-ই আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় বলে গণ্য হয়। অন্য সকল পদ্ধতির তুলনায় তাঁদের পথ-পদ্ধতিই প্রাধান্য পায়। আর তা কেবল এ জন্যই প্রাধান্য পায় যে, নবীগণের মুবারক কদম এতে পড়েছে। তাঁদের প্রিয়

সকল বিষয়-আশয়, সকল শা'আইর, বিশেষ নিদর্শনসমূহ ও তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত সকল জিনিস ও সকল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে যায় আল্লাহ্‌র পছন্দ ও ভালবাসা। এইগুলোকে গ্রহণ করা, নিজের মধ্যে তাঁদের চরিত্রের একটু ঝলক সৃষ্টি করতে পারাও আল্লাহ্‌র প্রেম ও সন্তুষ্টি দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করে তোলার নিকটতম সহজতম পথ। কারণ বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু আর শত্রুর বন্ধুও শত্রু বলেই তো পরিগণিত হয়ে থাকে।

আল-কুরআনে খাতামুন্নাবিয়্যীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যবানী ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

(হে নবী! লোকদের) বলে দিন ঃ যদি তোমরা ভালবাস আল্লাহ্‌কে তবে তোমরা অনুসরণ কর আমারই, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন এবং মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহসমূহ। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। [সূরা আল-ইমরান ঃ ৩১]

পক্ষান্তরে জুলুম বা সীমালংঘনের কাজে শামিল হওয়া, কুফরীর পথ গ্রহণ করা, কাফিরদের রীতিনীতির প্রতি অনুরাগ, তাদের জীবনপদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া, তাদের সাথে বাহ্যিক বা আন্তরিক সাদৃশ্য স্থাপন—এসব জিনিসকে ইসলামে আল্লাহ্‌র ক্রোধ সঞ্চারকারী এবং বান্দাকে আল্লাহ্ থেকে বিদূরিতকারী বিষয় বলে নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَاتَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ -

তোমরা ঝুঁকে যেয়ো না যারা জুলুম ও সীমালংঘন করে তাদের প্রতি। যদি তা কর তবে তোমাদের লেপটে ধরবে জাহান্নামের আগুন। তোমাদের তো আল্লাহ্ ছাড়া কোন বন্ধু নেই। অতঃপর (যদি তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড় তবে) তোমরা আর সাহায্য পাবে না কোথাও।

[সূরা হূদ ঃ ১১৩]

আম্বিয়া-কিরাম অনুসৃত বিশেষ এই রীতিনীতি ও আদত–অভ্যাসসমূহকে শরীয়তের যবান ও এর পরিভাষায় অভিহিত করা হয়ে থাকে খিসাল-ই-ফিতরাত

বা স্বভাব ও প্রকৃতিগত চরিত্র এবং সুনানুল হুদা বা হিদায়াতসমৃদ্ধ পথ ও পদ্ধতি নামে। ইসলাম এগুলোরই শিক্ষা দেয় এবং এগুলোর প্রতিই সকলকে উৎসাহিত করে থাকে।

যে ব্যক্তি এই সমস্ত গুণ ও রীতিনীতি নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করবে সে আম্বিয়া-কিরামের রঙে নিজেকে রঞ্জিত করে তুলতে পারে। এই রঙ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ -

(বলে দাও, আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহ্র রঙ, আর কার রঙ হবে আল্লাহ্র রঙের চেয়ে ভাল? আর আমরা তো তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করি।

[সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩৮]

ইসলামে শরীয়তের কোন একটি রীতির ওপর অন্য আরেকটি রীতিকে, এক ধরনের চরিত্র ও আচরণের ওপর অন্য আরেক ধরনের আচরণকে, এক ধরনের পদ্ধতির ওপর অন্য আরেক পদ্ধতিকে যে প্রাধান্য দিতে দেখা যায় এর আসল বুনিয়াদ—এর মূল তাৎপর্য এ-ই। এই কারণেই শরীয়তে ইসলামীর মধ্যে আম্বিয়া-কিরাম অনুসৃত রীতি-পদ্ধতি ও আচার-আচরণকে ঈমানদারদের মৌল বৈশিষ্ট্য, স্বভাব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বুনিয়াদী পথ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত যত পথ আছে, যত রীতিনীতি আছে, সব কিছুকে প্রকৃতি ও স্বভাবের বিশুদ্ধতাবিমুখ পথ ও জাহিলিয়াতের বৈশিষ্ট্য বলে ইসলাম চিহ্নিত করেছে। এই উভয় পথ ও রীতির মধ্যে (যদিও উভয় রীতির প্রতিই জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের অনুরক্ত দেখতে পাওয়া যায়) ফারাক কেবল এতটুকুই, এর একটি হলো আল্লাহ্র নবী ও প্রিয় সত্তাদের গ্রহণ করা পথ আর অপরটি হলো এমন সব ব্যক্তির গ্রহণ করা যাদের কাছে হিদায়াতের আলো নেই, আসমানী শিক্ষার রাহনুমায়ী নেই।

এই মৌল নীতি অনুসারেই খাওয়া-দাওয়ায় ও অন্যান্য কাজে ডান হাত ও বাম হাত ব্যবহারের পার্থক্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-গোজ, বসবাস ও তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক বহু বিষয়ের মূলনীতিগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর এটি হলো সুন্নতে নববী ও ইসলামী ফিকহের এক বিরাট ও সুবিস্তৃত অধ্যায়।[১]

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন লেখকের মানসাব-ই-নুবুওয়াত আওর ইসকে 'আলী মাকাম হামিলীন; পৃষ্ঠা ১১৮-১২০।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বেলায় তো এই প্রেক্ষিতটির আরো বেশি জোর দিতে হবে, এর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে কেবল আইন ও বিধিগত সম্পর্ক স্থাপনই যথেষ্ট নয়, বরং এই সম্পর্ক হতে হবে আত্মিক ও আবেগমণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে এমন সুগভীর ও স্থায়ী ভালবাসার সম্পর্ক হতে হবে যা জান-মাল ও পরিবার-পরিজনদের ভালবাসার চেয়ে হবে ঊর্ধ্বের এবং এ সব ধরনের ভালবাসার ওপরেও প্রাধান্যের অধিকারী। সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন বলে গণ্য হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলে সাব্যস্ত হয়েছি।[১]

অপর একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَّفْسِهٖ -

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন বলে গণ্য হতে পারবে না, যতক্ষণ না হব আমি তার কাছে তার নিজের চেয়েও অধিক প্রিয়।[২]

এই ক্ষেত্রে আমাদের এমন সব বিপরীতমুখী আবেদন ও কার্যকারণ সম্পর্কে সতর্ক ও হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং এইগুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলতে হবে যে সমস্ত বিষয় ও কারণ এই ভালবাসার স্রোতকে বিশুষ্ক বা দুর্বল করে দেয়, এই ভালবাসার আবেগ ও অনুভূতিকে করে দেয় ম্রিয়মাণ, সুন্নতের অনুসরণ করার জযবা ও প্রেরণাকে করে দেয় কমযোর ও দুর্বল, তাঁকে আল্লাহ্র পথ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ সত্তা, সর্বশেষ রাসূল ও সামগ্রিকভাবে সর্বক্ষেত্র অভিভাবক ও বন্ধুরূপে মানতে সৃষ্টি করে সন্দেহের এবং করে তোলে সীরাত ও হাদীস গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন ও মুতালা'আ থেকে বিমুখ ও অনাগ্রহী।

কুরআন করীমের সূরা আহযাব, সূরা হুজরাত, সূরা ফাতহ্ ইত্যাদি সূরার গভীর অধ্যয়ন, তাশাহ্হুদ ও সালাতুল জানাযায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাতের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে চিন্তা করলে, কুরআন

১. বুখারী, মুসলিম।
২. মুসনাদে আহমদ

শরীফে দরূদের প্রতি যেভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং দরূদের ফযীলত সম্পর্কে যে অসংখ্য হাদীস এসেছে এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে ভাবলে এই কথাই অবশ্যম্ভাবীরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিষয়ে একজন মুসলমানের কাছে কানূনী ও বিধিগত সম্পর্কের চেয়ে আরো অধিক কিছু দাবি করা হয়ে থাকে। আইনী ও কানুনের বিষয় তো আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই আদায় হয়ে যেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে মনের গহীন থেকে উদ্ভূত সেই প্রেম ও মুহব্বত, আদব ও ভদ্রতা, শোকর ও কৃতজ্ঞতামণ্ডিত আবেগাপ্লুত প্রাণময়তার দাবি করা হয়ে থাকে যা অন্তরের গভীর কন্দর থেকে উদ্‌গত হয়ে ধমনীতে ধমনীতে ছেয়ে যায়, শিরা-উপশিরা সব কিছুকে প্লাবিত করে ফেলে। ভালবাসামণ্ডিত এই শ্রদ্ধাবোধ আর শ্রদ্ধামিশ্রিত এই ভালোবাসাকেই আল-কুরআনে তা'যীর ও তাওকীর শব্দ দুটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ-

তোমরা সাহায্য কর তাঁর এবং শ্রদ্ধা কর তাঁকে। [সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ৯]

এই শ্রদ্ধামণ্ডিত ভালবাসার চিরভাস্বর ও চিরোজ্জ্বল উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি 'রাজী' যুদ্ধের সময় হযরত খুবায়ব ইবন 'আদী ও যায়দ ইবন দাছনার কাহিনীতে, উহুদ যুদ্ধের সময়ে বানূ দীনারের এক মুসলিম মহিলার উত্তরে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সাহাবাদের পাগলপারা ভালবাসা, বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাঝে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কুরায়শী দূত ওরওয়া ইব্‌ন মাস'ঊদ বলেছিল ঃ কসম আল্লাহর! আমি ইরান সম্রাট কিসরা ও রোম সম্রাট কায়সারের দরবারেও গিয়েছি, কিন্তু মুহাম্মাদের সাথীদেরকে যেভাবে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে দেখেছি, কোন বাদশাহকেও তদ্রূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে কাউকে আমি দেখিনি।

হযরত যায়দ ইবনূ দাছনা (রা)-কে কুরায়শ কাফিররা হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আবূ সুফিয়ান তাঁকে বলেছিল ঃ তুমি তোমার ঘরে নিরাপদে থাকবে আর তোমার স্থলে এখানে মুহাম্মাদকে নিয়ে আসা হবে—একথা কি তুমি পছন্দ করবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এখন যেখানে আছেন সেখানেও কোন একটি কাঁটা তাঁর গায়ে ফুটবে আর আমি আমার ঘরে আরামে বসে থাকব–তাও তো আমি পছন্দ করি না। এই অবস্থা দেখে কুরায়শ সর্দার আবূ সুফিয়ান

(তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি)-এর মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে ঃ মুহাম্মাদের সাথীরা যেভাবে তাঁকে ভালবাসে আমি আর কাউকে কারো সাথে এমন ভালবাসা পোষণ করতে দেখি নি।

বানূ দীনারের কোন এক মুসলিম মহিলার স্বামী, পিতা ও ভাই সকলেই উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।[১] ঐ মহিলাকে যখন এই খবর দেয়া হলো তখন তিনি বলেছিলেন ঃ কিন্তু তোমরা বল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন? সাহাবীরা বললেন ঃ আল-হামদুলিল্লাহ! তিনি ভালই আছেন। মহিলাটি বললেন ঃ আমাকে দীদার করিয়ে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেহারা আনওয়ার চোখ পড়া মাত্র মেয়েটি বলে উঠেছিলেন ঃ আপনাকে যখন জীবিত পেয়েছি আমার সকল মুসীবতই তখন তুচ্ছ।[২]

হযরত আবূ দুজানা উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর কাফিরদের তীব্র আক্রমণের সময় নিজের শরীরকে ঢাল হিসাবে সামনে করে দিয়েছিলেন।[৩]

হযরত আবূ তালহা নিজের হাত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন ঃ আঘাতের পর আঘাত খেয়ে সারা জীবনের জন্য তাঁর হাতটি বেকার হয়ে গিয়েছিল।[৪]

সুবিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরাম, মুজাদ্দিদীন, সংস্কারক ও মিল্লাতের রাহবারগণ পেয়েছিলেন এই ইশ্‌কে নবীর বিরাট এক হিস্যা। এঁরাই পেরেছিলেন দীনের মূল প্রাণ ও মেযাজকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করে নিতে। দীন ও মিল্লাতের তাজদীদ, সংস্কার ও পুনর্জীবন দানের মতো বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ আবির্ভূত করেছিলেন তাঁদের।

শরীয়তের সীমা ও বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাহাবায়ে কিরামের উসওয়া ও আদর্শের অনুসরণে গঠিত সুপবিত্র এই রাসূল-প্রেম ব্যতিরেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদর্শের ও প্রদর্শিত উস্‌ওয়ার পুরোপুরি ইত্তিবা ও অনুসরণ, শরীয়তের নির্ধারিত পথে সুস্থির ও অচঞ্চল থাকা, দিয়ানত ও আমানতদারীর সাথে নফসের মুহাসাবা করা, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, মনের আগ্রহ ও অনাগ্রহ—সকল অবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যথাযথ

১. সীরত ইব্‌ন হিশাম ক. ২ ঃ ১৭২।
২. সীরাত ইবন হিশাম ক. ২ ঃ ৯৯।
৩. সীরাত ইব্‌ন হিশাম ৮২; বুখারী বাব اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا
৪. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ২ ঃ ২২৯।

পায়রবী ও অনুসরণ সম্ভব নয়। বহু নফসানী ও প্রবৃত্তিগত রোগের উপশম এভাবেই সম্ভব। এই হচ্ছে চরিত্র গঠন, ইসলাহ ও তাযকিয়া সাধনের কার্যকরী মাধ্যম। প্রেম ও ভালবাসার একটু জোয়ারই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সকল মানসিক আবর্জনা ও আবিলতার স্তূপ, শিরা-উপশিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, দেহের পরতে পরতে আর মনের কন্দরে কন্দরে এমনভাবে তা ছড়িয়ে যায়, আপ্লুত হয়ে মিশে যায় এবং একাকার হয়ে আত্মস্থ হয়ে যায় যেমন পাপড়ির সাথে মিশে থাকে ফুলের গন্ধ, ঊষালগ্নের গন্ধ-মধুর সমীরণ যেমন ছড়িয়ে পড়ে ফুলের শাখে-শাখে, ডালে-ডালে। মুসলিম জাতি যারা একদিন আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রেমে উছলে পড়া লক্‌লকে অগ্নিশিখার মত ছিল আজ এরই অভাবে তারা ভেজা লাকড়ি ও শীতল মাটির মতো পড়ে রয়েছে ঃ

নিভে গেছে প্রেমের আগুন
আঁধার রয়েছে ছেয়ে
মুসলিম আর নয়তো এরা
মাটির ঢেলা রয়েছে পড়ে।

৭. এই দীনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর পরিপূর্ণতা ও এর চিরন্তনতা। কুরআনে এই কথার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আকীদা, শরীয়ত ও সকল বিধি-বিধান পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত বিষয়ের ওপর দুনিয়ার সফলতা, আখিরাতের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল সব কিছুর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। সূরা আল-আহ্যাবঃ ৪০

কুরআন কারীমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের সকল মানবিক প্রয়োজন, চাহিদা ও সমস্যার সমাধানে, চিরন্তনতা, স্থায়িত্ব, নিজস্ব গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এই দীন তার শেষ মনযিলে এসে পৌঁছে গেছে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

আজ আমি তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি তোমাদের দীন, পূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত, আর তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকেই আমি পছন্দ করে নিয়েছি। [সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩]

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের দিনে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। প্রাচীন ধর্ম-ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞ কতিপয় ইয়াহুদী পণ্ডিত বুঝে ফেললেন, এটা এমন এক সম্মান যা একমাত্র মুসলিমদেরই দান করা হয়েছে; এটি কেবল ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য আর কোন ধর্ম বা মিল্লাতের এতে কোন হিস্যা নেই। তারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে এসে বললঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে আপনারা এমন একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন সেই আয়াতটি যদি আমরা ইয়াহূদীদের ওপর নাযিল হতো তবে আমরা দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসাবে পালন করতাম।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এসে নুবূওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটা এবং তারপর এই ধারা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া ছিল মূলত সমস্ত মানবতার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন, তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও দয়ার্দ্রতার ফলশ্রুতি। সাথে সাথে তা এই ঘোষণারও ইঙ্গিতবহ, মানবতা এখন পরিণত বয়সে পৌঁছে গেছে, সে এখন পরিপক্ব। শতাব্দী ধরে যে সংকীর্ণতায় সে ছিল আবদ্ধ তা থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। পরস্পর পরিচিতি, বিশ্ব-ঐক্য, তাহযীব-তামাদ্দুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিশ্ব জগতকে বশ করার এক নতুন দিগন্তে সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। সম্ভাবনা জেগেছে তার সকল প্রাকৃতিক বাধা, ভৌগোলিক সীমা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা অতিক্রম করে চলে যাওয়ার। গোষ্ঠীবদ্ধতা ও স্বাদেশিকতার স্থলে সে এখন বিশ্বজগত ও মানবতা সম্পর্কে ব্যাপকতর চেতনা, বিশ্বব্যাপী হিদায়াত, সম্মিলিত ও সমবায়ী জ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছে। জীবনের সুবিস্তৃত ও সুবিশাল ময়দানে প্রাকৃতিক উপকরণ, স্বভাবগত শক্তি, প্রত্যয় ও বুদ্ধি, সুস্থ ও সত্যাশ্রয়ী হৃদয় ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের মাধ্যমে সমস্যাসমূহের সমাধান ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তার।

অতীতে এই সত্যটি অস্পষ্ট থাকায় হক ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের মিশ্রণের দরুন, তদুপরি ভণ্ড নুবুওয়াত ও আসমানী শিক্ষা ও দাওয়াত মিথ্যা

১. হযরত উমর (রা) এদের জবাবে বলেছিলেনঃ আমি অবগত আছি এই আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল এবং কবে নাযিল হয়েছিল; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন কোথায় অবস্থান করছিলেন। সে দিনটি ছিল আরাফার দিন। (বুখারী, কিতাবু'ত তাফসীর) অর্থাৎ নতুন কোন উৎসব দিবস নির্ধারণের প্রয়োজন নেই আমাদের। খোদ ঐ দিনটিই ছিল ঈদের। অন্যান্য ধর্মের মতো কোন ঘটনার বেলায় উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য দিবস নির্ধারণ করার ধর্ম ইসলাম নয়।

দাবিদারদের অভ্যুদয়, মানুষকে তাঁদের ভিত্তিহীন ধর্মের প্রতি আহবান এবং এর ভিত্তিতে কাউকে মু'মিন ও কাউকে কাফিররূপে চিহ্নিত করার প্রবণতার কারণে পূর্ববর্তী উম্মতদের বহু বিপদ ও পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ধরনের মিথ্যা নবীদের অভ্যুদয় ইয়াহূদী ও খ্রিস্টীয় সমাজে একটা ফ্যাশনের রূপ পরিগ্রহ করে বসেছিল। সে যুগের জন্য এই বিষয়টি এক সমস্যা হিসাবে দাঁড়ায়। মানুষের মেধা, দীনী শক্তি ও যোগ্যতাসমূহ অন্য কোন ভাল ও কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত না হয়ে এই সমস্যাটির পেছনেই ব্যয়িত হতে থাকে এবং এটিই ইয়াহূদী ও খ্রিস্টীয় সমাজে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা, মানসিক ও বুদ্ধিগত দ্বন্দ্ব-কলহের জন্ম দেয়।[১]

নুবূওয়াতের এই সিলসিলার সমাপ্তিতে মানব সমাজের যোগ্যতা ও সম্ভাবনাসমূহ এই আশংকা থেকে মুক্তি পায়। কিছুদিন পর পর এক একজন নুবূওয়াতের দাবি নিয়ে দাঁড়াবে বা এক একটি দাওয়াতের অভ্যুদয় ঘটবে আর ধর্মীয় সমাজ অন্য সব সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে এই দাওয়াত ও এই–নবীর সত্যতা যাচাইয়ে লেগে পড়বে এবং এর স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির ফয়সালা করবে এই সমস্যাও তো কম নয়। সুতরাং এভাবে সীমাবদ্ধ মানব-শক্তি হররোযের এই মুশকিল ও পরীক্ষা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। নয়া ওহী ও নয়া পথ-নির্দেশনার আশায় বারবার আকাশের দিকে চোখ রাখার, নয়া ও স্বতন্ত্র কোন পথ-নির্দেশনার প্রত্যাশার অপেক্ষা করতে থাকার স্থলে আল্লাহপ্রদত্ত শক্তি ও যোগ্যতাসমূহকে ব্যবহারের জন্য এবং বিশ্ব-জাহান ও মাটির এই পৃথিবীর প্রতি মানুষকে মনোনিবেশের আহ্বান জানান হয়। ফলে চিন্তাধারার বিশৃঙ্খলা, ধ্যানের দ্বন্দ্ব ও সমাজের ঐক্য বিধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে সব সময়ের জন্য তা বেঁচে গেল।

খত্‌মে নুবূওয়াতের এই আকীদার ওপর ভিত্তি করে এই উম্মত মারাত্মক ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করতে পেরেছে এবং সক্ষম হয়েছে দীনী আকীদার ঐক্য সংরক্ষণের দায়িত্বের আনৃজাম দিতে। এই উম্মতের রয়েছে এক আধ্যাত্মিক ও রূহানী কেন্দ্রস্থল, রয়েছে এক বিশ্বজোড়া সাংস্কৃতিক ও একাডেমিক প্রস্রবণ, উৎস রয়েছে এক সন্দেহাতীভভাবে নির্ণীত প্রত্যয়ী পরিচিতি। এর সঙ্গে রয়েছে তার খুবই গভীর ও শক্তিশালী সম্বন্ধ। এর ওপর বুনিয়াদ করেই প্রতিটি যুগে মুসলিমের ঐক্য ও জামাতবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এই আকীদার দরুন

১. চিন্তাধারার এই বিশৃঙ্খলা অবস্থা ও সমস্যাটির মারাত্মক দিক বুঝতে হলে দেখুন ঃ Encyclopaedia of Religion & Ethics-এ Edwin Knox Michele-এর নিবন্ধ, ৮ ঃ ৫৮৮।

তাদের মধ্যে এক শক্তিশালী দায়িত্বানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং সমাজ থেকে মন্দ ও অন্যায়ের দূরীকরণ, সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার এবং নির্ভেজাল এই দীনের দাওয়াতের কাজ আন্‌জাম দিতে সক্ষম হয়।

এখন আর এই উম্মতের জন্য নয়া কোন নবী প্রেরণেরও প্রয়োজন নেই; ঠিক তেমনি এখন কোন নিষ্পাপ ইমামের অভ্যুদয়েরও দরকার নেই যিনি নবীদের সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে আসবেন যে কাজ তাদের জন্য সম্পূর্ণ করে যাওয়া সম্ভব হয়নি।[১] ইসলামের পুনর্জাগরণ ও এই দীনের নতুন আন্দোলনের জন্যও এমন কোন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব বা মিসটিক ও কুহেলি আহ্বানের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই যার ক্রিয়াকলাপ বুদ্ধিরও অগম্য এবং যা বাহ্যিক হাকীকতের ঊর্ধ্বে, স্বার্থান্বেষী ও রাজনৈতিক লিপ্সা পূরণের দুষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লোকেরা যার মাধ্যমে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থতার সুযোগ পায়। 'আমাদের ও সকল মানুষের ওপর এ আল্লাহ্‌র এক মহাঅনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আসলে শুকরিয়া আদায় করে না'।

৮. এই দীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তা তার মূল হাকীকতসহ বিদ্যমান। এর সকল সজীবতা ও জীবনী শক্তি এখনও অবশিষ্ট। এই দীনের মূল গ্রন্থ আল-কুরআন যথাযথভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। সর্বযুগেই এটি অনুধাবনযোগ্য। এই কিতাবের বাহক এই উম্মত সাধারণভাবে গুমরাহী, জাহিলিয়াত, আত্মপ্রতারণা, দীনবিমুখিতা—এমন বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে মুক্ত- পূর্বের বহু জাতি ও সম্প্রদায় তাদের ইতিহাসের কোন কোন সময়ে যেগুলোর শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে খ্রিস্ট ধর্মানুসারীরা তো একেবারে শুরুতেই এই অবস্থার শিকার হয়েছিল।

কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক মহাগ্রন্থ এবং এটি বিরাট মু'জিযা হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হলো, এই কিতাবের সবচেয়ে বেশি পঠিত সূরা ফাতিহাতেই খ্রিস্টানদের الضالين। গুমরাহ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (য়াহূদীদের সম্পর্কে উল্লিখিত المغضوب عليهم। গযবপ্রাপ্ত কথাটি থেকে ভিন্নতর)। এই শব্দটির তাৎপর্য ও এই বিশেষণটি দ্বারা এদেরকে চিহ্নিত করার রহস্য সে-ই বুঝতে পারে, যে খ্রিস্টানদের ইতিহাস, তাদের অভ্যুদয় ও ক্রমোন্নতির কাহিনী সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিফহাল। খ্রিস্ট ধর্মের

১. বহু ইছনা আশ'আরী শীআর আকীদা এরূপ।

অনুসারীর শুরুতেই, ধরতে গেলে একান্ত শৈশবেই সত্য-পথ থেকে ছিটকে পড়েছিল, যে পথে হযরত ঈসা (আ) তাদের রেখে গিয়েছিলেন। একদম ভিন্ন এক দিকে তাদের কাফেলা দ্রুত চলে গিয়েছিল। এর সপক্ষে একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে মনে করি। খ্রিস্টান পণ্ডিত Ernest De Bunsen তৎরচিত Islam or True Christianity নামক গ্রন্থে লিখেনঃ যে আকীদা ও ধর্ম-ব্যবস্থার রূপরেখা আমরা বর্তমান ইন্‌জীলে প্রত্যক্ষ করি হযরত মসীহ তাঁর কথা ও কাজে এই ধরনের ধর্ম-ব্যবস্থার আহ্বান কখনও দিয়ে যান নি। বর্তমান য়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুসলিমের মধ্যে যে বিভেদ পরিলক্ষিত হয় হযরত মসীহ (আ)-এর ওপর কখনও এর দায়িত্ব বর্তাতে পারে না। এই সব কিছু হচ্ছে য়াহূদী সন্তান তথাকথিত বেদীন খ্রিস্টান পলের কীর্তি। পবিত্র গ্রন্থের রূপক ও দেহাশ্রয়ী ব্যাখ্যা প্রদান এবং ভবিষ্যদ্বাণী ও উদাহরণে পবিত্র গ্রন্থসমূহকে আকীর্ণ করে দেয়ার পরিণাম এই। ঈসাকী (Essenio) ধর্মমতের আহ্বায়ক স্টিফেনের অনুকরণে পলও হযরত মসীহ (আ)-এর সাথে বৌদ্ধ ধর্মের বহু আচার মিশ্রিত করে ফেলে। বর্তমানে ইন্‌জীলের মধ্যে যেসব পরস্পরবিরোধী কাহিনী ও বিষয় প্রত্যক্ষ করা হয় এবং যে সমস্ত বিষয় হযরত মসীহ (আ)-কে হেয় করে তোলে সে সবই এই পলের মনগড়া রচনা। আঠার শতক থেকে অর্থোডক্স খ্রিস্টান জগত যে সমস্ত বিষয়কে নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের বুনিয়াদ হিসাবে মনে করে আসছে এর সব কিছুই মূলত পল ও তৎপরবর্তী পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা; হযরত মসীহ (আ) থেকে এর কিছুই বর্ণিত হয় নি।[১]

পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজে ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

নিশ্চয় আমিই নাযিল করেছি এই যিক্‌র (আল-কুরআন), আর আমিই এর সংরক্ষক। [সূরা আল-হিজর ঃ ৯]

অনুগ্রহ বর্ণনার এই বিশেষ মুহূর্তে হিফাযত ও সংরক্ষণের ওয়াদার এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় শব্দ সংরক্ষণের আওতায় স্বভাবতই এর মর্ম, ভাব, ব্যাখ্যা, এর শিক্ষানুসারে আমল ও জীবনের ক্ষেত্রসমূহে এর বাস্তবায়নও অন্তর্ভুক্ত। এমন এক গ্রন্থের কি মূল্য ও মর্যাদা হতে পারে এবং এর সংরক্ষণ ও হিফাযতেরই বা কি উপকারিতা থাকতে পারে যে কিতাবের মর্ম শতাব্দী ধরে ধাঁধার আবরণে আবদ্ধ আর যা জীবনের পরিধিতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাতিল ও পরিত্যক্ত

১. Islam or True Christianity " p.128

হয়ে পড়ে আছে? وانا له لحفظون - এর মাঝে যে হিফাযতের ওয়াদা করা হয়েছে তার ধাতুগত শব্দ حفظ আরবী ভাষায় অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক ব্যঞ্জনাময়।

এতটুকু বলেই ক্ষান্ত করা হয়নি। অধিকন্তু আরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ -

একে (কুরআনকে) একত্র করা এবং তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। আমি যখন এ পড়ব (তখন তুমি শুনবে), পরে সেভাবেই তুমি পড়ো। অতঃপর এর ভাষ্যও আমার দায়িত্বে। [সূরা আল-কিয়ামা ঃ ১৭, ১৮, ১৯]

আবার ঐ ধরনের ধর্মমতও কেমন করে নির্ভর ও আস্থাযোগ্য হতে পারে সুদীর্ঘ বিরতির মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য যে ধর্মমতের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। সুদীর্ঘ দিন ধরে অনুকূল আবহাওয়া পেয়েও যে গাছে ফল না ধরে সে গাছ কখনো আস্থা ও যত্নের দাবি করতে পারে না। এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে কখনো কুরআনের এই উদাহরণ প্রযোজ্য হতে পারে না, যেখানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا -

এই বৃক্ষ সব সময় ফল দেয় তার প্রভুর অনুমতিতে। [সূরা ইবরাহীম ঃ ২৫]

তদুপরি এই উম্মত, উম্মতের দাওয়াত আসমানী এই কিতাব ও ইলাহী এই পয়গামের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ মাত্র নয়, অধিকন্তু এই উম্মতই হচ্ছে এই দীনের ধারক ও বাহক, পৃথিবীব্যাপী এর প্রসার ঘটানো, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, এর আমলের প্রতি আহ্বান জানানো এবং নিজেকে এর বাস্তব প্রতিকৃতি হিসাবে গড়ে তোলা সকল কিছুর যিম্মাদার। সুতরাং এই কিতাব সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ও অনুধাবন সেই জাতির অনুধাবন ও উপলব্ধি থেকে নিশ্চয় অধিক ও উৎকৃষ্ট হবে যাদের বৈশিষ্ট্য কেবল এতটুকুই, এদের কথিত ভাষায় সেই কিতাব হয়েছিল অবতীর্ণ।

৯. শেষ কথা হলো, ইসলাম তার অনুকূল এক পরিবেশ চায়। আরো স্পষ্ট করে ও সতর্কতার সাথে বলতে গেলে বলতে হয়, ইসলামের জন্য প্রয়োজন হয় উপযোগী ও যথোপযুক্ত মওসুম এবং নির্দিষ্ট মাত্রার তাপ ও শীতলতার। কারণ এই ধর্মাদর্শ হলো জীবন্ত এক মানবীয় জীবনাদর্শ। এ বুদ্ধিজাত তত্ত্বগত কোন দর্শন নয়, যার স্থান হলো মস্তিষ্কের কোন একটি নিভৃত কোষে বা যা সংরক্ষিত

থাকে কোন গ্রন্থাগারের নীরব এক কোণে। এ তো হলো একই সাথে আকীদা ও আমল, প্রত্যয় ও বাস্তব রূপায়ণ, চরিত্র ও নৈতিকতার আবেদন, আবেগ ও উপলব্ধি এবং সচেতনতা ও সুরুচিতার সমন্বিত নাম। মানুষকে সে নয়া এক ছাঁচে ঢেলে নিতে চায়, জীবনকে সে নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলতে চায়। তাই আমরা দেখি, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে 'সিবগাতুল্লাহ' (صبغة الله) বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। 'সিবগা' হলো একটা রঙ, একটা বৈশিষ্ট্যময় চিহ্ন ও দর্শনীয় এক ছাপের নাম।

অন্যান্য ধর্মাদর্শের তুলনায় ইসলাম অনেক বেশি স্পর্শকাতর, সেন্সিটিভ, অনেক বেশি অনুভূতিশীল। সুপরিচিত ও সুনির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে এর। কোন মুসলিমের মুসলিম হিসেবে থেকে এই সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার অধিকার নেই। অন্য কোন ধর্মে ইরতিদাদ বা ধর্ম পরিত্যাগের এত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা নেই যতটুকু ইসলামে রয়েছে। ইরতিদাদের হীনতা ও ঘৃণ্যতার বিবরণ এমনভাবে কোথাও তুলে ধরা হয় নি যেমনটি করা হয়েছে ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী ধ্যান-ধারণায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী, তাঁর ইরশাদ ও হিদায়াতসমূহ, তাঁর অনুপম আদর্শ, সুন্নতসমূহ, আকীদা ও 'ইবাদত থেকে নিয়ে চরিত্র, নৈতিকতা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার এমন কি আবেগ-অনুভূতি পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে দীনের জন্য এমন এক পরিবেশ-পরিস্থিতিকে এমন যোগ্য ও অনুকূল করে গড়ে তোলে যেখানে দীন ও ইসলামের অংকুরিত চারাটি সতেজ ও পেলব হয়ে ওঠে, বিরাট ও ফলবন্ত হয়ে ওঠে। এই দীন হলো মানবীয় জীবনের সকল গুণ ও বিশেষণ এবং তার টিকে থাকার সকল শর্ত ও দাবির সম্মিলিত সংকলন। ফলে তা রাসূলের আবেগ, চেতনা, উপলব্ধি ও প্রেরণাসমূহে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও বাস্তবায়িত নিদর্শনসমূহের উদাহরণ ব্যতিরেকে যিন্দা থাকতে পারে না। সহীহ্ হাদীস এবং সংরক্ষিত ও সংকলিত সুন্নতসমূহ এর সর্বোৎকৃষ্ট সংকলন। দীন ও ইসলাম একটি আদর্শ। এ অনুকরণীয় ও মানসম্পন্ন পরিবেশ ব্যতীত জীবন্ত ও সতেজ থাকতে পারে না। সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমেই এই পরিবেশ সংরক্ষিত করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের হিফাযত ও সংরক্ষণের পাশাপাশি কুরআনের বাহক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনীরও সংরক্ষণ করেছেন। এরই বদৌলতে আজো পবিত্র সেই মহান জীবনের ফয়েয, বরকত, এর সঞ্জীবনী ধারা ও

নিরবচ্ছিন্নতা কায়েম আছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রতি যুগেই উম্মতের উলামা-ই কিরাম ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্নত ও বিদ'আত, ইসলামী ও জাহিলী ভাবধারা ও আচার-আচরণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধানের মাপকাঠি পেয়েছেন। তাঁরা এই ব্যারোমিটারের সাহায্যে স্ব-স্ব যুগের মুসলিম সমাজকে মেপেছেন, মূল ও নির্ভেজাল ইসলামী আকীদা ও আমল থেকে তাঁরা কতটুকু সরে গেছেন, তা পরীক্ষা করেছেন। এরই বরকতে তাঁরা এই উম্মতের দীনী মুহাসাবা ও এই সম্পর্কে জবাবদিহিতা জারী রাখতে এবং আসল ও নির্ভেজাল দীনের প্রতি মানুষকে আহবান জানানোর দায়িত্ব সব সময়ই আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছেন। সব সময় ইসলামী সুন্নত ও হাদীসের এই বিরাট সংকলিত ভাণ্ডার (এগুলোর মাঝে 'সিহাহ সিত্তা' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত), এগুলোর পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, প্রচার ও প্রসারে ব্যাপৃত ও নিমগ্নতাই সব সময় ইসলামী সংস্কার প্রচেষ্টা ও মুসলিম উম্মার মাঝে বিশুদ্ধ ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এগুলোরই সাহায্যে সংস্কার ও রেনেসাঁ সৈনিকরা শির্ক বিদ'আত ও জাহিলী কুসংস্কারসমূহ নির্মূল করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং সুন্নতের প্রচার ও বাস্তবায়নের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছেন। উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম উম্মার সচেতন অংশকে সকল অন্যায়, বিশৃঙ্খলা, বিদ'আত, তাগুতী আন্দোলন ও শক্তির সাথে পাঞ্জা লড়তে এবং এদের মুকাবিলায় মাথায় কাফন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা যুগিয়েছে বিপুল এই হাদীস ভাণ্ডারই। ইতিহাস সাক্ষী, এই উম্মার সংস্কার ও রেনেসাঁ প্রচেষ্টার ইতিহাস, হাদীসের জ্ঞান ও এর চর্চা, সুন্নতের প্রতি ভালবাসা ও সমর্থনের সাথেই রয়েছে সম্পৃক্ত ও বিজড়িত। হাদীস ও সুন্নত গ্রন্থসমূহের সম্পর্কে যখনই বিদগ্ধ সমাজে জ্ঞানের কমতি ঘটেছে এবং এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হ্রাস পেয়েছে আর এর বিপরীতে অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি সীমাতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে তখনই দেখা গেছে, ভাল ও সৎ ব্যক্তিত্ব মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সমকালীন মুসলিম সমাজ নতুন নতুন বিদ'আত, জাহিলী ও বিজাতীয় রীতিনীতি, অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা এবং অন্যান্য ধর্ম ও আদর্শের শিকারে পরিণত হয়েছে, এমন কি কখনও কখনও এই আশংকাও দেখা দেয়, না জানি এই সমাজে জাহিলী সমাজের পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব ও দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে![১]

১. বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণাদির জন্য দেখুন এই লেখকের ঃ دور الحديث فى تكوين المناخ الاسلامى وصيانته -

এগুলোই হলো এই দীনের বিশেষ মেযাজ এবং এর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণাবলী ও চিহ্নিতযোগ্য রূপরেখা। এগুলোর মধ্যে এই দীনের স্বাতন্ত্র্যময় অস্তিত্বের বৃদ্ধি ও এর স্থায়িত্ব নিহিত আর এগুলোই অপরাপর দর্শন ও ধর্মাদর্শ থেকে এই দীনের স্বাতন্ত্র্য বিধান করে। প্রত্যেক মুসলমানকে এই সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এগুলো সম্পর্কে তার মধ্যে প্রচণ্ড মর্যাদা ও গৌরববোধ থাকতে হবে। এরই মাধ্যমে আমাদের স্ব-স্ব যুগে হক ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের সম্পৃক্ততা ও সংমিশ্রণের কালে সঠিক দীনের সোজা পথ সীরাতে মুস্তাকীমে কায়েম থাকা সম্ভব হয়ে উঠবে এবং এর খেদমত ও হিফাযতের তওফীক লাভে আমরা হতে পারব সৌভাগ্যশালী।

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمَ -

আল্লাহ্ যাকে চান হিদায়াত করেন সীরাতে মুস্তাকীমের।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস

সঠিক ও বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের মূল উৎস ও এগুলোর নির্ভরযোগ্য ভিত্তিমূল

আম্বিয়ায়ে কিরামের মারফত মানুষ যে সমস্ত বিদ্যা ও মর্মজ্ঞান পেয়েছে তন্মধ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ ও জরুরী জ্ঞান হলো আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাত তথা, তাঁর গুণাবলী ও কার্যসমূহ সম্পর্কের জ্ঞান। এই জ্ঞানের উৎস ও কেন্দ্রস্থল হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কিরামই। এই জ্ঞানের উপায়-উপকরণ, এর প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও অভিজ্ঞতা সব কিছুই মানবীয় আওতার ঊর্ধ্বে। কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির কোন ভিত্তি নেই এখানে।

আল্লাহ্র কোন নজীর নেই, তাঁর মতো বলতেও কিছু নেই। তিনি সব ধরনের উদাহরণ ও সাদৃশ্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সব কিছু থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। মানুষ যা ধারণা করতে পারে, যা প্রত্যক্ষ করতে সে সক্ষম এবং যা সে অনুভব করতে সমর্থ, যেগুলোকে সে বস্তুগত ও অনুভবময় পৃথিবীতে কাজে লাগায় সেই সব ধরনের ধারণা, দেখা ও অনুভবেরও তিনি ঊর্ধ্বে। এখানে বুদ্ধি, যুক্তি, মেধা ও ধীশক্তি কিছুই সাহায্য করতে পারে না। বুদ্ধির ঘোড়া দাবড়ানোর ময়দান এ নয়। যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ঘুড্ডি উড়ানোর আকাশও এ নয়।[১]

---

১. জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন ঃ

ائےبر تر از قیاس وخیال وگمان وحلم

وزیر چه گفته ایم شنیدیم وخوانده ایم

منزل تمام گشت وبپا بان رسید عمر

ماهمچناں در اول وصف تو ما نده ایم

ওহে সেই সত্তা যিনি ভাবনা, ধারণা, চিন্তা, খেয়াল সবকিছুরই ঊর্ধ্বে, আর আমি যা বলেছি, শুনেছি, পড়েছি তারও উর্দ্ধে যাঁর অবস্থান; একে একে ঘুরে এলাম তো সব মনযিল, বয়স তো প্রায় শেষের কোঠায়, কিন্তু তবু এখনও তোমার প্রথম গুণটির অনুধাবনেও আমি হয়ে গেছি শ্রান্ত।

এই জ্ঞানকে সবচেয়ে আফযাল ও মহান বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কারণ মানুষের সর্বকালের কল্যাণ ও সৌভাগ্য এর ওপরই নির্ভরশীল। আমল ও আকীদা, আখলাক ও তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ এ-ই। এরই মাধ্যমে মানুষ নিজের হাকীকত ও মূল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, বিশ্বজগতের কুহেলিকার জট খুলতে পারে, জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতিতে নিজের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। এরই আলোকে স্বজাতীয়দের সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, স্বীয় জীবনের পথ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সম্পূর্ণ আস্থা, অন্তর্দৃষ্টি ও পরিষ্কার ধারণার সাথে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয় করতে সে সক্ষম হয়ে ওঠে।

আর তাই সকল জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে, সর্বযুগে ও সর্বশ্রেণীতে এই জ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। জীবনকে যারা উদ্দেশ্যহীন বলে মনে করে না, পরিণাম সম্পর্কে যারা সচেতন, যারা মুখলিস ও আন্তরিক, এই ধরনের সমস্ত মানুষই এই জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করেন। ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক না কেন, এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা এমন এক বঞ্চনা যার পর বঞ্চনা বলতে আর কিছুই থাকে না। এ এমন এক ধ্বংস ও বরবাদী যার থেকে বড় ধ্বংস, বড় বরবাদী বলতে আর কিছুই নেই!

এই প্রসঙ্গে অতীতে দুইটি শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

এক. একটি শ্রেণী হলো যারা এই জ্ঞানার্জনের পথে মাধ্যম হিসাবে সেই সব পয়গাম বাহক সত্তাদের ওপর নির্ভর করেছে, যে সমস্ত মহান সত্তাকে আল্লাহ্ তা'আলা নবূওয়াত ও রিসালাতের সুমহান মর্যাদায় করেছিলেন অভিষিক্ত, যাঁদের দিয়েছিলেন স্বীয় যাতের সঠিক মারিফাত ও পরিচয়। স্বীয় সন্তুষ্টির কাজগুলো সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য তাঁদের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সুদৃঢ় বিশ্বাস ও য়াকীনের বিপুল সম্পদ তাঁদের তিনি বখশিশ করেছিলেন যার বেশির কোন কল্পনাও করা যায় না। সেই নূর ও অন্তর্জ্যোতি তিনি দিয়েছিলেন তাঁদের, যার চেয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও আস্থাভাজন জ্যোতি আর হতেই পারে না কখনো।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ -

এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশ ও যমীনের বাদশাহীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করাই যেন তিনি সুদৃঢ় প্রত্যয়ীদের, য়াকীনসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত হন।

[সূরা আল-আন্'আম ঃ ৭৫]

আম্বিয়া কিরামের জামা'আতের মহান এক সদস্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর কওম যখন আল্লাহ্‌র যাত ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান ও নূর বা অন্তর্জ্যোতি ব্যতিরেকে অনর্থক ও যুক্তিহীন তর্ক করছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ -

আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমরা আমার সাথে হুজ্জত করছ? অথচ তিনি আমাকে সত্য পথের হিদায়াত দান করেছেন। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৮০]

এই প্রথম শ্রেণীর সদস্যরা আম্বিয়া কিরামের রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরেছেন এবং আম্বিয়া কিরামেরই প্রদত্ত হাকীকত ও আকাইদের আলোকে সমস্ত বিশ্বজাহান ও নিজেদের সম্বন্ধে গবেষণার, আল্লাহ্‌র আয়াত ও আসমানী সহীফা ও কিতাবসমূহ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের পথে যাত্রা শুরু করেন আর এরই সাহায্যে নেক আমল, নফল ও চরিত্র সংশোধনের কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেন। তাঁরা বুদ্ধি ও যুক্তিকে পরিহার করেন নি, বরং যথাযথ ও সঠিক পথে ব্যবহার করেছেন এবং এর আদলে যে কাজ করার সে কাজে এবং বুনিয়াদী কল্যাণকামিতার পথে একে লাগিয়েছেন। আম্বিয়া কিরামের শিক্ষা, চিন্তাধারা ও নিজেদের চিন্তা-গবেষণা ও পর্যালোচনার সাথে তাঁরা অত্যাশ্চর্য মিল খুঁজে পান, একে অন্যের সত্যায়ন করেন আর তাঁদের ঈমান ও য়াকীনে, বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে বৃদ্ধির পর বৃদ্ধিই ঘটতে থাকে।

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا -

তাদের ঈমান ও আনুগত্যে কেবল বৃদ্ধিই ঘটায়। [সূরা আহযাব ঃ ২২]

দুই. আরেক শ্রেণী হলো, যারা স্বীয় মেধা ও জ্ঞানের ওপরই পুরাপুরি নির্ভরশীল, এই গণ্ডির মধ্যেই তাদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ। স্বীয় আকল ও বুদ্ধিকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছে এরা। সব জায়গায় তারা যুক্তি ও অনুমানের ঘোড়া দাবড়িয়ে বেড়ায়। আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত, তাঁর সুমহান সত্তা ও গুণাবলীর অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রেও তারা সব নিষ্ফল ও অনর্থক বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ করতে লেগে যায়, যেমনভাবে কোন রাসায়নিক ল্যাবরেটরীতে প্রকৃতিজ বা উদ্ভিজ্জ কোন বস্তুর করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কেও এরা 'তিনি এমন' বা 'তিনি এমন নন' জাতীয় কথা বেধড়কভাবে বলতে শুরু করে। আবার এদের কাছে 'তিনি এমন' জাতীয় কথার তুলনায় 'তিনি এমন নন' জাতীয় কথার পরিমাণ অনেক বেশি। এটি একটি বাস্তব সত্য, বিশ্বাস ও সত্যের জ্যোতি থেকে যখন কোন মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায় তার কাছে কোন কিছুর 'না' করা তা 'হ্যাঁ' ও

প্রমাণ করার তুলনায় অধিকতর সহজ হয়ে যায়। আর তাই দেখা যায়, গ্রীক দার্শনিকদের আল্লাহ্তত্ত্বে অধিকাংশ পর্যালোচনা ও গবেষণার পরিণাম নেতিবাচক। কিন্তু কোন ধর্ম ও আদর্শ, কোন তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং কোন জীবন ব্যবস্থা নঞার্থক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আম্বিয়া কিরামের অভ্যাস তা নয়। এ তাঁদের শান ও মর্যাদা থেকে অনেক দূরের। তাঁরা তো অনুভূতি, বুদ্ধির অগম্য হাকীকত ও সত্যসমূহ সম্পর্কেও[১] রাখেন প্রত্যক্ষশীল দর্শনেন্দ্রিয় ও শোনার মতো শ্রবণেন্দ্রিয়।

গ্রীক দার্শনিকদের ইলাহ্তাত্ত্বিক দর্শন পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা, ধারণা ও অনুমানের নিশ্ছিদ্র এক কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল বলেই প্রতীয়মান হয়। মানুষকে এই বনে পথ হারিয়ে কেবলই চক্কর কাটতে হয়। এ যেন এক বিরাট গোলকধাঁধা, যাতে একবার ঢুকলে আর বেরুবার পথ পাওয়া যায় না। মেধা, প্রজ্ঞা, দার্শনিক রহস্যপ্রিয়তা, কাব্য চর্চা, জ্ঞান ও কৌশলে যে সমস্ত দার্শনিক ছিলেন অধিক প্রসিদ্ধ, এই শ্রেণীর মধ্যে তাদেরকেই বেশি আগুয়ান বলে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইলাহ্ তত্ত্বে মেধা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি কোনটিরই বিন্দুমাত্র দখল নেই। তাদের সকল প্রয়াস ও শ্রম নিষ্ফল ও পাহাড় কেটে কুয়া খননের নামান্তর বৈ অন্য কোন পরিণাম বয়ে আনে নি। অন্তহীন সমুদ্রের বিপুল আঁধারে এরা ডুবে সারা হচ্ছে। কুরআনের এই আয়াতটিতে এদের যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে এর চেয়ে যথার্থ ও সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمٰتٌ م بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ -

গহীন সমুদ্রের আঁধার, ছেয়ে রেখেছে তা ঢেউ, তার ওপর আরেক ঢেউ, ঢেউয়ের ওপরে আবার মেঘ। বিপুল আঁধার, এক আঁধারের পরতে আরেক আঁধার। যদি বের করে নিজের হাত তবে তা-ও যেন দেখা যায় না! আল্লাহ্ যার জন্য নির্ধারণ করেন নি কোন আলো তখন তার আর আলো কোথায়?

[সূরা আন্ নূর ঃ ৪০]

১. বুদ্ধির বাইরে হওয়া আর যুক্তিবিরোধী হওয়া এক জিনিস নয়। দুইয়ের মাঝে ব্যবধান বিস্তর। বুদ্ধির অগম্য হলে তা যুক্তিবিরোধীও হবে, এমন নয়। বুদ্ধি বা আকলের বাইরে হওয়ার অর্থ হলো, বিষয়টি বুদ্ধির আওতা ও সীমার বাইরে; কেবল যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা এর জ্ঞান লাভ করা যায় না। এর প্রমাণের জন্য কেবল বুদ্ধি ও যুক্তি যথেষ্ট নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানীর ভাষায় ঃ যুক্তির বিরুদ্ধবাদী হওয়া এক জিনিস আর অগম্যতা আরেক জিনিস। কেননা সমস্তরে পৌছার পরেই তো কেবল বিরুদ্ধতার কল্পনা করা যায়। পত্র নং ৩ঃ২৩।

এদের কাছে হিদায়াতের কোন আলো ছিল না; যথার্থ জ্ঞান ও মা'রিফতেরও কোন রৌশনী ছিল না। এতদ্‌সম্পর্কে তাদের কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধি, এর প্রাথমিক পূর্বশর্তসমূহের পরিচয় বা বুনিয়াদী জ্ঞান যেগুলোর মাধ্যমে লাভ হয় অজানা বিষয়টির জ্ঞান ইত্যাদি—কোন কিছুরই আশ্রয় তাদের ঘটেনি।[১]

অধিকন্তু এরা ছিল পুরানো ঝুরঝুরে শির্‌ক ও বিদ'আতের শিকার। এদের ধমনীতে ছিল শির্‌ক ও বিদ'আতের প্রবাহ। ভিত্তিহীন ও বাজে কিসসা-কাহিনী ও কিংবদন্তির ওপর ভিত্তি করে গঠিত বিশ্বাস ছিল তাদের সব কিছুর বুনিয়াদ। তাদের দর্শন, তাদের কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রীতিনীতি সর্বক্ষেত্রে এই শির্‌ক ও পৌত্তলিকতার ছিল সুস্পষ্ট প্রভাব। তাদের দেহ ও মনে সর্বত্রই ছিল এর জোরালো মিশ্রণ। সৌরচক্র ও তথাকথিত দশটি আক্‌ল সম্পর্কে তাদের ছিল এক শির্‌কী আকীদামূলক দর্শন। এ ছিল গ্রীক প্রতিমা-দর্শন ও মিথলজির এক মিকশ্চার। তারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারগুলোকে গালভরা ও ভারিক্কী নামে অভিহিত করে পেশ করত এবং দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় পোশাকের ছদ্মাবরণে তা ঢেকে রাখত।

বিশেষত বেদান্ত দর্শন ও দেবমালাপ্রসিদ্ধ এই ভারত ছাড়া সাধারণভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল অতীত সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা গ্রীক দার্শনিকদেরই অনুসরণ করেছে। অংক, প্রকৌশল ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের কিছু শাখায় এদের দক্ষতা ও কারিগরি শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অতীতের প্রায় সকলেই হীনমন্যতা ও পরাজিত মানসিকতার শিকারে পরিণত হয়ে পড়ে এবং চোখ বুজে তাদের সব কিছুর ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। এরা তাদের নিজেদের গবেষণাপ্রসূত সকল ধারণাকে একটা স্বীকৃত সত্য বলে বিশ্বাস করে বসে।

সব সময়ই মানুষের মধ্যে এই একটি দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যখন কোন এরূ ক্ষেত্রে সে কোন ব্যক্তি-স্বীকৃতি বা গোষ্ঠীর শক্তি ও প্রাবল্য মেনে নিয়েছে এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন অপরাপর ক্ষেত্রেও তাদের নেতৃত্ব ও ইমামতের স্বীকৃতি দিয়ে বসেছে (ইমাম গাযালী তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'তহাফুতুল ফালাসিফা' ও ইব্‌ন খালদুন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ

১. যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণ করতে গেলে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধির প্রয়োজন হয়। এই লব্ধ জ্ঞান ও উপলব্ধির সাহায্যে অজানা বিষয় থেকে জানা বিষয়ে পৌঁছা যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের 'মাযহাব ও তামাদ্দুন', পৃষ্ঠা ১০-১৪। ইলাহ তত্ত্ব বিষয়ে আকল ও বুদ্ধির অক্ষমতা এবং এই ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের হাস্যকর বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' ৪ঃ১৯২-২০০।

'মুকাদ্দিমায়' বিষয়টির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন)। আর এই সময় সে তাদের সকল চিন্তাধারা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণসমূহকে একটি স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে ধরে নেয়। এইগুলো সম্পর্কে আর কোন রূপ আলোচনা ও প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই বলে ধারণা করতে থাকে। আর কেউ যদি এগুলো সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করে বা প্রশ্ন তোলে তবে তাকে তারা অকাট মূর্খ বা গোঁড়া ও জেদী বলে মনে করে। যে সমস্ত সম্প্রদায় ও দল সুদূর অতীত থেকেই সঠিক ধর্মীয় পুঁজি হারিয়ে ফেলেছে, হিদায়াত থেকে ও আল্লাহ্‌র নূর তথা জ্যোতি থেকে বঞ্চিত যারা, তাদের বেলায় তো এই ধরনের হীনমন্যতার শিকার হওয়া ততটা বিস্ময়ের নয়। বিস্ময় ও আশ্চর্য হলো সেই সব তথাকথিত মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের জন্য, যাদের আল্লাহ্ এনায়েত করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবূওয়াতের মতো বিরাট নিয়ামত এবং আল্লাহ্‌র কালামের মতো গৌরবজনক সম্পদ। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা শিকার হলো এই মানসিকতার। এই মহান কিতাব ও এই মহান আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো ঃ

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ م بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

বাতিল এতে পারে না আসতে–না সামনে থেকে আর না পেছন থেকে; এ তো মহাপ্রাজ্ঞ ও প্রশংসিত সত্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ।

[সূরা হা-মীম-আস্-সিজ্‌দা ঃ ৪২]

পরবর্তীতে মুসলিম জাহানের বেশ কিছু একাডেমী ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র (বিশেষ করে যারা ছিল ইরান অনুসারী) এই গ্রীক দর্শনকে পুরোপুরিভাবে মেনে নেয় এবং এর ওপর এমনভাবে আলোচনা ও গবেষণায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এ যেন কিছু স্বীকৃত সত্য এবং পরীক্ষিত কতিপয় বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়! কল্পনাশক্তি ধারণা ও সংস্কারগুলোকে এরা সঠিক বলে ধারণা করে নেয়। এদের অনেকেই ইসলামের প্রতি ভালবাসায় মানসিক দুর্বলতা ও হীনমন্যতার দরুন টেনে হিঁচড়ে এগুলোর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও ব্যবহার করতে শুরু করে এবং মনগড়া ও অর্থহীন ব্যাখ্যা দিতে থাকে এবং এমন সব তফসীর এরা করে যাতে তাদের তথাকথিত 'স্বীকৃত দর্শন' ও 'প্রমাণিত সত্য'গুলোর সাথে কুরআনের সাযুজ্য প্রকাশ পায়।

তাদের চিন্তার মূলনীতি ছিল ওয়াজিবুল ওয়াজুদ বা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বশীল সত্তা যিনি হবেন, তাঁকে এই ধারণার জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে অবশ্যই

পবিত্র হতে হবে। এরূপ চিন্তাধারার কারণেই মূলত এদের অধিকাংশ ভুলত্রুটি সংঘটিত হয়েছে। কারণ অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বশীলতার জন্য ক্ষতিকর ধারণা বলতে তারা যে বিষয়গুলোকে বুঝিয়েছে এর অধিকাংশই ছিল তাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কতক উদ্ভট ধারণা। আর কেবল এর ওপরই ভিত্তি করে তারা আল্লাহ্‌র বহু গুণবাচক নাম, গুণ ও কাজকে স্বীকৃতি দেয়নি। এদের ধারণায় এগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র সাথে হুদুছ বা অনিত্যতা ও অনাদিত্বতার আরোপ ঘটে বা কোনটি দ্বারা আল্লাহ্‌র জন্য দেহশীল হওয়া বোঝায় কিংবা অনাদি ও অবশ্যম্ভাবী সত্তার যে সমস্ত বিষয় থেকে পবিত্র হতে হবে, সেগুলো আরোপিত হয় ইত্যাদি। এই সব নুক্‌তা আবিষ্কারের বুনিয়াদ হলো, মূলত এরা আল্লাহকেও মানুষের মতো এবং তাঁকে নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণা করে বসে। কেননা এদের একজন কল্পনাও করতে পারে না বা একজনের এই অভিজ্ঞতা লাভও কখনো সম্ভব হয় না, সংশ্লিষ্ট অবস্থায় সংযোজন ছাড়াও এই গুণাবলীর অস্তিত্ব লাভ সম্ভব। এরা ভুলে গিয়েছিল, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণ; এগুলো কোন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মুখাপেক্ষী নয়; কোন কিছুর পাবন্দী এগুলোর জন্য জরুরী নয়। এদের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র সিফাত ও গুণাবলীর সম্পূর্ণ অস্বীকার করে থাকে। তবে এদের মধ্যে যারা সিফাতগুলোর রূপক অর্থ করে বা এর মধ্যে নানা তফসীর ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, তারা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল, যদিও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই ধরনের দূরবর্তী ব্যাখ্যা অস্বীকারেরই নামান্তর। এতে আল্লাহ্‌র সিফাতসমূহের হিকমত বিনষ্ট হয়ে যায়।

রুচি ও প্রবণতার তারতম্যানুসারে (যা একান্তই স্বাভাবিক) অনেকেই উক্ত পথে যাত্রা শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে 'ইলমে কালাম' নামে এক বিরাট শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং এতদ্‌সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনাও বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে।

কিন্তু মুসলিম সমাজে এমন একজন কালামশাস্ত্রবিদের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে, যিনি কিতাব, সুন্নাহ্‌ এবং সালাফ ও মহান পূর্বসূরীদের অনুসৃত আকীদা ও নীতির ওপর বুনিয়াদ রাখবেন স্বীয় আকীদা ও চিন্তাধারার, ঐগুলোকেই যিনি গ্রহণ করবেন মূল ভিত্তি হিসেবে; সাধারণ বিজ্ঞান, দর্শন ও এর ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত কালামশাস্ত্র ভক্তের দৃষ্টিতে নয়, বরং সমালোচকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করবেন, যিনি দেখবেন এ এমন একটি বিষয়, যার কিছু অংশ গ্রহণ করা যায় আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যানও করা যায়। তিনি স্বাধীনভাবে এর একাডেমিক ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করবেন, হীনমন্যতা ও পরাজিত

মানসিকতার লেশ মাত্র চিহ্ন থাকবে না এতে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের ও তাদের অনুসারী ও শিষ্যদের চিন্তা ও গবেষণার ফসলের কেবল ততটুকুই গ্রহণ করবেন, সঠিক ও বিশুদ্ধ যুক্তি এবং নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাপকাঠিতে যতটুকু উৎরাবে। তিনি এরিস্টটল ও তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন কোন বিজ্ঞানী বা দার্শনিককে সর্বজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে অবহিত আল্লাহ্‌র মর্যাদা দেবেন না বা সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষিত ও মাহফুজ, নিষ্পাপ ও মা'সূম আম্বিয়া কিরামের মর্যাদায়ও এদের অভিষিক্ত করবেন না। মুসলিম জাতির জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কিছু যুগপ্রবর্তক চিন্তাবিদ, কুরআন ও সুন্নাহ্-আশ্রয়ী মুজতাহিদ এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চিন্তার ক্ষেত্রে এমন কিছু প্রত্যয়শীল বিশাল ব্যক্তিত্বের যারা সফলতার সাথে পোস্ট-মর্টেম করতে সক্ষম দর্শন ও বিজ্ঞানের, সাথে সাথে জাতিকে দিতে পারতেন এর যথাযথ বিকল্প, যাঁরা দর্শন ও দার্শনিকদের মতামত ও চিন্তাধারার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সক্ষম। কুরআনের ওপর তাদের ঈমান হবে তদ্রূপ যেরূপ তা নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্‌র সিফাত ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোনরূপ তা'বীল বা রূপক ব্যাখ্যা এবং তাহরীফ ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতিরেকেই তারা ঠিক তেমনিভাবে স্বীকার করে নেবেন যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন। এগুলোর তাৎপর্য ও হাকীকত সম্পর্কে সেই ব্যাখ্যাই তাঁরা দেবেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি যা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, জ্ঞান ও প্রমাণ যা সমর্থন করে। কুরআনী জ্ঞান-শালা ও নববী ইলমের বিশাল উদ্যান থেকে ফয়েয ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হকপন্থী আলিমগণই ছিলেন দর্শন ও ভারিক্কী গোছের গালভরা দার্শনিক পরিভাষার দাসত্ব ও প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত। আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা বা দলপরম্পরা বর্ণিত সুন্নতসমূহের পাবন্দ ও অনুসারী। ঐ সমস্ত সিফাতের আলোকে তাঁরা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখতেন কুরআনে যেগুলোর উল্লেখ হয়েছে। একটি হাদীসে হকপন্থী আলিমগণের যে পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হয়েছে এঁরা ছিলেন সেটির মূর্ত প্রতীক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

يَنْفَعُوْنَ عَنْ هٰذَا الدِّيْنِ تَحْرِيْفَ الْغَالِّيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ ـ

এঁরা (হকপন্থী আলিমরা) সীমাতিক্রমকারীদের তাহরীফ ও পরিবর্তন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং মূর্খদের তা'বীল ও মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে এই দীনকে হেফাযত করবেন।[১]

১. বায়হাকী

এই ধরনের আলিমদের অস্তিত্ব থেকে কোন যুগই খালি থাকেনি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরামের সাক্ষ্যানুযায়ী অষ্টম হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ আলিম শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইব্ন তায়মিয়া আল-হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী) অন্যতম। তাঁর রচনাবলী তাঁর এই মর্যাদার জ্বলন্ত সাক্ষী। যে সত্য ও মূল্যবোধসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদে সে সমস্ত মূল্যবোধ ব্যক্ত করা হয়েছে–এই সব কিছুর ওপরে যেমন তাঁর পরিপূর্ণ ও দ্বিধাহীন ঈমান ও সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল, ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত এবং সালফে সালেহীন ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী পূর্বসূরীদের অনুসৃত আকীদা সম্পর্কে যেমন তিনি ছিলেন সশ্রদ্ধ আস্থা ও স্বতৃপ্ত উপলব্ধির অধিকারী।

তেমনি ছিলেন তখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মার মধ্যে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের যতটুকু চর্চা ছিল সেই দরিয়ার একজন সুকৌশলী ও সুদক্ষ সাঁতারু। তিনি গ্রীক দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও চিন্তাধারার সুগভীর, বিস্তৃত ও তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে দর্শন চিন্তা মুসলিমদের পরাজিত মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করে রেখেছিল, সেই সব কিছু তিনি একজন তীক্ষ্ণধী সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। জ্যামিতির স্বীকৃত স্বতঃসমূহের মতো যে সমস্ত দর্শন, শাস্ত্রীয় নীতি ও দাবি প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকার করে আসা হচ্ছিল, সে সবেরও তিনি নির্ভীক, স্বাধীন ও শক্তিশালী সমালোচক ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে একজন সেই ধরনের শিষ্য ও উত্তরাধিকারীও প্রদান করেছিলেন, যিনি তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণে জীবন নির্বাহ করেছিলেন। ইব্ন তায়মিয়ার মত চিন্তাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও এর প্রচার-প্রসার করাকে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ইনি হচ্ছেন আল্লামা ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃত্যু ৭৯১ হিজরী)।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার পর এই ক্ষেত্রে পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতার সাথে যে মহান ব্যক্তিত্বের নাম নেওয়া যায়, তিনি হচ্ছেন 'হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা'র রচয়িতা হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (মৃত্যু ১১১৬ হিজরী)। তিনি ছিলেন সলফে সালিহীন ও সুমহান পূর্বসূরীদের আকাইদ ও চিন্তাধারার মুখপাত্র ও ব্যাখ্যাতা, কুরআন মজীদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুফাসসির, সুদক্ষ হাদীসশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ, ফিকহ ও উসুলে ফিকাহশাস্ত্রের সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলিম, শরঈ আহকামসমূহের হিকমত ও রহস্যজ্ঞ। তাঁর

জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য মুজতাহিদে মুতলাক অর্থাৎ স্বতন্ত্র ইজতিহাদ নীতির অধিকারী মুজতাহিদের সীমা ছুঁই ছুঁই করছিল।[১] সাথে সাথে তাঁর ছিল প্রচলিত গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের সুগভীর ও সুবিস্তৃত অধ্যয়ন। হিকমত ও তাসাওউফ শাস্ত্র সম্পর্কেও ছিল তাঁর একাডেমিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্রের নতুন রেওয়াজ দিয়েছিলেন তিনিই। হাদীসের যে দৌলত ছিল একদিন ভারতের জন্য গোপন, সাধারণভাবে এর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন তিনি। ইব্‌ন তায়মিয়্যা এবং অপরাপর হাদীসশাস্ত্রবিদের নাম উচ্চারণ করাও যখন ছিল কঠিন, সেই সময় তিনি তাঁদের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব দিয়েছেন। ইসলাম ও শরীয়তে ইসলামের হিকমত ও আহ্‌কামসমূহের রহস্য ও উদ্দেশ্যের ওপর এমন মুজতাহিদসুলভ ও গবেষণাধর্মী এমন কতিপয় পুস্তক রচনা করে গেছেন, ইসলামী গ্রন্থসমূহের বিপুল ভাণ্ডারে যেগুলোর কোন নজীর সহজে পাওয়া যায় না।[২]

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর সমদর্শী ও সমমর্যাদাসম্পন্ন আলিমগণই ছিলেন ইসলামী আকীদা ও মূল্যবোধসমূহ তুলে ধরার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। এঁরাই হলেন কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক ও রূপক ব্যাখ্যার মাঝামাঝি ন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী। ইসলামী আকীদা শাস্ত্র বিষয়ে তৎরচিত 'আল-আকীদাতুল হাসানা' গ্রন্থটিও মর্ম ও বক্তব্যের গভীরতা, ভাষার ব্যঞ্জনা ও প্রাঞ্জলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিতাবটি সাধারণভাবে কালামশাস্ত্র নামে পরিচিত ইলমে তাওহীদের এমন একটা মূল পাঠ, নিজকে যে ব্যক্তি আহলে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং তাদের আকীদাসমূহ স্বীয় পরিচিতিরূপে গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য যতটুকু জানা প্রয়োজন সেই সব কিছুর সারাংশ এটিতে এসে গেছে। তাই আমরা এই ক্ষেত্রে ও এই পরিচ্ছেদে উক্ত গ্রন্থটিকেই বুনিয়াদ হিসেবে নিয়েছি। সুমহান পূর্বসূরীদের অপরাপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ যেমন 'আকীদাতু'ত-তাহাবী' ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য আকীদা গ্রন্থেরও সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্ট করতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে।

---

১. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লেখেন, ইসলামের প্রথম যুগে যদি তাঁর জন্ম হতো তবে তিনি শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত হতেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন মওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানীর "নুযহাতুল খাওয়াতির" ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২. যেমন হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ইযালাতুল খাফা, আল-ফাওযুল কাবীর ইত্যাদি।

ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাসমূহ

এই মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন কাদীম (قديم) বা অনাদি ও অনন্ত এক সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি সব সময় ছিলেন এবং সব সময় থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ও অবশ্যম্ভাবী। তাঁর না থাকা অসম্ভব। প্রশংসনীয় সব গুণ দ্বারা তিনি মণ্ডিত এবং সব ধরনের ত্রুটি ও দোষ থেকে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সকল সম্ভাব্য বস্তুর ওপর তিনি ক্ষমতাশালী। সকল সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সপ্রমাণ। তিনি সর্বশ্রোতা (سميع) তিনি সম্যক দ্রষ্টা بصير ; তাঁর কোন উদাহরণ নেই। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই এবং কোন সহযোগী নেই। তাঁর নজীর নেই কিছুই, বেমিছাল তিনি। তাঁর কেউ সাহায্যকারী নেই। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য অস্তিত্বে, ইবাদত ও উপাসনা লাভের অধিকারে, বিশ্বজাহানের শৃঙ্খলা বিধান ও সব কিছুর পোষণে কেউ বা কোন কিছুই তাঁর শরীক নেই, সহকারী নেই। ইবাদত ও চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন এবং পবিত্রতার অধিকারী কেবল তিনিই। তিনিই অসুস্থকে সুস্থ করেন, সকল সৃষ্ট বস্তুর রিয্ক দেন, সব কিছুর অসুবিধা ও কষ্ট দূর করেন। তাঁর অবস্থা তো এই ঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

তাঁর ব্যাপার তো হলো যখন তিনি ইচ্ছা করেন কোন কিছুর, তখন বলে দেন 'কুন' (হও) আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। [সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন সত্তায় প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সব কিছুতেই অনিত্যতা ও আদিত্ব থেকে মুক্ত।[১] তিনি জওহার অর্থাৎ এমন বস্তু নন যা স্বঅস্তিত্বে বিদ্যমান বটে, কিন্তু কোন বিশেষ মহল বা স্থানের সাথে তা যুক্ত, তেমনিভাবে আরয অর্থাৎ যা স্বীয় অস্তিত্বের জন্য অপর একটি বস্তুর মুখাপেক্ষী—সেমতও নন। দেহবিশিষ্টও নন তিনি, কোন দিক বা স্থানের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধও নন।

তিনি আছেন আরশের ওপর। কিয়ামতের পর তাঁর দীদার হবে মু'মিনদের। তিনি যা চান তা-ই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি অনপেক্ষ, কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর ওপর কারো আইন, কারো নির্দেশ চলে না। তাঁর কাজ সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হয় না। কিছু করা তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য

১. সিফাত বা গুণাবলী আল্লাহ্র সত্তার মতোই হুদূছ বা অনিত্যতা থেকে মুক্ত। তবে মখলুক বা সিফাত সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের সাথে উক্ত সিফাতের তা'আল্লুক বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুদূছ থাকতে পারে।

নয়। তাঁর প্রতিটি কাজই হিকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি ব্যতীত যথার্থ কোন নির্দেশদাতা নেই, কোন হাকিম নেই।

তকদীর, ভাল বা মন্দ সব কিছু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসে।[১] তাঁর অন্তহীন ও অসীম নিজস্ব জ্ঞান, যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সব কিছুই বেষ্টন করে রয়েছে। সকল বিষয়কেই ঘটবার আগে ঘটবার যোগ্য করেন তিনি।

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও নৈকট্যের অধিকারী বহু ফেরেশতা আছে তাঁর। কিছু ফেরেশতাকে মানুষের আমলনামা লেখার, তাদের বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত করার এবং মঙ্গলের দিকে আহ্বান করার ও উৎসাহিত করার কাজে তিনি নিয়োজিত করে রেখেছেন। তাঁরা মানুষের প্রতি মঙ্গল সাধনের যরিআ হিসেবে কাজ করেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে শয়তানও রয়েছে। এরা মানুষের মন্দ ও অকল্যাণের যরিআ হয়। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জিনও রয়েছে।

কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র কালাম। এর মর্ম ও শব্দ সব কিছু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ পরিপূর্ণ একটি কিতাব। সকল প্রকার তাহরীফ, মানুষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত। এতে তাহরীফ হয়েছে বলে যদি কেউ বলে তবে সে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর এমন রূপক অর্থ করা যা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় বা তাঁর ওপর এমন গুণাবলীর আরোপ করা যা তাঁর জন্য সমীচীন নয়, তা কখনও জায়েয হতে পারে না। আর এই বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং কেবল তা-ই গ্রহণযোগ্য।

মৃত্যুর পর শারীরিক পুনরুত্থান, আখিরাতের হিসাব-নিকাশ ও পুরস্কার বা শাস্তি, পুলসিরাত—এই সব কিছু সত্য। কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা এগুলোর সত্যতা প্রমাণিত। বেহেশত ও দোযখ সত্য। এইগুলোর সৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।

কবীরা গুনাহ্‌কারী চিরকালের জন্য জাহান্নামী হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যাদের ব্যাপারে অনুমতি দেবেন তাদের জন্য শাফা'আত করা যাবে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত উম্মতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শাফা'আত সত্য। তাঁর এই শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। কবরে ফাসিকের জন্য হবে শাস্তি আর মু'মিনদের জন্য হবে সেখানে আরাম ও শান্তি। মুনকার-নকীরের সওয়ালও সত্য।

১. সহীহ হাদীসে আছে, যতক্ষণ না একজন তকদীরের ভাল ও মন্দের ওপর ঈমান আনবে এবং যতক্ষণ না তার এই প্রত্যয় হবে, যা পৌঁছবার তা এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে না, আর যা এড়িয়ে যাওয়ার তা পৌঁছবারও নয়, ততক্ষণ সে মু'মিন হতে পারে না।

নবীগণের আগমন সত্য। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের আদেশ-নিষেধ জানিয়ে থাকেন। নবীগণ এমন কিছু বৈশিষ্ট্যময় গুণমণ্ডিত হয়ে থাকেন যেগুলো অন্য কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে তাঁদের নুবূওয়াতের প্রমাণ। তাঁদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করেন। এগুলোকে বলা হয় মু'জিযা। তাঁদের স্বভাব ও প্রকৃতি হয়ে থাকে খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও বিশুদ্ধ। তাঁদের চরিত্র হয়ে থাকে সকলের জন্য আদর্শ। তাঁরা হলেন সকল প্রকার কুফরী, জ্ঞানত কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া ও এতে কায়েম থাকা থেকে মাহফুজ ও মা'সূম, রক্ষাপ্রাপ্ত ও নিষ্পাপ সত্তা।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন শেষ নবী ও রাসূল; তাঁর পর আর কোন নবী নেই। সমস্ত জিন, মানুষ এবং সারা জাহানের জন্য হলো তাঁর নুবূওয়াত। এই বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও এই ধরনের আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যে তিনি নবীদের মধ্যে আফযল ও শ্রেষ্ঠ। তাঁর রিসালাত ও নুবূওয়াতের ওপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। এ ছাড়া আর কোন ধর্ম আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আখিরাতের নাজাত আর কোন ধর্মে নেই।[১]

মি'রাজ সত্য। জাগ্রত অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে আল্লাহ্ যেখানে ইচ্ছা করেছেন তাঁকে নিয়ে গেছেন।

আওলিয়া-ই-কিরাম, আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা গুণাবলী সম্পর্কে যাঁদের আছে মা'রিফাত ও সম্যক পরিচয় এবং ইহসান ও তাক্ওয়ার চূড়ান্তে যাঁরা উপনীত, সেই সব সত্তার কারামতও সত্য। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ চান তাঁর দ্বারা তিনি এই ধরনের অলৌকিক কাজ সংঘটিত করেন। যাঁকে আল্লাহ চান তাঁর বিশেষ রহমত দ্বারা তাঁকে তিনি সরফরায করেন। শরঈ হুকুম-আহ্কামের পাবন্দীর দায়িত্ব থেকে একজন কখনও মুক্ত হতে পারবে না। বিলায়াত, মুজাহাদা ও আত্মসংশোধনের যত বড় মর্যাদায় একজন পৌঁছে যাক না কেন তাকে শরীয়তের ফরযসমূহ অবশ্যই আদায় করতে হবে। যতক্ষণ হুঁশ থাকবে, জ্ঞান থাকবে, ততক্ষণ কারো জন্য কোন নাফরমানী ও গুনাহ্র কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েয নয়।

---

১. বর্তমান যুগের বড় একটা ফিতনা হলো সব ধর্মই সত্য। এই ধারণা পোষণ করা মূলত একটি প্রাচীন ভারতীয় ধারণা। উক্ত বাক্যে সেই ভাবধারার রদ করা হয়েছে।

নুবূওয়াতের মরতবা ও দরজা সাধারণভাবেই ওলীর দরজা থেকে শ্রেষ্ঠ। একজন ওলী যত উচ্চ মরতবার অধিকারীই হোন না কেন, তিনি সাধারণ একজন সাহাবীর দরজায় পৌঁছতে পারবেন না কখনও। ওলীদের ওপর সাহাবীদের মর্যাদা পুণ্যকর্মের সংখ্যাধিক্যের কারণে নয় বরং এই ফযীলত ও মর্যাদা হলো সওয়াবের আধিক্য ও আল্লাহ্‌র দরবারে কবূলিয়্যাত ও গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তিতে।[১] সাহাবীগণই হচ্ছেন আম্বিয়া কিরামের পর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মু'মিনদের মধ্যে সর্বোত্তম। আশারা-ই-মুবাশ্‌শারা-বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী সম্পর্কে আমরা বেহেশতী হওয়ার ও কল্যাণের সাক্ষ্য দেই। নবী-পরিবার, মু'মিনদের ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের মর্যাদা ও সম্মানের আমরা স্বীকৃতি দান করি। তাঁদের প্রতি আমরা ভালবাসা পোষণ করি। ইসলামে তাঁদের মর্যাদা বহু ঊর্ধ্বে। সাহাবীগণ মা'সূম নন, কিন্তু আমরা আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআত তাঁদের সকলের আদালত ও কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার এবং তাঁদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করি। তাঁদের পরস্পরের ভেতর যে সমস্ত বিবাদ সংঘটিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা মন্তব্য করা থেকে বিরত ও সতর্ক থাকার আকীদা পোষণ করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর হযরত আবূ বকর (রা) হচ্ছেন সত্য ও যোগ্য খলীফা। এরপর হচ্ছেন যথাক্রমে হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)। খিলাফত আলা মিনহাজিন্-নুবূওয়াত বা নববী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত এখানেই শেষ হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর যথাক্রমে এই উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।[২] আমরা সাহাবীগণের কেবল আলোচনা করতে পারি; তাঁরা আমাদের ধর্মীয় নেতা ও পথ-প্রদর্শক। তাঁদের সমালোচনা করা, তাঁদের দোষ বর্ণনা করা হারাম, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব।

---

১. সহীহ হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীদের তোমরা মন্দ বলো না, তাদের সমালোচনা করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তবে সাহাবীদের মধ্যে কারো এক মুদ্দ (প্রায় এক কিলো পরিমাণ) বা অর্ধ মুদ্দের পরিমাণ দানেরও সমান হতে পারবে না।

২. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, বংশমর্যাদা, সাহসিকতা, জ্ঞান, শারীরিক শক্তি ইত্যাদি সকল দিক থেকে এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা নয়, বরং এর অর্থ হলো ইসলামের জন্য উপকারী হওয়ার আধিক্যের ক্ষেত্রে তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

আহ্‌লে কিবলা বা কিব্‌লাপন্থীদের[১] কাউকে আমরা কাফির বলি না। তবে যে ব্যক্তি মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক ও সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী হিসাবে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে না বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত-উপাসনা করে, আখিরাত ও নবীকে অস্বীকার করে, ইসলামে প্রতিষ্ঠিত আকীদা ও আহ্‌কামের স্বীকৃতি দেয় না, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির।

শরীয়তের দলীল দ্বারা যে সমস্ত জিনিস পাপ ও গুনাহ্ বলে প্রমাণিত, সেই ধরনের বিষয়কে জায়েয বলে মনে করাও কুফরী। শরীয়ত নিয়ে তামাশা-বিদ্রূপ করা এবং এর হুকুম-আহকামের উপহাস করাও কুফরী। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার আশংকা যেখানে নেই এবং উপদেশ গ্রহণ করবে বলে যেখানে আশা হয়, সেখানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব।

সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের প্রতি যে সমস্ত কিতাব নাযিল করা হয়েছে সবার ওপর আমরা ঈমান রাখি। আমরা নবীগণের মধ্যে কোন ফরক বা পার্থক্য করি না।

হৃদয়ের প্রত্যয় ও মুখে স্বীকার করার নাম ঈমান। সকল ক্রিয়াকর্ম বান্দা কর্তৃক অর্জিত (কাস্‌ব) ও আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত (খাল্‌ক)। কিয়ামতের আলামত হিসাবে হাদীসে যে সমস্ত বিষয়ের বিবরণ এসেছে, সেইগুলোও আমরা বিশ্বাস করি। একতা ও সমাজবদ্ধতাকে আমরা হক ও সওয়াবের কাজ বলে বিশ্বাস করি। পক্ষান্তরে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকে আমরা গুমরাহী ও আযাবের কারণ বলে মনে করি।

তাওহীদ, বিশুদ্ধ দীন ও শির্‌কের তাৎপর্য

মনের বিশ্বাস ও ঈমান-আকীদার বিশুদ্ধতার ওপর আল্লাহ্‌র উবূদিয়্যত ও দাসত্ব নির্ভরশীল। যদি কারো আকীদায় ত্রুটি ও ঈমানের মধ্যেই যদি বিচ্যুতি থাকে তবে তার কোন ইবাদতই কবূল হবে না। ঈমানের বিশুদ্ধতা ছাড়া

১. যরূরিয়াতে দীন অর্থাৎ ইসলামের যে সমস্ত বিষয় কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সেই সমস্ত বিষয়ের ওপর যারা ঈমান রাখে কালামশাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় তাদেরে আহলে কিবলা ও কিবলাপন্থী বলা হয়। এই মহাবিশ্ব অনিত্য, সৃষ্টি; মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ্ অবহিত, নামায-রোযা ফরয হওয়া ইত্যাদি ইসলামী আকীদা ও আহকামের কোন একটিকেও যদি কেউ অস্বীকার করে সে যত সাধনা ও ইবাদত করুক না কেন, যত অলৌকিক শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, সে কিবলাপন্থী বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে কুফরী ও অস্বীকৃতির প্রতীক হিসাবে যে সমস্ত জিনিস চিহ্নিত (যেমন দেবমূর্তির সামনে মাথা ঠেকান বা শরীয়তের কোন বিধানকে উপহাস করা ইত্যাদি) সেই সমস্ত কাজ যদি কেউ করে তবে সে-ও আহলে কিবলা বা কিবলাপন্থী বলে গণ্য হবে না।

আল্লাহ্‌র কাছে কোন আমলই শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যার ঈমান সঠিক এবং আকীদা ও প্রত্যয় বিশুদ্ধ, তার অল্প আমলও বহু বিবেচ্য হয়। সুতরাং আমাদের সকলেরই ঈমানকে সঠিক ও শুদ্ধ করার প্রয়াসী হওয়া দরকার। সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান ও আকীদা অর্জন করাই আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য এবং আমাদের সকল কামনার চূড়ান্ত সীমানা। একে যেন একজন অবশ্যম্ভাবী, নজীরবিহীন ও মহামূল্য সম্পদ বলে মনে করে এবং এক মুহূর্তের জন্যও যেন এর অর্জনে বিলম্ব না করে![১]

বিশুদ্ধ মননশীলতা, সত্য অন্বেষার প্রেরণা নিয়ে কুরআনুল করীমের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের কাফিররাও তাদের বাতিল ও না-হক দেবদেবীদেরকে একমেবা-দ্বিতীয়তম লা শরীক আল্লাহ্‌র বিলকুল সমান ও সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ভাবত না, বরং তারা স্বীকার করত, এগুলো সৃষ্ট বস্তু, এরা বান্দা। মুশরিকদের এই আকীদা ছিল না যে, তাদের এই দেবদেবী শক্তি ও ক্ষমতায় কোন অংশেই আল্লাহ্‌র চেয়ে কম নয় এবং এগুলো আল্লাহ্‌র সমপর্যায়ের। এদের কুফরী ও শির্‌ক এই ছিল, এরা এইসব মিথ্যা ও বাতিল দেবদেবীকে ডাকত, এগুলোর দোহাই দিত, এদের নামে মানত করত এবং বলি দিত, আল্লাহর দরবারে এগুলোকে সুপারিশী বলে ভাবত, বিপদ তাড়ন ও ফলদাতা বলে বিশ্বাস করত। সুতরাং অতীতে কাফিররা তাদের দেবদেবী সম্পর্কে যে ধরনের বিশ্বাস পোষণ করত, তাদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করত, বর্তমানেও যদি কেউ কোন কিছুকে সৃষ্ট বা কাউকে বান্দা বলে মানার পরও সেই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে বা আচরণ করে, তবে তার সাথে জাহিলী যুগের একজন বড় কাফিরের শির্‌ক ও কুফরীর মধ্যে কোন ফারাক বা বেশকম হবে না। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ) বলেন ঃ

তাওহীদ বা আল্লাহ্‌কে এক বলে বিশ্বাস করার দরজা হলো চারটি ঃ

(ক) কেবল আল্লাহ্‌কে ওয়াজিবুল ওয়াজূদ বা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বশীল সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করা। তিনি ব্যতীত ওয়াজিবুল ওয়াজূদ বলতে আর কেউ হতে পারে না।

(খ) আল্লাহ্‌কে আরশ, আসমান-যমীন স্ব অস্তিত্বে বিদ্যমান সকল বস্তুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করা।[২]

১. দ্রষ্টব্য ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ ঃ তাকবিয়াতুল ঈমান।
২. এটিকে বলা হয় তাওহীদে রাবুবিয়্যাত।

এই দুই বিশ্বাস সম্পর্কে আসমানী কিতাবসমূহে কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় নি। আরব মুশরিক, ইয়াহূদী, খ্রিস্টান কারোরই এই দুটি বিষয়ে কোন মতবিরোধ ছিল না, একে তারা অস্বীকার করত না। কুরআন করীমে স্পষ্ট আছে, এ দুটো বিষয় তাদের কাছেও স্বীকৃত বলে গণ্য ছিল।[১]

(গ) আসমান-যমীন ও যা কিছু এতদুভয়ের মাঝে আছে, সব কিছুর শৃঙ্খলা বিধান, এগুলোর পৃথকীকরণ ও সকল ব্যবস্থাপনা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে বলে বিশ্বাস করা।

(ঘ) আল্লাহ ছাড়া আর কিছুকে ইবাদতের যোগ্য বলে মনে না করা।[২]

এই দুটো বিষয় প্রকৃতিগতভাবেই একটি আরেকটির সঙ্গে ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত; একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। এই দুটো বিষয়ই কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে বেশি এবং এই ক্ষেত্রসমূহে কাফিরদের বিভিন্ন সন্দেহ, প্রশ্ন ও বিভ্রান্তির সুস্পষ্ট, যথাযোগ্য ও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়েছে।[৩]

সুতরাং বোঝা গেল, কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সমপর্যায়ের ও সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ধারণা করার অর্থই কেবল শির্‌ক নয়, অধিকন্তু যে সমস্ত বিষয় ও যে ধরনের আচরণ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সুমহান ও সুউচ্চ সত্তার জন্য খাস করে নিয়েছেন এবং যেগুলোকে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্ব করার বিশেষ চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, কোন মানুষ বা অন্য কিছুর সাথে ঐ ধরনের কিছু করাও শির্‌ক। যেমন কারো সামনে সিজদাবনত হওয়া, কারো নামে বলি দেওয়া, মানত করা, দুঃখ ও কষ্টের সময় কারো মদদ মাগা বা কাউকে সর্বস্থানে ও সর্বক্ষণ হাযির-নাজির বলে বিশ্বাস করা, কাউকে বিশ্বজগতের ক্ষমতাধিকারী বলে মনে করা ইত্যাদি ধরনের বিশ্বাস ও কাজেও শির্‌ক হয়, এতেও একজন

---

১. আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ -

এদের যদি জিজ্ঞেস করেন, কে সৃষ্টি করেছে আকাশ ও যমীন? নিশ্চয় তারা বলবে, শক্তিশালী ও বিজ্ঞ এক সত্তা এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সূরা যুখরুফ ঃ ৯

২. এটিকে বলা হয় তাওহীদে উলূহিয়্যাত।

৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১ ঃ ৫৯-৬০ সংক্ষেপিত।

মুশরিক বলে পরিগণিত হয়—যদিও সে বিশ্বাস করে, এই মানুষ বা ফেরেশতা বা জিন যাঁর সামনে সে সিজদাবনত হচ্ছে, যার নামে সে বলি দিচ্ছে, মানত মানছে বা যার কাছে সে মদ্‌দ মাগছে, সবই আল্লাহ্ অপেক্ষা নীচু স্তরের, তাঁর চেয়ে কম মর্তবার। এই কথাও যদি সে স্বীকার করে, সৃষ্টিকর্তা কেবল আল্লাহ্ই আর এগুলো হচ্ছে তাঁর মাখলূক ও তাঁর বান্দা, তবুও ঐ ধরনের আচরণকারী মুশরিক বলে পরিগণিত হবে। এই বিষয়ে আম্বিয়া, আউলিয়া, জিন, শয়তান, ভূত-প্রেত সব এক বরাবর। যে কারো সঙ্গে যে কেউ ঐ ধরনের আচরণ করবে, সে মুশরিক বলে গণ্য হবে। আর তাই দেখা যায়, মুশরিকরা যেভাবে তাদের মিথ্যা মা'বূদগুলোর সঙ্গে আচরণ করত, ইয়াহূদী ও নাসারারা তাদের সাধু-সন্ন্যাসী, পাদ্রী ও পুরোহিতদের ব্যাপারেও সেই ধরনের সীমাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও ভক্তির আচরণ শুরু করলে তাদের সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন, মুশরিকদের সম্পর্কে যে ধরনের শব্দ ও বাক্যের উল্লেখ কুরআনে হয়েছে। মুশরিকদের সম্পর্কে যেমন গযব ও অসন্তুষ্টির উল্লেখ হয়েছে এই সব সীমালংঘনকারী ও সৎ পথ থেকে বিচ্যুত ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের বিষয়েও আল্লাহ্র গযব ও অসন্তুষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًاج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

এরা গ্রহণ করেছে তাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের রবরূপে আল্লাহ্ ছাড়া, আর মারয়াম পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ইবাদত করতে কেবল আল্লাহ্রই, যিনি এক; কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। তিনি মহান ও পবিত্র তাদের থেকে যাদের তারা শরীক করে। [সূরা আত-তওবা ঃ ৩১]

শির্কমূলক কাজ, জাহিলী প্রথা ও কুসংস্কারসমূহ

উল্লিখিত বুনিয়াদী ও মৌল নীতি ও ইসলামে স্বীকৃত সাধারণ বিষয়গুলোর বর্ণনার পর এখানে কিছু রোগ, কিছু দুর্বলতা, বাতিল ও অসত্যের ফিতনাসমূহের উৎসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। অজ্ঞতার তিমিরে আবদ্ধ, জাহিলী প্রথা ও সংস্কারসমূহ দ্বারা প্রভাবিত সমাজে এগুলোর উদ্ভব পরিলক্ষিত হয়। সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ ও কিতাব ও সুন্নাহ্র জ্ঞান থেকে বঞ্চিত এবং নির্ভেজাল দীনের দাওয়াতমুক্ত পরিবেশে যারা লালিত-পালিত,

তাদের মধ্যে সাধারণত এই সমস্ত দুর্বলতা ও রোগের প্রকাশ ঘটে। সুতরাং ঐ সমস্ত দুর্বলতা ও রোগ চিহ্নিত করা এবং এর যথাযথ প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই জরুরী। সর্বব্যাপী জ্ঞান, অনপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত ইচ্ছা, মুখাপেক্ষিতাশূন্য, সীমাহীন ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাধিকার কেবল আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। ইবাদতের বিভিন্ন রূপ ও প্রতীক, যেমন কারোর সামনে সিজ্‌দা বা রুকূ' করা, কারো নামে বা কারো সন্তুষ্টির উদ্দেশে রোযা রাখা, কোন স্থান যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করা এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের সাথে যে ধরনের আচরণ শোভনীয়, সেই স্থানের সাথেও তদ্রূপ আচরণ করা, সেই স্থানে কুরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া, সেই স্থানের উদ্দেশে মানত মানা, এসব কিছুই শির্‌কী আচরণ ও শির্‌কের বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য। সম্মান প্রদর্শনের যে সমস্ত রীতি ও আলামত চরম যিল্লতী ও দাসত্বজ্ঞাপক, সেই সবও কেবল আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। গায়েবের জ্ঞান কেবল আছে তাঁরই, এই জ্ঞান মানুষের সামর্থ্যবহির্ভূত। সকলের অন্তরের কল্পনা, ধারণা ও নিয়্যতের কথা তিনিই জানেন, অন্য কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। দরবারের প্রভাবশালী লোকদের রাযী-খুশী করে দুনিয়ার বাদশাহ ও ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে কাজ বাগানোর মতো আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ কবূল হওয়াকে ধারণা করা ঠিক নয়। ছোট-বড় সকল বিষয়ে অন্য কারো পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রতিই মনোযোগী হতে হবে। দুনিয়ার বাদশাহ্ ও ক্ষমতাসীনরা যেমন তাদের রাজ্য পরিচালনায় দরবারী সভাসদ ও উযীর-নাজিরদের সাহায্য নিয়ে থাকে, এই বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ্‌কেও তদ্রূপ ধারণা করা ভুল। যে কোন ধরনের সিজদা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্য জায়েয নয়। হজ্জের সব ধরনের কাজ হেরেম ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের সাথেই সম্পর্কিত; আর কোথাও এই ধরনের কাজ জায়েয নয়। ওলী-দরবেশের নামে কোন পশু মানত মানা, সেই পশুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এর কুরবানী করে সেই ওলী বা দরবেশের নৈকট্য অন্বেষণ করা পরিষ্কার হারাম। সম্মান প্রদর্শন ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশে কুরবানী করা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত, এ হক কেবল তাঁরই।

রাশিচক্র ও নক্ষত্রের প্রভাবের ওপর বিশ্বাস করা শির্‌ক। কাহিন, জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ ও ভবিষ্যৎ-বক্তাদের কথা বিশ্বাস করা কুফরী।

নাম রাখার ক্ষেত্রেও তাওহীদের সাথে সামঞ্জস্যশীলতা এবং এই ক্ষেত্রে এর প্রকাশ ঘটা উচিত। ভুল ধারণার সৃষ্টি করে ও শির্‌কী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে—এমন নাম থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে

কসম খাওয়াও শির্ক। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে মানত করা হারাম। যে স্থানে পূর্বে কোন মূর্তি ছিল বা জাহিলী কোন পর্ব অনুষ্ঠিত হতো, সে স্থানে পশু উৎসর্গ করা জায়েয নয়।

খ্রিস্টানরা তাদের নবী হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করেছে, এর অনুসরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা বা সীমালংঘন করা থেকে এবং ওলী ও দরবেশদের প্রতিকৃতি ও ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা থেকে সতর্ক থাকা উচিত, এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

নবী প্রেরণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীব্যাপী শিরকী ভাবধারামণ্ডিত জাহিলিয়তের উৎখাত সাধন

আল্লাহ্ সম্পর্কে বিশ্বাস, আল্লাহ্ ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্কের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং একক এক সত্তার ইবাদত করারও তাঁর বন্দেগী করার প্রতি আহ্বান জানানোই ছিল প্রতিটি যুগে ও সব রকমের পরিবেশে আম্বিয়া কিরামের সর্বপ্রথম দাওয়াত। এ-ই হচ্ছে তাঁদের প্রেরণের সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সব সময় তাঁরা এই শিক্ষাই দিয়েছেন, কেবল আল্লাহ্ই লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। তিনিই শুধু ইবাদত, দু'আ ও কুরবানী পাওয়ার হক রাখেন। পুতুল এবং জীবিত বা মৃত সাধু-দরবেশদের পূজার নামে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল প্রতিটি যুগেই তাঁরা এর বিরুদ্ধে কার্যকরী আঘাত হেনেছেন। ঐ সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষের সম্পর্কে জাহিলী যুগের বিশ্বাস ছিল, তাদের আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান, নৈকট্য ও দেবত্বের মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমতাধিকার দিয়েছেন, মানুষের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ তিনি শর্তহীনভাবে গ্রহণ করেন। রাজা-বাদশাহ্রা যেমন সাম্রাজ্যের এক-এক অঞ্চলে এক-একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ছাড়া স্থানীয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ তাদের দায়িত্বে অর্পণ করে দেন, আল্লাহর এখানেও তদ্রূপ হয়ে থাকে। সুতরাং এই সমস্ত মধ্যসত্তা মহাপুরুষ ও সাধু-দরবেশদের রাযী ও সন্তুষ্ট রাখা এবং বিপদে তাদের আশ্রয় লওয়া একান্ত জরুরী।

পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের শিক্ষার সার কুরআন শরীফের সাথে যাদের সামান্যতম সম্পর্ক আছে, অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে তারা বুঝতে পারে, শির্ক ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, একে উৎখাত করার

প্রচেষ্টা চালান, এর থাবা থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করাই ছিল নুবূওয়াতের বুনিয়াদী লক্ষ্য। পৃথিবীতে আম্বিয়া কিরাম প্রেরণের উদ্দেশ্য, তাঁদের দাওয়াতের মূল বুনিয়াদ, তাঁদের সকল কাজেই চূড়ান্ত লক্ষ্য, তাঁদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার আসল গন্তব্য ছিল এ-ই। এ-ই ছিল তাঁদের দাওয়াতী ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। কুরআন করীমে বিপুল ইঙ্গিতময় ভাষায় অতি সংক্ষেপে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّانُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ -

আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদের তো এই ওহীই করেছিলাম, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, সুতরাং কেবল আমারই তোমরা ইবাদত কর। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৫]

কোন কোন স্থানে এক একজন নবীর কথা আলাদা আলাদা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাওহীদের আহ্বানের মাধ্যমেই সূচনা হয়েছিল তাঁদের দাওয়াতের।[১] প্রথম যে কথা তাঁরা বলেছিলেন তা ছিল ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

হে আমার কওম, তোমরা ইবাদত করবে আল্লাহ্‌রই। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই। [আল-আ'রাফ ঃ ৫৯]

এই বুত-পরস্তী ও শির্‌ক অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে ইলাহ্ হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের সামনে নতমস্তক হওয়া, হীনতা-দীনতা প্রকাশ করা, সিজদা করা, মদদ মাগা, মানত মানা, উৎসর্গ করা, ভোগ দেওয়া হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ছড়ানো, সুপ্রাচীন ও কঠিনপ্রাণ জাহিলিয়্যাত; বিশেষ কোন যুগ বা সময়ের সাথেই তা খাস নয়। মানবেতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসকর প্রাচীন ব্যাধি এ-ই। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে, সমাজ ও সভ্যতায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এত পরিবর্তন ও এত বিপ্লবের পরও এই ব্যাধিটি মানুষের সাথে লেগেই আছে। আল্লাহ্‌র গযব ও ক্রোধকে, গায়রত ও মর্যাদাবোধকে সব সময়ই তা উসকিয়ে আসছে। মানুষের রূহানী ও আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক,

১. সূরা আ'রাফে হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত শু'আয়বের নাম উল্লেখ করে তাঁদের এই দাওয়াতের বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আ'রাফ, রুকূ' ৮-১২, সূরা হূদ, রুকূ' ৩-৮।

সামাজিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে আসছে। মনুষ্যত্বের সুউচ্চ মিনার থেকে অবনতি ও হীনতার গভীর ও ভয়ংকর গর্তে এনে ফেলে দিয়েছে তাকে। সুতরাং এর প্রত্যাখ্যান ও প্রতিবাদই হলো কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সকল দীনী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের বুনিয়াদী এবং নুবূওয়াত ও রিসালাতের চিরন্তন মীরাছ ও উত্তরাধিকার ঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

এই বক্তব্য ও আদর্শই তারা তাদের উত্তরসুরিদের জন্য রেখে গিয়েছেন যেন তারা এই দিকে (আল্লাহ্‌র দিকে) ফিরে আসে। [সূরা আর-যুখরুফ ঃ ২৮]

সকল মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ, সংস্কারক ও আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীর সব সময়ের বিশ্বব্যাপী শিক্ষারও বৈশিষ্ট্য হলো এ-ই।

প্রকাশ্য ও জাহিরী শির্‌কের গুরুত্ব কম করে দেখা এবং একে উপেক্ষা করা জায়েয নয়

যুগের দাবি পূরণের নামে বা নতুন ধরনের সংস্কার ও দাওয়াতী আন্দোলনের খাতিরে প্রকাশ্য ও জাহিরী শির্‌কের গুরুত্ব খাটো করে দেখা বা দাওয়াত ও তাবলীগের বুনিয়াদী নীতি ও পদ্ধতিসমূহের মাঝে এটাকে প্রাসঙ্গিক ও পার্শ্ব মর্যাদা দান কোনক্রমেই জায়েয নয়। রাজনৈতিক আনুগত্য, কোন কোন ক্ষেত্রে মানব রচিত আইন ও ব্যবস্থা কবুল করে নেওয়া এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত-উপাসনা করাকে সমপর্যায়ের মনে করা এবং উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধি ও হুকুম প্রয়োগ করাও অনুচিত। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, তাহযীব ও তামাদ্দুন যখন ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের, শিরক হচ্ছে সেই তখনকার পুরনো যুগের একটি দুষ্ট ব্যাধি, মানুষের অজ্ঞতার একটা কুৎসিৎ রূপ। অসভ্য ও অনুন্নত যুগেই কেবল এটি চলতে পেরেছিল। বর্তমানে আর সেই অজ্ঞতার যুগ নেই। মানুষের অভাবিতপূর্ণ উন্নতির যুগ এটা। সুতরাং বর্তমানে উন্নততর অবয়বেই শুধু মানুষের গুমরাহীর প্রকাশ সম্ভব–এই ধরনের ধারণা করাও ঠিক নয়। এমন কি এই ধরনের দাবি, চিন্তাধারা বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীরও পরিপন্থী। বর্তমান কালেও প্রকাশ্য বহু শির্‌ক ও পুতুল পূজা সংঘটিত হতে অহরহ দেখা যায়। গোটা জাতি ও দেশব্যাপী, এমন কি বেশ কিছু মুসলিম জনগোষ্ঠীতেও শির্‌কের প্রকোপ আজও পরিলক্ষিত হয়। কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীটির সত্যতা আজও ভাস্বর ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ -

এদের অধিকাংশেরই অবস্থা হলো ঈমান তো আনে, সাথে সাথে এরা শির্‌কের মধ্যেও লিপ্ত। [সূরা ইউসূফ ঃ ১০৬]

কেবল তাই নয়, বরং এটা হচ্ছে আম্বিয়া-কিরামের দাওয়াত, তাঁদের সংগ্রাম ও সুমহান প্রচেষ্টার অবমাননা ও অবমূল্যায়ন, সর্বশেষ ও সর্বযুগের হিদায়াত-গ্রন্থ কুরআন করীমের চিরন্তনতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের শামিল। তদুপরি এই ধরনের চিন্তাধারা হচ্ছে আম্বিয়া কিরাম অনুসৃত কর্মপদ্ধতিই সর্বোত্তম এবং এটিই একমাত্র আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় কর্মধারা—এই বিষয়টিতে অবিশ্বাস পোষণের নামান্তর। আম্বিয়া কিরামের অনুসৃত পন্থার সাথেই আল্লাহ্‌র সাহায্য, সমর্থন ও তাঁর তওফীক বিদ্যমান থাকে। সফলতা ও কামিয়াবী, আল্লাহ্‌র রহমত ও কবূলিয়্যাতের এত বিপুল অনুগ্রহ বিজড়িত থাকে আম্বিয়া কিরাম অনুসৃত পথে, ততটুকু আর কোন প্রচেষ্টার মধ্যে কখনও আশা করা যায় না।

বিদ'আত, বিদ'আতের অপকারিতা ও পরিপূর্ণ ও চিরন্তন শরীয়তের সাথে এর বিরোধ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত বিষয়কে দীনের অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যে সমস্ত বিষয়ের তাঁরা নির্দেশ দেন নি, সেগুলোকে দীনের কাজ বলে নির্ধারণ করা এর অঙ্গ বলে ঘোষণা দেওয়া, সওয়াব ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশে এই ধরনের কোন আমল করা, শরীয়তের কোন নির্দেশ ও আমলের পাবন্দীর মতো এই ধরনের কাজের স্বকপোলকল্পিত রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিয়ে সেগুলোর পাবন্দী করা, এই ধরনের সব কিছুই বিদ'আত বলে গণ্য। বিদ'আত মূলত আল্লাহ্‌র নির্ভেজাল দীনের মাঝে মানব-কল্পিত তথাকথিত নয়া এক শরীয়তের উদ্ভব ঘটানোর নামান্তর। এ যেন নির্ভেজালের মাঝে ভেজালের সংমিশ্রণ, এক রাষ্ট্রের ভেতরে অপর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটানোর মতো। এই সমস্ত কল্পিত শরীয়ত ও রীতির রয়েছে আলাদা ফিক্‌হ, স্বতন্ত্র ব্যবহারশাস্ত্র; এর করণীয়, এর ফরয-ওয়াজিব, এর সুন্নত-মুস্তাহাব—সব কিছুই আলাদা। আল্লাহ্‌র দীনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোন কোন সময় এ ইলাহী শরীয়তের সমর্থন অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যা, মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সত্য দীনের চেয়েও অধিক বলে গণ্য হয়ে পড়ে।

বিদ'আতপন্থীরা মূলত এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে, দীন ও শরীয়তের সব বিধান ও হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। শরীয়তের বিধান হিসাবে যা কিছু নির্ধারিত হওয়ার ছিল তা সব নির্ধারিত হয়ে গেছে। ফরয ওয়াজিব হওয়ার যা ছিল সবই হয়ে গেছে, নতুন আর কিছু বাকি নেই এখন। দীনের টাঁকশাল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর নামাংকন করে যে কোন নয়া কারেন্সী বর্তমানে ছাড়া সবই জাল বলে বিবেচিত হবে। ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন ঃ

مَنِ ابْتَدَعَ فِى الإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ يَقُوْلُ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ،، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا ـ

যে ব্যক্তি ইসলামে বিদ'আতের প্রচলন করে এবং একে ভাল বলে মনে করে সে মূলত এই কথাই বলছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রিসালাত ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছাতে (না'উযুবিল্লাহ্) খিয়ানত করেছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের দীন আমি তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।" সুতরাং যে সমস্ত বিষয় তখন দীন হিসাবে গণ্য ছিল না, আজ তা দীন হিসেবে গণ্য হতে পারে না।[১]

সহজ-সরলতা ও সর্বযুগে বাস্তবায়নযোগ্যতা হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দীন ও জীবন-ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কেননা এই জীবন- বিধান ও দীনের যিনি উদ্যোক্তা ও প্রচলনকারী তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তাও বটেন। তিনি মানুষের স্বভাব, তাঁর দুর্বলতা, তার ক্ষমতা ও অক্ষমতা সকল কিছু সম্পর্কে অবহিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

তিনি কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন? অথচ তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও খুবই ওয়াকিফহাল। [সূরা আল্-মূলক ঃ ১৪]

সুতরাং আল্লাহ্‌প্রদত্ত দীন ও জীবন-ব্যবস্থায় মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের সকল দিকেরই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন নিজেই বিধানদাতা বনে যায়, তখন সকল দিক সম্পর্কে তার সতর্ক থাকা, সকল কিছুর প্রতি দৃষ্টি রাখা

১. ইব্‌নুল মাজিশুন এটি ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন।

সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বিদ'আতের সংমিশ্রণে ও সময় সময় এর সংযোজনের দরুন গোটা দীনই এত জটিল, কঠিন ও দীর্ঘায়িত হয়ে পড়ে, মানুষ তখন ধর্মের বাঁধন গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলতে বাধ্য হয়ে ওঠে, যে দীন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপরে দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা ও সংকীর্ণতা রাখেন নি;" এই নিয়ামতও আল্লাহ্ তখন উঠিয়ে নেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বাধাহীনভাবে বিদ'আত কাজ করেছে সেই সব ক্ষেত্রে প্রচলিত ইবাদত ও প্রথা ও কুসংস্কারের বিরাট শীর্ষ তালিকায় আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে।

আল্লাহ্র দীন ও শরীয়তের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর বিশ্বব্যাপী সমদৃশ্যতা। সকল যুগ ও সকল স্থানে এর আমল ও বিধানসমূহের রূপ একই। দুনিয়ার যে কোন অংশের একজন মুসলিম এর অপর কোন অংশে যদি যায় তবে দীন ও শরীয়তের কোন একটিও বিধানের ওপর আমল করতে তার কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। তার জন্য কোন আঞ্চলিক নির্দেশনা পুস্তিকা বা নির্দেশকেরও কোন প্রয়োজন পড়ে না। পক্ষান্তরে বিদ'আতের মধ্যে এই সমদৃশ্যতা ও আমলের এই ঐক্য দেখা যায় না। প্রতিটি স্থানের আঞ্চলিক কাঠামোয় ও দেশজ ও নাগরিক ছাঁচে তা গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ও আঞ্চলিক কার্যকারণ এবং ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের ফসল হিসাবে হয় এর উদ্ভব। ফলে দেশে দেশে, অনেক সময় প্রদেশে প্রদেশে, এমন কি শহরে শহরে সারা গায়ে পর্যন্ত এই দীন ও বিধানের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।

এই সমস্ত চিরন্তন কার্যকারণ, সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে এবং সুন্নতের হিফাযত ও সংরক্ষণের বলিষ্ঠ তাকীদ দিয়ে গিয়েছেন। ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَامَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ -

কেউ যদি আমাদের এই দীনে নয়া কোন বিষয়ের উদ্ভাবন করে যা মূলত এতে নেই, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত। বুখারী, মুসলিম

اِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ -

তোমরা বিদ'আত থেকে হুঁশিয়ার থাকবে। কারণ প্রতিটি বিদ'আতই গুমরাহী, আর প্রতিটি গুমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম। আবূ দাউদ, আহমদ

কত হিকমতপূর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন তিনি ঃ

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلاَّ رُفِعَ بِهَا مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ ـ

যখন কিছু সংখ্যক লোক দীনের বিষয়ে কোন বিদ'আতের প্রবর্তন করে পরিণামে তখন সেই পরিমাণে সুন্নতসমূহেরও অবশ্যই বিলুপ্তির ঘটে।

[মুসনাদ ঃ ইমাম আহমদ]

বিদ'আত ও শরীয়তের মধ্যে নয়া নয়া প্রথা উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিছ হক অনুসারী উলামায়ে কিরামের জিহাদ ঃ

সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তীতে ইমাম ও ফকীহ, মুজাদ্দিদ, সংস্কারকগণ ও আল্লাহ্ওয়ালা আলিমে দীনগণ সব সময়ই স্ব-স্ব যুগের বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কারের কঠোর মুকাবিলা করেছেন। ইসলামী সমাজ ও ধর্মীয় পরিবেশসমূহে এই সমস্ত বিদ'আতের প্রচলন ও গ্রহণীয় হওয়ার মারাত্মক প্রবণতাকে রুখবার তাঁরা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

সরল বিশ্বাসী অজ্ঞ সাধারণ মানুষকে বিদ'আতের চাকচিক্য সব সময়ই চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে থাকে; অধিকন্তু কিছু সংখ্যক দুনিয়াদার ধর্ম ব্যবসায়ী তথাকথিত ধর্মীয় আলখেল্লাধারীদের ব্যক্তি ও জাগতিক স্বার্থও এর সাথে বিজড়িত হয়। কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে পেশাদার ধর্ম ব্যবসায়ীদের চিত্রটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হে ঈমানদারগণ, (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান) পণ্ডিত ও সাধুদের অধিকাংশই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে আর আল্লাহ্র পথ থেকে তাদের বাধা দিয়ে রাখে। [সূরা আত্-তওবা ঃ ৩৪]

বিদ'আতের মুকাবিলা করতে গিয়ে এই স্বার্থান্ধ সাধু-সন্ন্যাসী ও অন্ধ বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ কর্তৃক কঠিন অত্যাচার ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয় রব্বানী ও আল্লাহ্ওয়ালা আলিম ও সংস্কার কর্মীদের। কিন্তু কোন কিছুরই তাঁরা

পরওয়া করেন নি। একে তাঁরা স্বীয় যুগের একটা মহান জিহাদ ও শরীয়তের হিফাযত, আল্লাহ্‌র দীনকে তাহরীফ ও বিকৃতি থেকে রক্ষার পবিত্রতম কাজ বলে মনে করেছেন। নবুবী সুন্নতের পতাকাবাহী ও বিদ'আত ও কুসংস্কার-বিরোধী মহান সত্তাগণ অজ্ঞ স্বজাতি ও জ্ঞানান্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের দরবার থেকে পেয়েছেন স্থবির, গোঁড়া, ঐতিহ্য-প্রেমিক, দীনের দুশমন, কখনও কখনও ওয়াহাবী ইত্যাদি খেতাব, কিন্তু কোন কিছুর পরওয়া তাঁরা করেন নি। তাঁদের এই যবান, মসি-যুদ্ধ ও হককে হকরূপে তুলে ধরার ও বাতিলকে বাতিলরূপে দেখিয়ে দেবার সুমহান প্রচেষ্টার ফলে বহু বিদ'আত ও কুপ্রথার বিলুপ্তির সাধন সম্ভব হয়েছে। এগুলোর এমন বিনাশ হয়েছে, বর্তমানে প্রাচীন কিংবদন্তীতেই কেবল এর কিছু কিছুর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। আর এখনও যেগুলো অবশিষ্ট রয়ে গেছে, হকপন্থী আল্লাহ্‌ওয়ালা আলিমগণ সেগুলোর বিরুদ্ধেও সংগ্রামরত আছেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ص وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً ـ

মু'মিনদের মধ্যে কিছু এমন, যারা সত্যে পরিণত করে দেখিয়ে দিয়েছেন তা, যার ওয়াদা তাঁরা করেছিলেন আল্লাহ্‌র সাথে; তাঁদের মধ্যে তো কেউ কেউ পূর্ণ করে দিয়েছেন তাঁদের সংকল্প, আর কেউ কেউ রয়েছেন প্রতীক্ষায়। তাঁরা বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেন নি নিজেদের সংকল্পের।

[সূরা আল-আহযাব ঃ ২৩]

ইবাদত

ইসলামে ইবাদতের স্থান

আকীদা ও ঈমানের পর ইসলামে যে জিনিসটির গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সবচে' বেশি সেটি হলো ইবাদত।[১] নুবূওয়াত ও রিসালাতের মধ্যে সাধারণভাবে সর্বাধিক তাকীদ ও সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে এরই। আর এ-ই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

"মানুষ ও জিনকে কেবল ইবাদত করার জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি।"

[সূরা আয্-যারিয়াত ঃ ৫৬]

সকল আসমানী শরীয়তে এই ইবাদতের বিধান ছিল এবং সকল আসমানী ধর্ম স্ব-স্ব যুগে এর প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে। আর ইসলামী শরীয়তে সবচে' পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দররূপে একে পেশ করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি রাসূল (সা.) অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলোর সাথে তাঁর এত মুহব্বত ও এত বেশি সম্পর্ক ছিল যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এসবের প্রতি উৎসাহমূলক শত শত আয়াত ও হাযার হাযার হাদীস রয়েছে। এর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কেও বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। যারা বেশি করে এগুলো আদায় করেন এবং এগুলোর

১. অপরাপর ধর্মমতের তুলনায় ইসলামে দীন ও ইবাদতের মর্ম বহু ব্যাপক ও বিস্তৃত। যে কোন সন্তোষজনক কাজ আল্লাহ্র উদ্দেশে ঈমানের সাথে, সওয়াবের নিয়্যতে করা হবে তা ইবাদত ও দীনের কাজ বলে গণ্য হবে। মানবীয় প্রয়োজন পূরণ বা অর্থনৈতিক কারণ কিংবা জাগতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজও উক্তরূপে আদায় করলে তা-ই দীন। বিধিসম্মত বিশেষ বিশেষ ইবাদত ও দীনের আরকান ও ফরয কাজ। যেমন ঃ সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদিরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। শরীয়তে এগুলোর স্বতন্ত্র গুরুত্বও অপরিসীম। সুতরাং এগুলোর গুরুত্ব খাটো করে দেখা বা এগুলোর মর্যাদাকে কম করে দেখা কিংবা অপরাপর যে সমস্ত আমল মানুষ সওয়াব ও পুণ্যের উদ্দেশে করে সেগুলোর সাথে এগুলোকে সমতুল্য বা এক বরাবর মনে করা দীনের বিষয়ে তাহ্রীফ বা বিকৃতি, কুফর ও ইলহাদের দরজা খুলে দেয়ারই নামান্তর।

আঞ্জাম দেন, তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে আর যারা এই বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে।[১]

কুরআনুল করীমে জিহাদ ও রাজ্য ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকে মুসলিমের জন্য ওয়াসীলা ও মাধ্যম হিসাবে এবং পক্ষান্তরে ইকামতে সালাত তথা যথাযথভাবে নামায আদায় করাকে মূল লক্ষ্য ও বুনিয়াদী আমল বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ

এরা হচ্ছেন তারা এদের যদি আমি রাজ্য-ক্ষমতার অধিকারী বানাই তবে এরা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র হাতেই সকল কাজের পরিণাম। [সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৪১]

কুরআনের মামুলী অধ্যয়নেই একজন জানতে পারে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়া, তাঁর দাসত্ব, বন্দেগী ও শরীয়ত-নির্দিষ্ট ইবাদত, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি হচ্ছে বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র দাবি। কিয়ামতের দিনে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সবার আগে। এগুলো পরিত্যাগ, তরক করা ও এগুলো সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করা আযাব ও শাস্তিযোগ্য কাজ বলে গণ্য। জাহান্নামের আযাবের ফয়সালাকৃত কিছু লোকের সওয়াল ও জওয়াবের ভঙ্গিতে আল-কুরআনের এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ـ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ـ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ـ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ـ حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ـ

তোমরা দোযখে কেন? এর উত্তরে বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, মিসকিনদের খানা দিতাম না। আমরা অন্যায় আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম, কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতাম। অবশেষে এসে গেল আমাদের মৃত্যু। [সূরা মুদ্দাছছির ঃ ৪২-৪৭]

১. দ্রষ্টব্য হাদীস গ্রন্থসমূহের ইবাদত অধ্যায় ও সূরা সিজদা ঃ ৬, সূরা ফুরকান ঃ ৬৪, সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭, সূরা আহযাব ঃ ৩৫, ৪২, সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮, সূরা আন'আম ঃ ৫২।

অন্য স্থানে কাফিরদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلّٰى - وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى -

এ (অপরিণামদর্শী ব্যক্তিটি) আল্লাহ্‌র কালাম সত্য বলে বিশ্বাস করেনি, নামায পড়েনি, বরং সে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পরে গরিমায় দুলে দুলে চলে গেছে নিজ পরিজনের কাছে।" [সূরা আল-কিয়ামা ঃ ৩১-৩৩]

এ আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, ইবাদত ও ইসলামের রুকনসমূহ ইসলামের শর'ঈ ব্যবস্থার মধ্যে বুনিয়াদী ও কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত। এ সমস্ত সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, এসব কিছুর হিসাব-নিকাশ হবে। ইসলামী রাজ্য স্থাপন, মানবীয় সমাজকে কল্যাণ ও মঙ্গলের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাওয়া ইত্যাদিসহ বাকী সব আমল ও কাজ হচ্ছে মাধ্যম ও ওয়াসীলার। ইসলামের মধ্যে এগুলোর স্থান হলো দ্বিতীয় স্তরের।

সালাত (নামায)

ইসলামী ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত। সালাত হলো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং মুসলিম ও কাফিরের মাঝে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاَقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَلَاتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

"তোমরা সালাত কায়েম করবে আর হবে না মুশরিকদের শামিল।"

[সূরা আর-রূম ঃ ৩১]

ইমাম বুখারী তৎসংকলিত সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রা)-এর রিওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন ঃ

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِتَرْكُ الصَّلٰوة -

বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ করা।

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় আছে ঃ

بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلٰوة -

কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ করা।

সালাত হলো নাজাত ও মুক্তির শর্ত এবং ঈমান হিফাযতের উপায়। হিদায়াত ও তাকওয়ার বুনিয়াদী শর্ত হিসেবে আল্লাহ্ এর উল্লেখ করেছেন।[১] আযাদ-গোলাম, আমীর-গরীব, সুস্থ-অসুস্থ, মুসাফির-মুকীম প্রত্যেকের ওপর যে কোন অবস্থায় সালাত ফরয। কোনক্রমেই বয়ঃপ্রাপ্ত বালিগ ব্যক্তি এই নির্দেশ থেকে স্বতন্ত্র নয়। পক্ষান্তরে সাওম, হজ্জ, যাকাতের বিধান বিভিন্ন শর্ত ও অবস্থার সাথে বিজড়িত। এগুলোর বিশেষ একটা সীমাবদ্ধ সময় রয়েছে। আর সালাত তো যুদ্ধরত অবস্থায়ও যথাসময়ে আদায় করা ফরয। যুদ্ধের ময়দানে থাকা অবস্থায় সালাত শরীয়তের পরিভাষায় 'সালাতুল খাওফ' নামে পরিচিত। এটা এমন এক ইবাদত ও কর্তব্য, ওলী, দরবেশরা বা মুজাহিদ তো দূরের কথা, নবী ও রাসূলদের থেকেও কখনও তা রহিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন পরম সত্য মৃত্যু না আসা পর্যন্ত।[২] [সূরা আল-হিজর ঃ ৯৯]

মৎস্যের জন্য যেমন পানি, তদ্রূপ মুমিনদের জন্য হচ্ছে সালাত। সালাত মুমিনদের আশ্রয় ও নিরাপত্তাস্থল।[৩] সালাত যদি সত্যিকারের সালাত হয় তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত-উপাসনা, অন্য কারো গোলামী, জাহিলী জীবন-পদ্ধতি, অসচ্চরিত্রতা—কোন কিছুর সাথেই এর সহ-অবস্থান ও সম্মিলন সম্ভব নয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ থেকে বিরত রাখে।

সালাত অবশ্যই এমন কোন লৌহ কাঠামো বা শুকনো কাঠের মত নিষ্প্রাণ ও অচল বস্তু নয় যেখানে সকল মুসল্লীই এক ধরনের হবে বা প্রত্যেক মুসল্লী একই মানের হতে যেখানে বাধ্য এবং তার সামনে চলার পথ রুদ্ধ। বরং সালাতের মূলত এক বিরাট ও সুবিস্তৃত ময়দান রয়েছে। মুসল্লী এখানে এ অবস্থা

১. সূরা বাকারা ঃ ১-৩, সূরা আল-আ'লা ঃ ১৪, ১৫ দ্রষ্টব্য।

২. মুফাসসিরগণের এতে কোন দ্বিমত নেই, এ স্থলে য়াকীন অর্থ মৃত্যু। আকাইদশাস্ত্রের বিখ্যাত আলোচ্য বিষয় হলো স্বজ্ঞান ও বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি থেকে কোন সময় শরীয়তের অবশ্য করণীয় বিধান ফরযসমূহ রহিত হয় না।

৩. দ্রষ্টব্য লেখকের আরকান-ই-আরবাআ, নামায প্রবন্ধ।

থেকে অন্য অবস্থায়, অগ্রসরতা থেকে পূর্ণতায় এবং পূর্ণতার সীমা ছেদ করেও এমন সুউচ্চ মর্যাদার দিকে সে নিয়ত অগ্রসর হতে থাকে যা তার ধারণা, এমন কি কল্পনারও বাইরে।

আল্লাহকে পাওয়া, তাঁর সঙ্গে মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপন, তাঁর নৈকট্য ও বন্ধুত্ব লাভের ক্ষেত্রে সালাতের যে বিরাট ভূমিকা, সুউচ্চ প্রভাব ও গুরুত্ব বিদ্যমান, শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের আর কোনটির তেমন নেই। এই সালাতের মাধ্যমেই তত্ত্বজ্ঞানী ও মুজাহিদগণ প্রতিটি যুগেই এবং প্রতি গোষ্ঠীতেই ঈমান ও য়াকীন, ইলম ও মারিফত, জ্ঞান উপলব্ধি, রূহানিয়াত ও লিল্লাহিয়াত আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও বন্ধুত্বের সুউচ্চ মার্গে যেয়ে পৌঁছেছেন, মেধাগর্বীদের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং দার্শনিক বুদ্ধিজীবীদের কল্পনা ততদূর পৌছতে পারেনি কখনও। আর প্রতি যুগেই অব্যাহত রয়েছে এ ধারা ও সালাতের এ প্রভাব। সালাত হচ্ছে নুবূওয়াতের মীরাছ বা উত্তরাধিকার। এ প্রতিটি আঙ্গিক, আদব-আহকাম, বিধি-বিধানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় ও বিস্তৃত আলোচনাসহ সুসংরক্ষিত হয়ে আসছে এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্ম, এক যুগ থেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত যথাযথভাবে তা বর্ণিত হয়ে আসছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে পছন্দনীয় ইবাদত ছিল এই সালাত। মনের প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ হতো তাঁর এতে। ইরশাদ করেন ঃ

وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ -

সালাত হলো আত্মার চক্ষুর শীতলতা ও প্রশান্তি। [নাসাঈ শরীফ]

প্রিয় মুআয্‌যিন হযরত বিলালকে বলতেন ঃ

يَا بِلَالُ، اَقِمِ الصَّلٰوةَ اَرِحْنَا بِهَا -

বিলাল, সালাতের ইকামত দাও আর এর মাধ্যমে আমাকে আরাম দাও।

[আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদব, বাবু-ফী সালাতিল আত্‌মা]

হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা.)-এর যখনই কোন পেরেশানী আসত, তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। [আবূ দাঊদ শরীফ]

তাঁর সালাত ছিল 'ইহ্‌সান'-এর সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ নমুনা। ইহ্‌সান সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেছিলেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ـ

এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। আর যদি তাঁকে তুমি প্রত্যক্ষ করতে না পার তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। [বুখারী, মুসলিম]

প্রত্যেক মুসলমান থেকেও এ ধরনের সালাতই আল্লাহ্ চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও ইক্তিদা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ ـ

তোমরা সেভাবেই নামায পড়, যেভাবে আমাকে তোমরা পড়তে দেখ। [বুখারী]

আর তাই এখানে আমি পাঠকদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সালাতের অবস্থা ও এর রূপ তুলে ধরতে প্রয়াস পাব।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সালাতের পদ্ধতি

সালাত হলো আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার মুনাজাত বা গোপনালাপ। তাই এ আলাপনের প্রস্তুতি হিসাবে এবং তাহারাত ও ওযূর পূর্ণাঙ্গতাকল্পে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুরুতেই মিসওয়াক করে দাঁত-মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা সুন্নত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি এর প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ দিয়েছেন, .এমন কি এই কথাও বলেছেন ঃ

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ـ

উম্মতের কষ্ট হবে যদি এই আশংকা আমার না হতো, তবে প্রতি সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ আমি দিতাম। [বুখারী, মুসলিম]

তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন, প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা 'আল্লাহু আক্‌বর' বলতেন। এর পূর্বে তাঁকে কিছু বলতে শোনা যায়নি। 'আল্লাহু আকবর' বলার সাথে সাথে কিবলামুখী করে হাত দুটো তুলতেন। হাতের আঙ্গুলগুলো থাকত খোলা। পরে ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে বাঁধতেন। তিনি ফরয সালাতসমূহে এই উদ্বোধনী দু'আটি পড়তেন ঃ

১. ইব্‌ন কায়্যিম রচিত 'যাদুল মা'আদ' থেকে এখানে তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ফকীহগণের মধ্যে যে ইখতিলাফ হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ এখানে করা হয়নি। কারণ আলিমগণের কাছে তা গোপন নয়। দ্বিতীয়ত এই গ্রন্থটির কলেবরও বিস্তৃত বিবরণের গুঞ্জায়েশ রাখে না।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

হে আল্লাহ্! তুমি মহান পবিত্র। প্রশংসা তোমারই। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা ও মহত্ত্ব সুউচ্চ। কোন মা'বূদ নেই তুমি ছাড়া।

নফল ও তাহাজ্জুদ সালাতে এ সময়ের বিভিন্ন দু'আর উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন সময় পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ -

হে আল্লাহ্! পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যেমন দূরত্ব তুমি রেখেছ, আমি ও আমার গুনাহ্র মাঝেও তেমন দূরত্ব পয়দা করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে গুনাহ্ থেকে এমন নির্মল ও সাফ করে দাও, যেমন সাফ কাপড় সাফ করা হয় ধূলি-ময়লা থেকে।

অতঃপর তিনি বলতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

আমি আল্লাহর পানাহ চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। আল্লাহ্র নামে শুরু যিনি রহমান ও রহীম।

পরে সূরা ফাতিহা পড়তেন। তাঁর কিরা'আত ছিল খুবই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। এক একটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে তিনি উচ্চারণ করতেন। প্রতিটি আয়াতে থামতেন এবং আয়াতের শেষাংশটি টেনে পড়তেন। সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে 'আমীন' বলতেন।[১] তাঁর পাঠে দু'বার সাক্তা (নিঃশব্দতা) হতো। তাকবীরে তাহরীমা ও সূরা ফাতিহা পাঠের মাঝে, আরেকবার হলো সূরা ফাতিহা পাঠের পর রুকূ'র পূর্বে। সূরা ফাতিহা পাঠ করে তিনি অন্য কোন সূরা পড়তেন। কোন কোন সময়ে পড়তেন দীর্ঘ সূরা। সফর ইত্যাদি হলে সংক্ষিপ্ত সূরাও পড়তেন। তবে সাধারণত মধ্যম ধরনের সূরাই বেশি পড়তেন। খুব লম্বাও হতো না,

১. 'আমীন' সশব্দে পড়া হবে, না আস্তে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের কারণে আলিমগণের ইখতিলাফ হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যাসমূহে ও ফিক্হ গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে।

খুব খাটোও হতো না। ফজরের নামাযে ষাট থেকে সত্তর আয়াত পড়ার আদত ছিল তাঁর। এতে তিওয়ালে মুফাসসাল[১] শ্রেণীর বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াত করতেন। সফর অবস্থায় ফজরের সালাতে ইযা যুলযিলা বা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস-এর মতো ছোট সূরা পড়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়। জুম'আর দিন ফজরের সালাতে আলিফ লাম-মীম-সিজ্‌দা ও সূরা কাহ্‌ফ পুরা পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। বড় বড় জামা'আতে, যেমন—ঈদ, জুম'আ ইত্যাদিতে সূরা কাফ, ইকতারাবাতিস্‌সাআ, সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকা ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া পাঠের তাঁর আদত ছিল।

যুহরের সালাতেও তিনি অনেক দিন লম্বা কিরা'আত পড়তেন। আসরের সালাতে সাধারণত যুহরের সালাতের কিরা'আতের অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করতেন। যুহরের সময় কিরা'আত সংক্ষিপ্ত হলে আসরের সময়ও তদ্রূপ হতো। মাগরিবের সালাতেও দীর্ঘ ও হ্রস্ব উভয় ধরনের কিরা'আত পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাধারণত এতে কিরাকে মুফাস্‌সাল[২] পাঠ করতেন। ঈশার সালাতে পড়তেন মধ্যম ধরনের সূরা। আর তাই ছিল তাঁর পছন্দের। হযরত মু'আয একবার ঈশার সালাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলে তিনি তাঁকে এ থেকে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন ঃ মু'আয! মানুষদের তুমি ফিতনায় ফেলতে চাও?

জুম'আর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকুন সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করতেন। অনেক সময় সাব্বিহিসমা রাব্বিকা ও হাল আতাকাও পড়তেন।

জুম্‌'আ ও দুই ঈদের সালাত ছাড়া আর কোন সালাতের জন্য তিনি কোন সূরা নির্ধারণ করে রাখেন নি। ফজরের সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা প্রথম রাকা'আত দীর্ঘ করতেন। প্রতি সালাতেই অবশ্য প্রথম রাকা'আত দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ হতো।

ফজরের সালাতে তিনি অপরাপর সালাত অপেক্ষা বেশি দীর্ঘ কিরা'আত পড়তেন। কারণ কুরআন শরীফে আছে ঃ

إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

ফজরের কালাম পাঠে অবশ্যই ফেরেশতারা উপস্থিত হয়ে থাকে।

[আল-ইস্‌রা ঃ ৭৮]

১. হুজুরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত সূরাসমূহকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়।

২. لم يكن থেকে الناس পর্যন্ত সূরাসমূহ।

রুকূর সময় হাঁটুতে এমনভাবে হাত রাখতেন যে, মনে হতো তিনি যেন হাঁটুকে ধরে রেখেছেন। হাত পার্শ্বদেশ থেকে আলাদা টান টান করে রাখতেন। পিঠ সোজা বিছিয়ে রাখতেন। এ সময় পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ -

মহিমময় ও পবিত্র আমার প্রভু যিনি মহান।

সাধারণত তিনি দশবার এ তাসবীহ পড়তেন।[১] সিজদার সময়ও তিনি দশবার পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى -

মহিমময় ও পবিত্র আমার প্রভু যিনি সুউচ্চ।

ধীরস্থিরভাবে ও সঙ্গতি রক্ষা করে সালাতের প্রতিটি অঙ্গ পালন করার সাধারণ অভ্যাস ছিল তাঁর। রুকূ থেকে মাথা ওঠাবার সময় তিনি বলতেন ঃ[২]

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه -

আল্লাহ্ শুনেছেন তা, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

রুকূ থেকে ওঠার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এই ছিল তাঁর বরাবরের অভ্যাস। দুই সিজদার মাঝেও তিনি পিঠ সোজা করে বসতেন। যা হোক, রুকূ'র পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলতেন ঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

হে প্রভু, তোমারই সকল প্রশংসা!

কখনও কখনও আরো কিছু অতিরিক্ত শব্দও সংযোজন করতেন। পরে 'আল্লাহু আকবর' বলতে বলতে সিজদায় যেতেন। সিজদায় প্রথমে হাঁটু, এরপর হাত মাটিতে রাখতেন। সিজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে হাত, অতঃপর হাঁটু তুলতেন। নাক ও কপাল উভয়ের ওপর সিজদা ও ভূমিতে সে দুটোকে ভালভাবে স্থাপন করতেন। সিজদার সময় পার্শ্বদেশ থেকে হাত ফাঁক করে রাখতেন এবং এতটুকু মেলে ধরতেন, তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হতো। হাতের তালু রাখতেন কাঁধ ও কানের মাঝে। পায়ের আঙ্গুলগুলো রাখতেন কিবলামুখী করে, সিজদা করতেন পরিপূর্ণ ধীরতা-স্থিরতা ও প্রশান্তির সাথে। এ সময় বলতেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى -

১. তিনবার, পাঁচবার, সাতবারের রিওয়ায়েতও পাওয়া যায়।

২. রুকূ'তে যেতে বা রুকূ থেকে ওঠার সময় হাত ওঠানোর বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ সম্পর্কে ফিক্হ গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

আমার মহিমান্বিত প্রভু পবিত্র।

কখনও কখনও আরো অতিরিক্ত কিছুও এর সাথে মেলাতেন। নফল ও তাহাজ্জুদ নামাযে সিজদাবস্থায় বহু ধরনের দু'আ পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে সিজদা থেকে মাথা তুলতেন। হাত দুটো রাখতেন উরুর ওপর। বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ -

হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও, রহম কর, মন স্থির ও প্রশস্ত করে দাও, হিদায়াত কর, আর রিয্ক দাও আমাকে।

এরপর তিনি পায়ের পাঞ্জা, হাঁটু ও উরুতে ঠেস দিয়ে উঠে পড়তেন। দাঁড়িয়ে পড়ামাত্র কোনরূপ থেমে না থেকেই কিরা'আত শুরু করে দিতেন। দ্বিতীয় রাকা'আত প্রায় প্রথম রাকা'আতের মতোই হতো। তাশাহ্হুদে বসার সময় বাম উরুতে বাম হাত আর ডান উরুতে ডান হাত রাখতেন। বসাবস্থায় তিনি তাশাহ্হুদ পড়তেন। আশ্হাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র—সময় ডান হাতের শাহাদত অংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন। সাহাবায়ে কিরামকে নিম্নোক্ত শাহাদত পাঠের নির্দেশ দিতেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

মহিমা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশের সব ভাষা আল্লাহ্রই। সকল সালাত ও ইবাদত, সকল মঙ্গল ও সাদাকাত তাঁরই জন্য। হে নবী! আপনার ওপর সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হোক; আমাদের ওপরও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের ওপরও হোক সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

এই তাশাহ্হুদে তিনি বেশি সময় নিতেন না। কোন রিওয়ায়েতে নেই, তিনি এই প্রথম তাশাহ্হুদে দরূদ শরীফও পড়েছেন বা কবরের আযাব, জাহান্নামের শাস্তি, জীবন, মরণ ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে হিফাযতের দু'আ চেয়েছেন।

এরপর হাঁটু ও উরুতে ঠেক লাগিয়ে প্রথম রাকা'আতের পর যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি গোড়ালির ওপর দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বাকী রাকা'আতগুলোও উল্লিখিত পদ্ধতিতে সমাধা করতেন। শেষ যে রাকা'আতের পর সালাম ফেরাতেন, সে রাকা'আতের পর আখিরী তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন এবং পূর্বোক্ত দু'আ তাশাহ্হুদ পাঠ করতেন।[১] এই বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ শরীফ পড়ে এই দু'আও পড়তেন[২] ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

হে আল্লাহ্! আপনার নিকট আমি পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, পানাহ চাই দাজ্জালের ফিত্না থেকে, পানাহ চাই জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার পানাহ চাই গুনাহ এবং ঋণের বোঝা থেকে।[৩]

হযরত আবূ বকরকে তিনি এই দু'আ পড়তেও শিখিয়েছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

---

১. তাশাহ্হুদের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ডান পায়ের পাতা খাড়া করে বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে বসতেন, না উভয় পা বের করে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসতেন—এই সম্পর্কে ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ফিক্হ ও হাদীস ভাষ্য গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

২. মুস্তাদরাক হাকিম-এ শক্তিশালী সনদে হযরত ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণিত আছে, 'তাশহ্হুদ পড়ে দরূদ পড়বে, পরে নিজের জন্য দু'আ করবে (ফতহুল বারী, কিতাবুদ্দা'ওয়াত, বাবুস্সালাতি আলান্-নাবী)। বুখারী ও মুসলিমে আছে, তিনি বলেছেন, পরে তোমাদের যে দু'আ পছন্দ হয় পড়তে পার।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে এই দু'আ শেখাতেন। হযরত আবূ হুরায়রা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আখিরী তাশাহ্হুদ পড়ে শেষ করবে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চায়---জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের চক্রান্ত থেকে [মুসলিম শরীফ]। হযরত ইব্ন আব্বাসের রিওয়ায়েতে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে যেভাবে কুরআনের সূরা শেখাতেন, সেইরূপ গুরুত্ব সহকারে তিনি তাদের এই দু'আ শিখিয়েছেন। –মুসলিম শরীফ

হে আল্লাহ্, আমি আমার নফসের ওপর যুলুম করেছি বহু। আর গুনাহ তো মাফ করতে পারে না কেউ আপনি ছাড়া! সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করে দিন। আপনার নিকট থেকে বিশেষ মাগফিরাত দিয়ে, আর রহম করুন আমাকে। নিশ্চয় আপনিই তো পরম ক্ষমাশীল, অতি মেহেরবান!

এছাড়া আরো কিছু দু'আর প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি ডান দিকে সালাম ফেরাতেন। বলতেন ঃ 'আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এভাবে বাম দিকেও তিনি সালাম ফেরাতেন। পরে ডান দিকে বা বাম দিকে ঘুরে বসতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস বলেন, 'আল্লাহু আকবর', 'আল্লাহু আকবর' শব্দ শুনে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সালাত শেষ হয়েছে বলে বুঝতে পারতাম।[১] সালামের পর তিনবার ইস্তিগফার করতেন তিনি এবং বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامْ -

হে আল্লাহ্। তুমিই শান্তি ও নিরাপত্তাস্থল, আর তোমার থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা আসে। তুমিই বরকতময়, হে মহামহিম ও মর্যাদাময়!

এ দু'আটি পড়তে যতক্ষণ লাগত, ততক্ষণই তিনি কিবলারুখ থাকতেন। পরে দ্রুত মুক্তাদীদের দিকে ফিরে যেতেন। কখনও ডান দিকে রুখ করে তিনি ফিরতেন আর কখনও বাম দিকে রুখ করে। প্রতি ফরয নামাযের পর পড়তেন ঃ

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক, শরীক নেই তাঁর। তাঁরই সকল সাম্রাজ্য, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ্! কেউ বাধা দেয়ার নেই তার, তুমি যা দাও; আর কেউ দেয়ার নেই তা, তুমি ফিরিয়ে রাখ যা। কারো বংশমর্যাদা আল্লাহ্র থেকে তার কোন উপকারে আসে না।

১. বুখারী, বাবুয্-যিক্র বা'দাস্ সালাত।

আরো বলতেন ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

কেউ মা'বুদ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক, শরীক নেই তাঁর। তাঁরই সকল সাম্রাজ্য আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী। কারো কোন শক্তি নেই, কোন ক্ষমতা নেই আল্লাহ্ ছাড়া।

এও পড়তেন ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ۔

কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। আমরা কেবল ইবাদত করি তাঁরই। তাঁরই সকল নিয়ামত। তাঁরই সকল অনুগ্রহ, তাঁরই সমস্ত উত্তম প্রশংসা। কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি; তাঁর জন্যই আমার দীনকে খালেদ ও নির্ভেজাল রাখি, কাফিরদের যত খারাপই লাগুক না কেন তা।

ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত আমল উম্মতের জন্য মুস্তাহাব ঃ 'সুবহানাল্লাহ্' তেত্রিশবার, 'আলহামদুলিল্লাহ্' তেত্রিশবার ও 'আল্লাহু আকবর' তেত্রিশবার পাঠ করা। শততম সংখ্যাটি সে পূরণ করবে এই বলে ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

অপর এক রিওয়ায়াতে 'আল্লাহু আকবর' চৌত্রিশবার পড়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বাড়িতে থাকা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হামেশা বার রাকা'আত সুন্নতের ইহতিমাম করতেন। যুহরের পূর্বে চার রাকা'আত, যুহরের পর দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর দু' রাকা'আত, এশার পর দু' রাকা'আত ও

ফজরের পূর্বে দু' রাকা'আত। অধিকাংশ সময় তিনি ঘরেই এই সুন্নতসমূহ আদায় করতেন। মুকীম অবস্থায় কোন সময় তিনি এই নামাযসমূহ পরিত্যাগ করেন নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নীতি ছিল—কোন আমল একবার শুরু করলে তা নিয়মিত অভ্যাসরূপে পরিগণিত করে নিতেন। উপরিউক্ত সুন্নতসমূহের মধ্যে ফজরের সুন্নত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, ফজরের এ দু' রাকা'আত সুন্নতের যে গুরুত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম দিতেন আর কোন নফল ও সুন্নত নামাযের এতটুকু গুরুত্ব তিনি দিতেন না।[১] নফল ও সুন্নত নামাযসমূহ ঘরে পড়ারই তাঁর সাধারণ রীতি ছিল।

সফর হোক বা বাড়ি—সর্বাবস্থায়ই তিনি বিতর সালাতের খুবই গুরুত্ব দিতেন। বিতরের সালাত ফরযের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সালাত। এ সালাতের তাকিদ এসেছে খুবই। ফজরের সুন্নত পড়ার পর তিনি ডান কাতে শুয়ে কিছু আরাম করতেন।

সালাতের জামা'আতও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একাকী সালাতের তুলনায় জামা'আতের সালাতে সাতাশ গুণ অধিক সওয়াব হয়।[২] হযরত ইব্ন মাসউদ বলেন ঃ আমরা দেখেছি জামা'আত থেকে এ ধরনের মুনাফিকরাই পিছে থাকত যাদের মুনাফিকী ছিল সুস্পষ্ট। দু'জন ধরে এনে যাকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতে পারত তাকেও এনে সেই যুগে জামা'আতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।[৩] সফর বা বাড়িতে কোন অবস্থাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করতেন না। কোনদিন যদি বিশেষ কোন অসুবিধার কারণে রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারতেন, তবে দিনের বেলায় বার রাকা'আত নামায পড়ে নিতেন। রাতে সাধারণত বিত্‌রসহ এগার রাকা'আত রাতের নামায পড়তেন। বিত্‌র ও তাহাজ্জুদের রীতি ছিল তাঁর বিভিন্ন ধরনের। তিনি বিত্‌রের মধ্যে দু'আ কুনূতও পড়তেন। বিত্‌র সাধারণত রাতের শেষ দিকে পড়তেন। রাতে কোন সময়

১. সিহাহ্ সিত্তা

২. বুখারী, মুসলিম।

৩. মুসলিম শরীফ ঃ জামা'আতের তাকিদ মূলত পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য মসজিদের তুলনায় বাড়িতে পড়া বেশি ফযীলতের। হযরত ইব্ন মাসউদ বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মহিলাদের জন্য বাড়ির এলাকার তুলনায় গৃহাভ্যন্তরে সালাত আদায় করা উত্তম। স্বীয় শয়ন কক্ষে নামায পড়া তাদের জন্য গৃহে নামায পড়ার তুলনায় উত্তম। –আবূ দাউদ

আস্তে, কোন সময় শব্দে কির'আত পড়তেন। রাকা'আত কখনও লম্বা হতো, কখনও বা হতো হ্রস্ব। রাতে হোক বা দিনে সফরে আরোহী অবস্থায় যে দিকে সম্ভব মুখ করে নফল নামায পড়তেন। এ অবস্থায় রুকূ, সিজদা করতেন ইশারায়।

রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল বড় নিয়ামত দেখলে বা বড় কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে তাঁরা সিজ্‌দা-ই শুক্‌র করতেন। কুরআনে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে বা শুনলে 'আল্লাহু আকবর' বলে সিজদা করে নিতেন।

তাঁরা জুম'আর খুবই সম্মান করতেন এবং এর অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। এ দিন এমন কিছু আমল করতেন যা অপরাপর দিনে করতেন না। জুম'আর দিন গোসল করা, আতর ব্যবহার করা এবং জুম'আর সালাতে শীঘ্র যেয়ে হাযির হওয়া সুন্নত বলে নির্ধারণ করেছেন তিনি। এদিনে তিনি সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াতের গুরুত্ব দিতেন। সামর্থ্যানুসারে ভাল কাপড় পরতেন। হযরত ইমাম আহমদ তদীয় হাদীস সংকলন 'মুসনাদ'-এ উল্লেখ করেছেন, হযরত আবূ আয়্যুব আন্‌সারী বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, জুম'আর দিন গোসল করবে, সামর্থ্য হলে আতর লাগাবে, শক্তি অনুযায়ী ভাল কাপড় পরবে, পরে ধীরস্থির ও সম্ভ্রমপূর্ণভাবে মসজিদে যাবে। আগ্রহ হলে নফল পড়বে। মুসল্লীদের কোন কষ্ট দেবে না। ইমাম যখন মিম্বরে আসবেন, তখন থেকে সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকবে এবং মনোযোগের সাথে খুতবা শুনবে। এভাবে জুম'আর সালাত আদায় করলে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্তের গুনাহ্‌র জন্য এই জুম'আ কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

জুম'আর দিন দু'আ কবূলের বিশেষ একটা মুর্হূত আছে। এ সময়ের দু'আ রদ হয় না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জুম'আর দিনে এমন একটা মুহূর্ত আছে যে, কোন মুসলিম বান্দা সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় বা দু'আর অবস্থায় যদি এ মুহূর্তটিকে পায়, তবে সে যে দু'আ করবে আল্লাহ তাকে অবশ্য তা দেবেন।

এ মুহূর্তটির বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে স্বীকৃত মত হলো, এ মুহূর্তটি হলো আছরের পরবর্তী কোন একটি সময়। ইমাম আহমদ, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবি'ঈর মত এ-ই।

রাসূল (সা)-এর জুম'আর খুতবা হতো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সালাত হতো দীর্ঘ। তিনি এই সময় যিক্‌র খুব বেশি করতেন। তিনি বিপুল অর্থবোধক ও সমৃদ্ধ ভাষা

ব্যবহার করতেন। খুতবায় ইসলামের মূলনীতি, বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামের শিক্ষা দিতেন। প্রয়োজনানুসারে কোন বিষয় থেকে নিষেধ করতেন এবং কোন কোন বিষয়ের নির্দেশ দান করতেন। খুতবা দানের সময় হাতে তলওয়ার বা অন্য কিছু নিতেন না। তবে মিম্বর নির্মাণের পূর্বে ধনুক বা লাঠিতে ভর দিতেন। দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন তিনি। পরে সামান্য ক্ষণ বসে দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াতেন। খুতবা শেষ হলে হযরত বিলাল (রা) ইকামত শুরু করতেন।

ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা উভয় ঈদের নামায তিনি ঈদগাহে আদায় করতেন। একবার মাত্র বৃষ্টির দরুন মসজিদে ঈদের নামায পড়েছিলেন। উভয় ঈদে তিনি সুন্দর ও ভাল পোশাক পরতেন। ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন। তবে বক্‌রা ঈদের সময় ঈদগাহ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কিছুই আহার করতেন না। এদিন তিনি প্রথম কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করতেন।

ঈদের দিনে গোসল করতেন। ঈদগাহে যেয়ে আযান-ইকামত ব্যতিরেকেই সালাত শুরু করে দিতেন। ঈদের দিন তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ কেউই ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে ঈদগাহে অন্য কোন সালাত পড়তেন না। খুতবা দানের পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর পাঠ করতেন[১]। সালাত শেষ করার পর সমবেত মুসল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর মুসল্লীরা স্ব-স্ব স্থানে বসা থাকতেন। তিনি খুতবায় তাঁদের নসীহত করতেন। কোন বিষয় নিষেধ করার হলে নিষেধ করতেন, নির্দেশ দানের হলে তাও দিতেন। কোন প্রতিনিধিদল বা সেনাবাহিনী পাঠাতে হলে পাঠাতেন। প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও সমাধা করতেন। পরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে তশরীফ নিয়ে আসতেন। তাঁদেরকেও আলাদাভাবে ওয়াজ-নসীহত করতেন। এ সময় মহিলারা খুব দান-খয়রাত করতেন। ঈদের খুতবায় তিনি অধিক সংখ্যায় বারবার তাকবীর উচ্চারণ করতেন। তিনি ঈদগাহে এক পথে যেতেন এবং অন্য পথে ফিরতেন।

কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের সময় তিনি নামায পড়েছেন।[২] এ সময় তিনি খুবই মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্য

১. অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ সম্পর্কে ফকীহ্ ও 'আলিমগণের মতামতের জন্য ফিক্‌হ হাদীস গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহ।

গ্রহণের সময় মাত্র একবার তিনি এই নামায পড়েছিলেন। কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হলে গ্রহণ লাগে—এ ধরনের কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল। তাই তিনি উক্ত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করে বলেছিলেনঃ

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ـ

চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রহণ হয় না। গ্রহণ লাগতে দেখলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে, তাঁর মহিমা বর্ণনা করবে, নামায পড়বে; সদকা-খয়রাত করবে।[১] ইস্তিসকা বা বৃষ্টির জন্য সালাতের বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ পাওয়া যায়।[২]

তাঁর জানাযা পদ্ধতি অপরাপর জাতি ও ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। জানাযার সালাত মূলত দু'টি বিষয়ের সংমিশ্রণঃ আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর বন্দেগীর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার। এতে মৃত ব্যক্তির সাথে সর্বোত্তম ও কল্যাণকর সম্পর্কের প্রকাশ বিদ্যমান। তিনি ও অপরাপর উপস্থিত মুসলিমগণ কাতার বেঁধে জানাযার সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। এতে আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা পড়তেন এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করতেন[৩]। জানাযার সালাতের আসল উদ্দেশ্যই হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা।

কবরস্থানে তশরীফ নিয়ে মুর্দাদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করতেন এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে তাঁর রহমতের আবেদন জানাতেন। সাহাবীগণকেও কবর যিয়ারতের সময় এ দু'আ করতে বলতেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

হে কবর সাথী মু'মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! আমরাও ইনশা আল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আল্লাহ্র দরবারে আমাদের ও তোমাদের সকলের জন্য আমরা দু'আ করি।[৪]

---

১. বুখারী শরীফ, বাবু'স সাদাকা ফিল কুসূফ।

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য হাদীস ও ফিক্হ গ্রন্থসমূহ।

৪ যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য হাদীস ও ফিক্হ গ্রন্থসমূহের সাথে ড. ইউসুফ কারযাভীর 'ইসলামের যাকাত বিধান' দ্রষ্টব্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যাকাত ও সাদাকা পদ্ধতি.

জীবন, সম্পদ ও বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, অর্থ-বিত্ত ও পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্কেও ছিল উক্ত নববী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রতীক। এ এমন এক তাৎপর্যমণ্ডিত ও সত্যময় সত্তার দৃষ্টিভঙ্গি যাঁর সামনে সর্বদা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও তাঁর পরাক্রমশীলতা ছিল সুস্পষ্ট, যাঁর সুমহান চরিত্র ছিল ইলাহী আখলাকের প্রতিচ্ছায়া, আখিরাত দিবসের ওপর যাঁর দৃষ্টি ছিল সতত নিবদ্ধ এবং যাঁর ভাষা ছিল হামেশার জন্য এই বাণীতে বাঙ্ময় ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ -

হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই তো জীবন।[১]

আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে বলতেন তিনি ঃ

اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا -

আমি তো চাই এক দিন খাব তো আরেক দিন ভুখা থাকব।[২]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا -

হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ পরিবারকে কেবল পেট চলার মত রিযিক দিও।[৩]

তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন সম্পদ বা সাদাকাতের যে মাল তাঁর কাছে আসত এর অবশিষ্ট সামান্য সময়ের জন্য জমা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেনঃ রাসূল (সা)-এর মৃত্যুশয্যায় আমার কাছে মাত্র ছয়টি বা সাতটি দীনার ছিল। আমাকে তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, এগুলো দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দাও। রাসূল (সা)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদিকে আর আমি খেয়াল দিতে পারিনি। কিন্তু তিনি আবার আমাকে বললেন ঃ ঐ দীনারগুলোর কি করেছ? আমি বললাম ঃ আপনার অসুস্থতার কারণে সেগুলো বণ্টনের খেয়ালই করতে পারিনি। তিনি তখনই সেগুলো আনালেন এবং হাতে রেখে বললেন ঃ নবী সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কি ধারণা হবে যদি তিনি এভাবে সম্পদ জমিয়ে রেখে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হতে যান?[৪] সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূল (সা) সাহাবীদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ যার কাছে অতিরিক্ত

১. বুখারী শরীফ; ২. তিরমিযী শরীফ
৩ বুখারী শরীফ; ৪. বুখারী, সুনান।

যার কাছে অতিরিক্ত সোয়ারী আছে, সে যেন সেটি তাকে দিয়ে দেয় যার সোয়ারী নেই। যার কাছে অতিরিক্ত সামান আছে, সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার সামান নেই।[১]

আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম এই বিষয়ে রাসূল (সা)-এর আদত ও রীতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন ঃ রাসূল (সা) তাঁর অর্থ-সম্পদ সাদাকাত ও কল্যাণকর কাজেই খুব বেশি ব্যয় করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যা কিছুই দিতেন তাকে বেশিও মনে করতেন না বা কম বলেও ভাবতেন না। তাঁর কাছে কেউ যদি কিছু চাইত আর সে বস্তুটি যদি তাঁর থাকত তবে তিনি কম-বেশির তোয়াক্কা না করেই তাকে দিয়ে দিতেন। তিনি এমনভাবে দান করতেন যেন কমে যাওয়ার কোন ভয় নেই তাঁর। দান, সাদাকা ও কল্যাণকর কাজে বিলানো ছিল তাঁর প্রিয় আমল। দান করে এত আনন্দিত হতে দেখা যেত তাঁকে যে, গ্রহীতাও বুঝি এত খুশি হতো না! দানশীলতা ও বদান্যতায় তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। তাঁর হাত ছিল বায়ুর মত প্রবহমান। কোন অভাবী দেখলে নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দিতেন। নিজে না খেয়েও তাকে খাওয়াতেন, নিজে না পরেও তাকে পরাতেন। তাঁর দানের ধরন ও খাতও ছিল বিভিন্ন। কখনও হেবা করে দিতেন, কখনও সাদাকা, কখনও বা হাদিয়া ইত্যাদি নামে দান করতেন। অনেক সময় কারো কাছ থেকে কিছু কিনে ক্রীত বস্তুটি তার মূল্যসহ বিক্রেতাকে দান করে দিতেন। হযরত জাবিরের ঘটনাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কখনও কখনও কারো কাছে থেকে কিছু করয হিসাবে নিতেন, কিন্তু দেয়ার সময় গৃহীত পরিমাণের চেয়ে আরো বেশি ও উত্তম বস্তু দিতেন। কোন জিনিস কিনে অনেক সময় আসল মূল্যের চেয়ে আরো বেশি পরিমাণে দিয়ে দিতেন। মোটকথা, এই বিষয়ে তিনি বহু নয়া নয়া পদ্ধতি ও নজীরবিহীন পথ গ্রহণ করতেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[২]

যাকাতের নির্ধারিত সময়, পরিমাণ, নিসাব, কার কার ওপর তা নির্ধারণ করা হবে, এর খাতসমূহ কি কি ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁর অনুসৃত শরীয়ত ও ব্যবস্থা পদ্ধতি অত্যন্ত পরিপূর্ণ এবং সমন্বিত। এক্ষেত্রে তিনি যেমন সম্পদাধিকারীদের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তেমনি দরিদ্র ও অভাবীজনদের কল্যাণের প্রতিও সমূহ দৃষ্টি রেখেছেন। যাকাত ব্যবস্থাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদাধিকারীদের সম্পদের পবিত্রতা এবং তাদের জন্য আল্লাহর রহমত

১. আবূ দাউদ, হযরত আবূ সাঈদ খুদুরীর বরাতে।

২. যাদুল মা'আদ, ১ ঃ ১৫৬।

ও অনুগ্রহের এক মহামাধ্যম হিসাব নির্ধারণ করেছেন।[১] তাঁর রীতি ছিল, যে অঞ্চলের ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করতেন সেই অঞ্চলের দরিদ্রদের মাঝেই তা বণ্টন করতেন। যদি অঞ্চলের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হতো তবে তা তাঁর খেদমতে নিয়ে আসা হতো। তখন তিনি নিজে তা বণ্টন করতেন। পশু বা খেত-খামার, বাগান ইত্যাদি প্রকাশ্য সম্পদের মালিকদের নিকটই কেবল যাকাত সংগ্রহের জন্য তিনি নিয়োজিত লোকদের পাঠাতেন।[২] যাকাতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ নিয়ে নেয়ার রীতি তাঁর ছিল না, বরং তিনি মাঝামাঝি ধরনের বস্তু গ্রহণ করতেন।

ফিতরা আদায়ও কর্তব্য বলে তিনি বিধান দিয়েছেন। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই ফিতরা আদায় করার অভ্যাস ছিল তাঁর।

রাসূল (সা)-এর সিয়াম (রোযা) পদ্ধতি

দ্বিতীয় হিজরী সনে সিয়াম ফরয হয়। সে মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে নয়টি রমযান মাস পান এবং এতে তাঁর রোযা রাখার সুযোগ হয়। সিয়াম বিষয়ে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি হচ্ছে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত পদ্ধতি এবং নফসের সংশোধন ও আল্লাহ্‌র প্রতি আবদিয়াত ও দাসত্ব প্রকাশের কল্যাণকর ও প্রভাবশীল মাধ্যম। সাথে সাথে তাঁর অনুসৃত এই পদ্ধতি হচ্ছে সহজতম ও সরলতম পদ্ধতি।

রমযান মাসে তিনি বিভিন্ন ধরনের 'ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন। হযরত জিবরীল আসতেন, তিনি তিলাওয়াত করতেন, হযরত জিবরীল শুনতেন; হযরত জীবরীল তিলাওয়াত করতেন আর তিনি শুনতেন। এভাবে কুরআন করীমের দওর হতো তাঁদের। হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমনই ছিলেন দানশীল, হযরত জিবরীল যখন আসতেন তখন তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত, এমন কি সবেগে প্রবহমান বায়ুর মতো মনে হতো তাঁকে।

---

১. আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔

আপনি এদের সম্পদ থেকে যাকাত নিন, এর মাধ্যমে এদেরকে পবিত্র করুন, এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর আপনার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিস্বরূপ। [সূরা বারাআতঃ ১০৩]

২. ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় এ ধরনের সম্পদকে আমওয়ালে জাহিরা বলা হয়।

রমযান মাসে তিনি এমন বহু 'ইবাদত করতেন যা রমযানের বাইরে অন্য সময় সাধারণত করতেন না। অনেক সময় তিনি একাধারে কোন কিছু ইফতার না করে কয়েকদিন এক সাথে রোযা রাখতেন। তবে সাহাবীগণকে তিনি এ ধরনের রোযা রাখতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ যখন আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি নিজে তো এ ধরনের রোযা করেন। তখন ইরশাদ করেছিলেন ঃ আমি তো তোমাদের মতো নই। আমি তো আমার রবের কাছে এমনভাবে রাত বা দিন কাটাই যে, তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং তিনিই আমাকে পান করান।

রমযানে সাহরী খাওয়ার প্রতি তিনি খুবই উৎসাহিত করতেন। মুসলিমদের জন্য তিনি সুন্নত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন একে। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সাহরী খেয়ো, কারণ সাহরীতে বরকত নিহিত রয়েছে।[১] সহীহ্ রিওয়ায়েতে আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

> কিতাবীদের সিয়াম আর আমাদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো আমরা সাহরী খাই, কিন্তু ওরা সাহরী খায় না।[২]

ইফতারী গ্রহণে বিলম্ব করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং একে গোঁড়াপন্থী কট্টর ইয়াহূদী-নাসারার বৈশিষ্ট্য এবং একে খারাবির মাধ্যম বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ করেছেন ঃ মুসলিমরা ততদিন কল্যাণ ও মঙ্গলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন তারা সময় হয়ে গেলে শীঘ্র ইফতারী গ্রহণ করবে।[৩] আরো ইরশাদ করেছেন ঃ এই দীন ততদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন মুসলিমরা সত্বর ইফতারী গ্রহণ করবে। কেননা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা ইফতারীর বিষয়ে বিলম্ব করে। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সাহরীর বেলায় দেরি করতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, মাগরিবের নামাযের পূর্বেই তিনি ইফতার করতেন। তাব বা তাজা খেজুর যদি পেতেন তা খেতেন। যদি তা না থাকত তবে শুকনো খেজুর খেতেন, তা-ও না থাকলে এক ঢোক পানি খেয়েই ইফতার করে নিতেন। ইফতারীর সময় এই দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ -

> হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই এই রোযা রেখেছি, আর আপনার দেয়া রিয্‌ক দ্বারাই ইফতার করছি।

---

১. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।
২. মুসলিম;
৩. বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা, তিরমিযী।

আরো বলতেন ঃ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

পিপাসা মিটে গেছে, উপশিরাও আর্দ্র হয়ে গেল, আর আল্লাহ্ চাহেন তো পুরস্কারও নির্ধারিত হয়ে গেছে।[১]

রমযান মাসে তিনি সফরও করেছেন। সফরের সময় কখনও কখনও রোযা রেখেছেন, আবার কখনও রোযা রাখেন নি। সফর অবস্থায় সাহাবীগণকে তিনি রোযা রাখা না রাখার ইখ্তিয়ার দিয়েছেন। জিহাদের সম্মুখীন হলে সাহাবীগণকে রোযা না রাখার নির্দেশ দিতেন যেন তাদের যুদ্ধের শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। রমযান মাসেই ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও ফলাফল নির্ণায়ক লড়াই বদরের যুদ্ধ ও মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল।

তিনি তিন দিন তারাবীহ্র নামায পড়েছিলেন। ক্রমে এ জামা'আতের সংবাদ পেয়ে বহু লোক এসে এতে শরীক হতে থাকেন। চতুর্থ দিন এত ভিড় হয়ে যায় যে, মসজিদে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। এ রাত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আর তারাবীহ পড়ান নি, একেবারে ফজরের সময় ঘর থেকে বের হলেন। বাদ ফজর সমবেত মুসল্লীদের দিকে ফিরে হামদ ও ছানার পর ইরশাদ করলেন ঃ আজ তোমাদের এত অধিক সংখ্যক উপস্থিতি সম্পর্কে আমি অনবহিত ছিলাম না। কিন্তু আমার আশংকা হলো--না জানি এ নামায তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয় তখন তোমরা আর তা কুলাতে পারবে না! রাসূল (সা)-এর ওয়াফাত পর্যন্ত বিষয়টি এভাবেই থাকে।[২]

তাঁর ওয়াফাতের পর সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ্র বাকায়াদা জামা'আত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তা সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়।[৩]

রাসূল (সা) অনেক নফল রোযা রাখতেন। কোন কোন সময় তা ত্যাগও করেছেন। যখন নফল রোযা রাখতে শুরু করতেন, তখন মনে হতো তিনি আর তা ছাড়বেন না কখনও; আর যখন বন্ধ করতেন মনে হতো তিনি বুঝি আর

১. আবূ দাউদ।

২. বুখারী শরীফ, বাবু ফাযালু মান কামা রামাযান।

৩. তারাবীহ ও তা বা-জামা'আত আদায় করার ব্যবস্থা বিধানে হযরত উমরের অবদান, এর রাকা'আত সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ফিক্হ ও হাদীস ভাষ্য গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

রাখবেন না কখনও। তবে রমযানের বাইরে পূর্ণ কোন মাস তিনি রোযা রাখেন নি। অন্যান্য মাসের মধ্যে শা'বান মাসে সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন তিনি। সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি নফল রোযা রাখতেন এবং এর খুবই গুরুত্ব দিতেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) সফরে বা বাড়িতে কোন অবস্থায়ই আয়্যামবীয অর্থাৎ প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা ত্যাগ করতেন না।[১] অন্যদেরও এর জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। রমযানের সিয়ামের পর তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন আশুরার রোযার।সাহাবীগণ একবার আরয করেছিলেন, এ দিনটি তো ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের পবিত্র দিন। তিনি বললেন ঃ আগামী বছর যদি সুযোগ পাই তবে নবম তারিখের রোযাও আমি এর সঙ্গে রাখব।

তিনি আরাফা দিবসে রোযা রাখতেন না। সওমে দাহর বা নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনের পর দিন নফল রোযা রাখার রীতি ছিল না তাঁর। সহীহ্ হাদীসে আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন (নফল রোযার মধ্যে) ঃ আল্লাহ্র কাছে প্রিয় রোযা হলো হযরত দাউদের রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, আরেকদিন রোযা রাখা বাদ দিতেন।[২]

তাঁর অভ্যাস ছিল, ঘরে যেয়ে জিজ্ঞাসা করে যদি জানতে পারতেন যে কিছু নেই তখন বলতেন, আজ রোযা রেখে ফেললাম।

মৃত্যু পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করার আদত ছিল তাঁর। একবার কোন কারণে রমযানে তা আদায় করতে না পারায় শাওয়াল মাসে তা পূরণ করেন। প্রতি বৎসর দশ দিন ই'তিকাফ করতেন বটে, তবে যে বৎসর তাঁর ওয়াফাত হয়, সেই বৎসর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন। প্রতি রমযানে হযরত জিবরীল একবার পুরা কুরআন শরীফের দওর করতেন, কিন্তু ওয়াফাতের বৎসর দু'বার করেছিলেন তা।[৩]

রাসূল (সঃ)-এর হজ্জ ও ওমরা পদ্ধতি

এতে সকলেই একমত, হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মাত্র একবার হজ্জ করেছেন।[৪] এই হজ্জটি ইতিহাসে হাজ্জাতুল বিদা' বা

১. নাসাঈ শরীফ

২. মুসলিম শরীফ, কিতাবুস্ সিয়াম।

৩. যাদুল মা'আদ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে, পৃ. ১৫৮-১৭৬।

৪. হজ্বের দর্শন ও তাৎপর্য জানার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের আরকানে আরবা'আ-এর হজ্জ অধ্যায় এবং আহকাম ও বিধি-বিধানের জন্য দ্রষ্টব্য যাদুল মা'আদ।

বিদায় হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ। দশম হিজরী সনে এই হজ্জ হয়েছিল। নবম মতান্তরে দশম হিজরী সনে হজ্জ ফরয হয়। হিজরতের পর তিনি মোট চারবার উমরা করেন। এর সবই ছিল যুলকা'দা মাসে।

দশম হিজরী সনে সংঘটিত তাঁর হজ্জের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলোঃ[১] হজ্জের এরাদার কথা তিনি সকলকে ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন। এ ঘোষণা পেয়ে সাহাবীরাও তাঁর সাথে হজ্জের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিলেন। মদীনার চতুষ্পার্শে এ খবর ছড়িয়ে গেলে সেখানকার মুসলিমরাও এসে দলে দলে হাযির হতে লাগলেন। পথেও বিরাট বিরাট কাফেলা এসে তাঁর সাথে শামিল হতে থাকে। ডানে, বামে, সামনে, পিছনে–চতুর্দিকে যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ।

২৫শে যুলকা'দা শনিবার যুহরের পর তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। এর পূর্বে তিনি যুহরের ফরয আদায় করেন। এরও আগে সমবেত মু'মিনদের লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এতে ইহ্‌রামের ওয়াজিব, সুন্নত ও করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দেন। অতঃপর তালবিয়া পাঠ করে রওয়ানা হয়ে পড়েন। তালবিয়ার দু'আ হলো এই ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

আমি হাযির, হে আল্লাহ্! আমি হাযির, আমি হাযির। তোমার কেউ শরীক নেই, আমি হাযির; সকল প্রশংসা, নিয়ামত ও সাম্রাজ্য তোমারই; কেউ শরীক নেই তোমার।

সমবেত সফরসঙ্গী সাহাবীরা কোন কোন সময় এই শব্দগুলো সংক্ষেপে পড়ছিলেন, কোন কোন সময় বিপুল আবেগে আরো বাড়িয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে তাদেরকে কোনরূপ নিষেধ করেন নি। এ তালবিয়া পাঠ সেখানে চলছিল। আরায নামক স্থানে এসে তিনি সাথীদের নিয়ে তাঁবু ফেললেন। তাঁর ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাহন ছিল একটিই। পরে আরো অগ্রসর হয়ে আল-আবওয়ায় উপনীত হলেন। সেখান থেকে যী-তুওয়া নেমে তাঁবু ফেলেন। শনিবারের রাত অতিবাহিত করেন সেখানেই। তখন ছিল যিলহজ্ব মাসের চার তারিখ। সেখানেই তিনি ফজরের

১. যাদুল মা'আদ থেকে এই তথ্যসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

সালাত আদায় করেন এবং সেই দিন গোসল করে মক্কায় রওয়ানা হয়ে যান। মক্কার ওপরের দিক থেকে সেখানে তিনি প্রবেশ করেন। চাশ্‌তের সময় তিনি হারাম শরীফে পৌঁছেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফের ওপর দৃষ্টি পড়তেই বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً -

হে আল্লাহ্! এই ঘরের মর্যাদা, সম্মান, মহিমা, তাজীম, ভীতি ও শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি করে দাও।

এই সময়ে তিনি হাত তুলে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ -

হে আল্লাহ্! আপনিই হলেন শান্তি ও নিরাপত্তাস্থল। আর আপনার থেকেই আসে শান্তি ও নিরাপত্তা। হে আমাদের রব! শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আপনি আমাকে যিন্দা রাখুন।

হারাম শরীফে প্রবেশের পর সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে গেলেন। কাউকে না ঠেলে হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন এবং ডান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করলেন। বায়তুল্লাহ্ ছিল তখন বাম পার্শ্বে। তওয়াফের সময় তিনি শওতে রমল করেন।[১] তাওয়াফের সময় তিনি দ্রুত পা ফেলছিলেন; কদম ছিল ছোট ছোট ; এক কাঁধে চাদর ফেলে রেখেছিলেন আর এক কাঁধ ছিল তাঁর খোলা।[২] তওয়াফকালে হাজরে আসওয়াদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় এক দিকে ইশারা করে হাতের ছড়ি দ্বারা ইস্তিলাম করছিলেন।

তওয়াফ সমাধার পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে এসে এই আয়াতও তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلًّى -

তোমরা গ্রহণ কর মাকামে ইবরাহীমকে সালাত স্থলরূপে।

[সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৫]

অতঃপর তিনি এই স্থানে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন এবং আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে তশরীফ নিয়ে যান। এতে চুমু খেয়ে সামনের দরজা দিয়ে সাফার দিকে গেলেন। সাফার কাছে পৌঁছে বললেন ঃ

---

১. হাত দুলিয়ে সকলে চলা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য হজ্জ সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ।

২. পরিভাষায় এটিকে বলা হয় ইয্‌তিবা; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ اَبْدَأُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ بِهٖ ـ

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। আমি শুরু করছি যেখান থেকে আল্লাহ্ শুরু করেছেন।

সাফায় আরোহণ করলেন। বায়তুল্লাহ্ যখন দৃষ্টিগোচর হলো কিবলার দিকে রুখ করলেন। আল্লাহ্‌র একত্ব ও মহিমা ঘোষণা করলেন। বললেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক, কোন শরীক নেই তাঁর। তাঁরই সমস্ত সাম্রাজ্য। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। সব কিছুর ওপর তিনি সর্বশক্তিমান। নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক, তিনি পূরণ করেছেন তাঁর ওয়াদা, সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাকে, পরাভূত করেছেন সম্মিলিত দলসমূহকে একাকীই।

মক্কায় তিনি রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ–এই চারদিন অবস্থান করেন। বৃহস্পতিবার সূর্য ওঠার পর পরই সাথীদের নিয়ে মিনায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। যুহর ও আসরের সালাত আদায় করেন সেখানেই। রাত সেখানে অতিবাহিত করেন। এ ছিল জুম'আর রাত। সূর্য ওঠার পর সকলকে নিয়ে 'আরাফার দিকে যাত্রা করেন। নামিরায় তাঁর তাঁবু প্রস্তুত ছিল। সেখানেই তিনি অবতরণ করেন। পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার সময় হলে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীটি প্রস্তুত করতে বললেন। পরে সেখান থেকে 'আরাফা ময়দানের মাঝে যেয়ে থামলেন এবং সোয়ারীর ওপর বসেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। এটিই বিদায় হজ্বের ভাষণরূপে প্রসিদ্ধ। এতে তিনি ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ও মূল্যবোধসমূহ তুলে ধরেন। শির্ক ও জাহিলী যুগের বুনিয়াদ খতম করে দেন। আজ পর্যন্ত সমস্ত ধর্মে যে সমস্ত বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত সেই সমস্ত জিনিস তিনি হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন। সেগুলো হলো ঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, কারো সম্পদ অপহরণ করা, কারো সম্মান বিনষ্ট করা। জাহিলী যুগের সকল কুসংস্কার ও প্রচলিত রীতি-নীতিসমূহকে পদদলিত বলে ঘোষণা করেন। জাহিলী যুগের সুদ পুরাপুরি খতম করে দেন এবং একে বিলকুল বাতিল বলে ঘোষণা দেন। নারী জাতির সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করেন এবং বলেন, বিধানানুসারে সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহারের মানদণ্ডানুসারে খোরপোষ ও নান-নফকার হক এদের জন্য নির্ধারিত।

আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে উম্মতকে ওসীয়ত করলেন। বললেন ঃ যতদিন তোমরা একে মযবুতীর সাথে ধরে রাখবে, ততদিন তোমরা গুমরাহ্ হবে না। কিয়ামতের দিন জবাবদিহি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করলেন। সেই দিন তাঁর নিজের সম্পর্কেও উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং সকলকে এই সম্পর্কে জবাব দিতে হবে বলে ইরশাদ করলেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি সমবেত মুসলিমদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা সেদিন আমার সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দেবে? সমবেত সকলেই একবাক্যে উত্তর দিলেন ঃ আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি সত্যের পয়গাম যথাযথভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কোনরূপ কমবেশি করেন নি এতে। আপনি আপনার কর্তব্য পুরাপুরি আদায় করেছেন। আপনি আমাদের কল্যাণ কামনার হক সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন।

এই কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আসমানের দিকে অঙ্গুলী তুলে ধরলেন। আল্লাহ্‌কে এর ওপর সাক্ষ্য বানানোর কথা তিনবার উচ্চারণ করলেন। পরে সকলকে নির্দেশ দিলেন ঃ যারা উপস্থিত আছ তারা, যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে এই পয়গাম পৌঁছে দিও।

ভাষণ শেষ করার পর হযরত বিলালকে আযান দিতে বললেন। তিনি আযান দিলেন। সঙ্গীদের নিয়ে যুহরের দু' রাকা'আত নামায পড়লেন। আসরের নামাযও এখানে দু' রাকা'আতই তিনি পড়েছিলেন। এই দিনটি ছিল জুম'আর দিন।

নামায শেষে তাঁর সোয়ারীর কাছে তশরীফ নিলেন এবং মাওফিক-এ উপনীত হলেন।[১] এখানে তিনি তাঁর উটটির উপর আরোহী অবস্থায় সূর্য না ডোবা পর্যন্ত মুনাজাতে নিমগ্ন রইলেন। মালিকুল-মুলক, সকল সাম্রাজ্যের মালিক আল্লাহ্‌র হুযূরে কাকুতি-মিনতি ও রোনাযারী করতে থাকলেন। দু'আর সময় বুক পর্যন্ত হাত ওঠাচ্ছিলেন, ভিখারি যেমন ভিখ মাগার সময় করে থাকে। দু'আ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْئٌ مِّنْ اَمْرِىْ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ ـ الْمُسْتَجِيْرُ وَالْوَجِلُ . اَلْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوْبِىْ اَسْاَلُكَ

১. ওকূফের স্থান। এখানে তিনি বহুক্ষণ দু'আ করেছিলেন। আজো স্থানটি চিহ্নিত ও প্রসিদ্ধ ।

مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَأَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَذَلَّ جِسْمُهُ وَرَغِمَ أَنْفُهُ لَكَ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَكُنْ بِىْ رَؤُوْفًا رَحِيْمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ ـ

হে আল্লাহ্! তুমি তো আমার কথা শুনছ, আমার অবস্থা দেখছ, আমার গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জান, আমার কিছুই তোমার কাছে লুক্কায়িত নেই। আমি বিপদগ্রস্ত, আমি মুখাপেক্ষী, অভাবী, আমি ফরিয়াদী, আমি আশ্রয় তালাশী, আমি পেরেশান হাল, আমি সন্ত্রস্ত। আমার সমস্ত গুনাহ স্বীকার করছি আমি। আমি অপরাধী, আমি ভিখারী, মাগছি তোমার কাছে। পাপীর মত আমি কাঁদছি। বিপদগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তির মত আমি ডাকছি তোমাকে। ডাকছি আমি সেই ব্যক্তির মতো, যার গর্দান তোমার দরবারে অবদমিত, যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যার তোমার কাছে বিনীত, তোমার দরবারে নিজের নাক ঘষছে যে!

হে আল্লাহ্! তোমার কাছে দু'আর ব্যাপারে বিফল করো না আমাকে। আমার সম্পর্কে তুমি স্নেহার্দ্র ও মেহেরবান হও। যাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হে সত্তা ও হে শ্রেষ্ঠ দাতা!

এ সময় এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

আজ সম্পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত আর মনোনীত করলাম তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে। [সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩]

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আরাফা থেকে যাত্রা করলেন। হযরত উসামা ইব্ন যায়দকে সোয়ারীতে সাথে বসালেন। ধীরস্থির ও প্রশান্তভাবে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। উষ্ট্রীর লাগাম এমনভাবে চেপে ধরেছিলেন যে, এর মাথাটি হাওদার কাষ্ঠখণ্ডের সাথে বাড়ি খাচ্ছিল প্রায়। মুখে বলছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা ধীরস্থিরভাবে চল। মুযদালিফা পর্যন্ত পুরা পথ তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

মুযদালিফায় পৌঁছে হযরত বিলালকে আযান দিতে বললেন। আযান দেয়া হলো। তিনি সকলকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর সকলেই উটের পিঠ থেকে নিজ নিজ সামান নামিয়ে গুছিয়ে রাখলেন। এর সাথে সাথে তিনি ইশার সালাতও আদায় করে নিলেন। পরে বিছানা পেতে ফজর পর্যন্ত শুয়ে রইলেন।

আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়লেন এবং সোয়ারী করে মাশ'আরুল হারামে এলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'আ, রোনাযারী, যিক্‌র ও আল্লাহ্‌র দরবারে কাকুতি-মিনতিতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। চতুর্দিকে আলো ছড়িয়ে পড়লে সূর্য ওঠার আগেই তিনি মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হলেন। এই সময় তাঁর সোয়ারীতে সাথে বসালেন হযরত ফযল ইব্‌ন আব্বাসকে। মুখে সব সময়ই তালবিয়া পড়ছিলেন তিনি। এই সময় হযরত ইবন আব্বাসকে রমী-উল-জিমারের জন্য সাতটি কংকর কুড়িয়ে নিতে বললেন। ওয়াদী মুহাসসারের মাঝামাঝি পৌঁছে উটটির গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং দ্রুত এই স্থানটি অতিক্রম করে গেলেন। কারণ এই স্থানটিতেই আবরাহার হস্তীবাহিনীর ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল। মিনায় পৌঁছে জামরাতুল আকাবায় গেলেন। সূর্য ওঠার পর সোয়ারীর ওপর বসে থেকেই রমীর কাজ সমাধা করলেন এবং তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিলেন। পুনরায় মিনায় এলেন এবং একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। এতে তিনি ইয়াওমুন্ নাহরের ফযীলত, আল্লাহ্‌র কাছে এর সম্মান ও মর্যাদার কথা তুলে ধরলেন। পৃথিবীর সকল স্থানের ওপর মক্কা শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করলেন। আল্লাহ্‌র কিতাবানুসারে যিনি মুসলিমদের পরিচালনা করবেন তার আনুগত্য করতে নির্দেশ দিলেন। পরে সমবেত লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে হজ্জ সম্পর্কিত বিধি-বিধানসমূহ জেনে নিতে বললেন এবং ইরশাদ করলেনঃ দেখ, তোমরা কাফিরদের মতো হয়ে যেয়ো না, পরস্পরে যুদ্ধ করো না। আমার কথাগুলো অন্যদেরও পৌঁছে দিও। আরো বললেন ঃ

اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَطِيْعُوْا اِذَا اَمَرَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔

তোমরা ইবাদত করবে তোমাদের প্রভুর আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, এক মাস রমযানের সিয়াম পালন করবে, তোমাদের প্রশাসকদের আনুগত্য করবে, পরিণামে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

এই সময় তিনি তাঁর উম্মতের সামনে বিদায়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ কিছু কথা প্রকাশ করেন। তাই এই হজ্জটি হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ।

পরে তিনি মিনায় মানহার বা কুরবানী করার স্থানে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং নিজের হাতে তেষট্টিটি কুরবানী দেন। এই সংখ্যা ছিল তাঁর বয়সানুরূপ। শততম সংখ্যা হওয়ার জন্য যে কয়টি সংখ্যা অবশিষ্ট ছিল তা পুরা করতে হযরত আলীকে বললেন। কুরবানীর পর ক্ষৌরকার ডেকে হলক করালেন। কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মাঝে পবিত্র এই কর্তিত চুলগুলো বিতরণ করে দেন। অতঃপর সোয়ারীতে আরোহণ করে মক্কায় এসে তওয়াফ্ ইযাফা সম্পাদন করেন। এই তওয়াফকে তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়ে থাকে। যমযম কূপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করলেন। এই দিনেই পুনরায় মিনায় চলে আসেন এবং সেখানেই রাত অতিবাহিত করেন। দ্বিতীয় দিন সূর্য পশ্চিমে হেলে না পড়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন। যাওয়াল বা সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার সময় হয়ে এলে রমী জিমারের উদ্দেশে তশরীফ নিয়ে গেলেন। প্রথমে জাম্‌রা উলা, পরে জামরায়ে বুস্‌তা, পরে জামরায়ে আকাবা সমাধা করেন। মিনায় তিনি দু'টো খুতবা দেন। একটা দেন কুরবানীর দিন; ওপরে সেটির উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি দেন কুরবানীর পরের দিন।

এই স্থানে অবস্থান করে আইয়ামে তাশরীকের তিন দিনের সবক'টি রমীর কাজ সমাধা করেন এবং পরে মক্কায় ফিরে আসেন। সেখানে সাহরীর সময় তাওয়াফে ওয়াদা' বা বিদায়ী তওয়াফ সমাধা করে সকলকে প্রস্তুত হতে বললেন এবং মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করেন।[১] পথে গাদীর খুম নামক স্থানে একটি ভাষণ দেন।[২] এতে হযরত আলীর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَهُ -

আমি যার প্রিয়, আলীও তার নিকট প্রিয়। হে আল্লাহ্! আলীর সঙ্গে যে ভালবাসা পোষণ করে তুমিও তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করো; আলীর সাথে যে শত্রুতা করে তুমিও তার সাথে শত্রুতা করো।[৩]

---

১. যাদুল মা'আদ থেকে সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করা হয়েছে। ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মতবিরোধ ও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান পরিত্যাগ করেছি।

২. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। জুহ্‌ফা ও এর মধ্যে ব্যবধান হলো দু'মাইলের।

৩. ইমাম আহ্‌মদ ও নাসাঈর রিওয়ায়েত আছে, এই হাদীসটি বলার কারণ হলো ঃ কিছু সংখ্যক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হযরত আলীর বিরুদ্ধে কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ করে। এতে তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ইয়ামেনে হযরত আলীর সাথে অবস্থানকারী কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তাঁর ইনসাফভিত্তিক কিছু কাজ সম্পর্কে তাদের এ ভুল বোঝাবুঝি হয়, তিনি বুঝি পক্ষপাতিত্ব করছেন। [ইব্‌ন কাছীর ঃ ৪১৫-৪১৬]

যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে তিনি রাত্রি যাপন করেন। মদীনা নগরীর মীনার দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং দু'আ করলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক, কোন শরীক নেই তাঁর। তাঁরই সমস্ত সাম্রাজ্য, তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী। আমরা ফিরে আসছি, আমরা তওবা করি, আর ইবাদত করি, আমাদের প্রভুর প্রশংসা করি। আল্লাহ্ সত্যে পরিণত করেছেন তাঁর ওয়াদা, সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দার আর পরাভূত করেছেন সম্মিলিত বাহিনীসমূহ একাকী।[১]

বিশেষ বিশেষ স্থান ও সময়ের যিকর এবং মস্নূন দু'আসমূহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদিয়াত, আল্লাহ্র প্রতি গোলামী ও দাসত্ব, তাঁর প্রতি মনোযোগিতা ও তাওয়াজ্জুহের এবং আল্লাহ্র যিকর ও ধ্যানে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ নমুনা ও আদর্শ। তাঁর মন ও মুখ, যবান ও দিল সব সময়েই থাকত আল্লাহ্র যিকরে মশগুল এবং তাঁরই ধ্যানে সিক্ত। সর্বাবস্থায় তিনি থাকতেন আল্লাহ্র স্মরণে নিমগ্ন।

সাহাবীগণকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন শোবার যখন ইচ্ছা করেন, তখন যেন তাঁরা এই দু'আ পড়েন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

হে আল্লাহ্! আমি সমর্পণ করেছি আমার চেহারা তোমার দিকেই, সোপর্দ করলাম আমার সকল বিষয় তোমার কাছেই, রেখে দিলাম আমার পিঠ তোমার দিকেই। তোমার প্রতিই আগ্রহ, আর ভয়ও তোমারই। কোন আশ্রয় নেই, কোন মুক্তিস্থল নেই তোমার থেকে তোমাকে ছাড়া। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের ওপর যা তুমি নাযিল করেছ এবং তোমার নবীর ওপর যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ।

---

১. যাদুল মা'আদ, ১ ঃ ২৪৯।

তিনি ইরশাদ করেছেন, শোবার আগে এই কালেমাগুলোই যেন তোমাদের শেষ কথা হয়। তাহলে যদি এই রাতে মারা যাও তবে এই মৃত্যু ফিতরাত ও ইসলামের ওপর হয়েছে বলে গণ্য হবে।[১]

শোওয়া থেকে ওঠার পর বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْر ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের যিন্দা করেছেন আমাদের মৃত্যু দানের পর; আর তাঁরই দিকে পুনরুত্থান।

রাতে সজাগ হলে বলতেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّاب ـ

কোন ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া। তুমি মহান ও পবিত্র। হে আল্লাহ্! আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার গুনাহসমূহের, প্রার্থনা করছি তোমার কাছে তোমার রহমতের। হে আল্লাহ্! বাড়িয়ে দাও আমাকে জ্ঞান, বক্র করো না আমার হৃদয়, আমাকে তুমি হিদায়াত দান করেছ যখন। আর দাও আমাকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত। নিশ্চয়ই তুমি তো বিপুল দাতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস বলেছেন, যে রাতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘরে ছিলেন, সে রাতে তিনি দেখেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন সজাগ হলেন তখন আকাশের দিকে মাথা তুলে সূরা আল-'ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন।[২]

বিতর শেষ করার পর তিনবার এই সূরা পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْس ـ

মহিমা ও পবিত্রতা হচ্ছে পবিত্র মালিকের।

---

১. মুসলিম শরীফ, বাব্ মা ইয়াকু'লু 'ইন্‌দান' নাওম।

২. اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ হতে ... لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ পর্যন্ত

তৃতীয় বারের সময় খুব টেনে পড়তেন এটি। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ ـ

আল্লাহ্‌র নামে শুরু। আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমারই পানাহ চাই আমি পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বা আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে, আমার পদস্খলিত হওয়া থেকে বা আমাকে পদস্খলিত করা থেকে, আমি যুলুম করা থেকে বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে। আমি মূর্খতার আচরণ করা থেকে বা আমার সাথে মূর্খতার আচরণ করা থেকে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কেউ যদি সালাতের জন্য বাড়ি থেকে বের হয় আর এই দু'আটি পড়ে তবে তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যাঁরা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি ঐ ব্যক্তিটির প্রতি মুতাওয়াজ্জুহ থাকেন যতক্ষণ না সে সালাত শেষ করেছে। দু'আটি হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ هٰذَا اِلَيْكَ فَاِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ بَطَرًا وَلَا اَشَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَاِنَّمَا خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُنْقِذَنِىْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

হে আল্লাহ্! তোমার দরবারের ভিখারী হওয়ার বদৌলতে এবং তোমার দিকে আমার এই কদম ফেলার বদৌলতে যাত্রা করছি আমি তোমারই কাছে। অহংকার ও গরিমা করে রিয়াকারী খ্যাতির উদ্দেশে তো আমি ঘর থেকে বের হয়নি। আমি তো বের হয়েছি তোমার ক্রোধ থেকে বাঁচতে এবং তোমার সন্তুষ্টির তালাশে। তোমার কাছেই আমি প্রার্থনা করছি, আমাকে তুমি জাহান্নাম থেকে নাজাত দাও; আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার গুনাহসমূহ; গুনাহ তো মাফ করতে পারে না কেউ তুমি ছাড়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করতে যায় তবে সে যেন নবীর ওপর দরূদ ও সালাম পড়ে। পরে বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

হে আল্লাহ্! খুলে দাও আমার তরে তোমার রহমতের দ্বার।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -

হে আল্লাহ্। তোমার কাছে আমি তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করি।

ভোরের সময় তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرِ -

হে আল্লাহ্! তোমার সাহায্যই আমাদের ভোর, তোমার সাহায্যেই আমাদের সন্ধ্যা। তোমার মাধ্যমেই আমাদের জীবন, তোমার মাধ্যমেই আমাদের মরণ। আর তোমার দিকেই আমাদের পুনরুত্থান।[১]

আরো বলতেন ঃ

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَافِىْ هٰذَا الْيَوْمُ وَخَيْرَ مَابَعْدَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْيَوْم وَشَرِّمَا بَعْدَهُ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِىْ النَّارِ وَعَذَابٍ فَى القَبْرِ -

ভোর করলাম আমরা, আর সমস্ত দেশও ভোর করল আল্লাহ্র জন্যই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সমস্ত সাম্রাজ্য, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। হে আমার রব! প্রার্থনা করি তোমারই কাছে আজকের এই দিনের যে কল্যাণ রয়েছে এবং যে কল্যাণ রয়েছে এর পরও; পানাহ চাই আজকের এই দিনের অকল্যাণ থেকে এবং এর পরের অকল্যাণ থেকেও। হে আমার রব! পানাহ চাই তোমার কাছে অলসতা থেকে, অশুভ বৃদ্ধাবস্থা থেকে। হে প্রভু! পানাহ চাই তোমার জাহান্নামের মাঝে আযাবে পতিত হওয়া থেকে এবং কবরেও আযাবে নিপতিত হওয়া থেকে।

১. সহীহ্ হাদীস

সন্ধ্যার সময় তিনি বলতেন ঃ

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَافِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمُ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ ـ

সন্ধ্যা করেছি এবং সমস্ত দেশ সন্ধ্যা করেছে আল্লাহ্‌র জন্য।[১] [বাকি পূর্ববর্তী দু'আটির মত]

হযরত আবূ বকর একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করলেন ঃ আমাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়তে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْئٍ وَمَلِيْكَهٗ وَمَالِكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرْكِهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ ـ

হে আল্লাহ্! হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা, সব কিছুর রব, মালিক ও প্রভু! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোন ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া। তোমার কাছেই পানাহ্ চাই আমার স্বীয় নফসের নষ্টামি থেকে, শয়তানের দুষ্টামি ও তার শির্‌ক থেকে, আর আমার ওপর কোন মন্দ বিষয় টেনে আনা থেকে বা কোন মুসলিমের অকল্যাণ সাধন করা থেকে।

আরো বললেন, ভোরের সময় বলবে ঃ

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَايَتَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ ـ

১. মুসলিম শরীফ।

ভোর করেছি আমরা, ভোর করেছে সারা দেশ আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব। হে আল্লাহ্! আমি প্রার্থনা করি তোমার কাছে আজকের এই দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হিদায়াত। আমি পানাহ্ চাই এতে এবং এর পরবর্তীতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে।

সন্ধ্যায় اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ -এর স্থলে اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى যোগ করে শেষ পর্যন্ত দু'আটি পড়ো।

প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-কে তিনি একদিন বলেছিলেন ঃ সকাল ও সন্ধ্যায় এই দু'আটি পড়তে তোমার অসুবিধা কি?

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ اَسْتَغِيْثُ فَاَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

হে চিরঞ্জীব ও বিশ্বদাতা! তোমার উসিলায় আমি ফরিয়াদ করছি, ঠিক করে দাও আমার অবস্থা। এক পলকের জন্যও তুমি আমাকে আমার হাওয়ালা করে দিও না।

তিনি ইরশাদ করেছেন, সায়্যিদু ইস্তিগফার বা ইস্তিগফার সংক্রান্ত দু'আর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ -

হে আল্লাহ্! তুমিই আমার প্রভু, কোন ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া। তুমিই তো সৃষ্টি করেছ আমাকে, আর আমি তোমার বান্দা। আমি আছি তোমার প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির ওপর যতটুকু আমার সামর্থ্যে কুলায়। তোমার কাছেই পানাহ্ চাই আমার কর্মের অশুভ ও অকল্যাণ থেকে। আমার ওপর তোমার সব নিয়ামতের স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং আমার গুনাহ্ও আমি স্বীকার করছি। তুমি মাফ করে দাও আমাকে। কেউ তো গুনাহ্ মাফ করতে পারে না তুমি ছাড়া!

নতুন কাপড় পরিধান করলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ -

হে আল্লাহ্! তুমি পরিধান করিয়েছ এটি। আমি তোমার কাছে এর শুভ কামনা করি এবং যে উদ্দেশে এটি তৈরি করা হয়েছে তারও শুভ প্রার্থনা করি। আর পানাহ্ চাই এর অশুভ থেকে এবং যে উদ্দেশে এটি তৈরি করা হয়েছে এর অশুভ থেকেও।

একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কাপড় পরার সময় যদি কেউ নিম্নের দু'আটি পড়ে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেন। দু'আটি হলো ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে এটি পরিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতিরেকেই এটি আমাকে দান করেছেন।

উম্মে খালিদ নাম্নী জনৈকা মহিলা সাহাবীকে একটা নয়া কাপড় দেয়ার সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

اَبْلِىْ وَاَخْلِقِى ثُمَّ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِى -

জীর্ণ ও পুরাতন কর, জীর্ণ ও পুরাতন কর।[১]

হাদীসে আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন, ঘরে প্রবেশের সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে চাই প্রবেশের কল্যাণ ও বহির্গমনের কল্যাণ। আল্লাহ্র নামে আমরা প্রবেশ করছি আর আমাদের প্রভু আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করছি।

ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের সময় তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি পানাহ্ চাই সকল প্রকার মন্দ ও অপবিত্রতা থেকে।

১. এটি মূলত দু'আবাচক বাক্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে এটি না হারিয়ে পুরাতন ও জীর্ণ করার সুযোগ দিন আর ততদিন তুমি বেঁচে থাক।

অন্য একটি বর্ণনায় এই দু'আটির সাথে আছে ঃ

اَلرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

হে আল্লাহ্! আমি পানাহ্ চাই দুর্গন্ধ, নাপাক ও মরদূদ শয়তান থেকে।

ইস্তিঞ্জাখানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ

غُفْرَانَكَ -

তোমারই মাগফিরাত চাই।

আরো বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি দূর করে দিয়েছেন আমার থেকে ক্লেশকর বস্তু এবং নিরাময় দান করেছেন আমাকে।

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ উত্তমরূপে অযূ করে কেউ যদি নিম্নের দু'আটি পড়ে তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। যেটি দিয়ে তার ইচ্ছা হবে সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হলো ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া; তিনি এক, কোন শরীক নেই তাঁর। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়াতে নিম্নের বাক্যটি এর সাথে সংযোজিত হয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এই দু'আ পড়তেও দেখা গেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ -

হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমার গুনাহ, প্রশস্ততা দাও আমার গৃহে, আর বরকত দাও আমার রিয্কে।

আযানের সময় তিনি আযানের শব্দগুলোই দোহ্‌রাতে বলেছেন। তবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এবং حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة - এর সময় এর জওয়াবে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه - পড়তে হুকুম করেছেন।

আযানের পর বলবে ঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا -

আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করে রব বলে, ইসলামকে দ্বীন বলে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বলে।

পরে দরূদ শরীফ পড়ে এই দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ দাওয়াত ও উপস্থিত দণ্ডায়মান সালাতের রব; তুমি দাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ওয়াসীলা ও মর্যাদা, আর পৌঁছাও তাঁকে মাকামে মাহমুদে যার ওয়াদা করেছ তুমি। নিশ্চয় তুমি তো খেলাফ করো না ওয়াদা।

তিনি বিস্‌মিল্লাহ বলে খানা শুরু করতেন। খানার পর বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলিম ও সমর্পিত বান্দাদের মধ্যে শামিল করেছেন।

কোন কোন হাদীসে এর সাথে كَفَانَا وَاٰوَانَا (আমাদের প্রয়োজন পুরো করে দিয়েছেন এবং ঠিকানা দিয়েছেন অবস্থানের) শব্দও যোগ করা হয়েছে।

দস্তরখানা ওঠানো হলে বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, অনেক পবিত্র ও বরকতময় এমন হাম্‌দ তাঁরই, যা করে যথেষ্ট করা যায় না বা ছাড়া যায় না কখনও, আর অনপেক্ষও হওয়া যায় না যা থেকে, হে মহামহিম, পরাক্রমশালী আমাদের রব!

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা)-এর দাওয়াত খাওয়ার পর এই দু'আ করেছিলেন ঃ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ الطَّعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ـ

ইফতার করুন আপনার এখানে রোযাদারগণ, আপনার খানা আহার করুন নেক লোকগণ, আর আপনার জন্য রহমতের দু'আ করুন ফেরেশতাগণ।

নতুন চাঁদ দেখে তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

হে আল্লাহ্! ঈমান ও নিরাপত্তা, শান্তি ও ইসলামের ভেতর আমাদের চাঁদ আনয়ন করুন। হে চাঁদ! আল্লাহ্ হচ্ছেন আমার রব এবং তোমারও রব।

কোন কোন হাদীসে এও যোগ করা হয়েছে ঃ

وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

সেই তওফীকের সাথে যা তুমি ভালবাস ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট, আমাদের ও তোমার রব আল্লাহ্ই।

কোন কোন হাদীসে আছে, এর পর তিনি বলতেন ঃ

هِلَالُ رُشْدٍ وَّخَيْرٍ هِلَالُ رُشْدٍ وَّخَيْرٍ ـ

নেকী ও কল্যাণের চাঁদ, নেকী ও কল্যাণের চাঁদ।

সফরের জন্য প্রস্তুত হলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَاِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِىْ وَاَنْتَ رَجَائِىْ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ مَا اَهَمَّنِىْ وَمَا لَا اهْتَمَّ لَهُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ عِزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِىَ التَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَ وَجِّهْنِىْ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ ـ

হে আল্লাহ্! তোমার নামে চলেছি, তোমার দিকে রুখ করেছি, তোমাকেই ধারণ করলাম এবং তোমার ওপরই ভরসা করলাম। হে আল্লাহ্! তুমিই

ভরসা আমার, তুমিই আমার আশা। হে আল্লাহ্! তুমিই যথেষ্ট হয়ে যাও তার যা আমাকে চিন্তিত করে এবং যার আমি চিন্তা করি না, তুমিই আমার অপেক্ষা বেশি জান তা। মর্যাদাশীল তোমার প্রতিবেশী, মহিমময় তোমার প্রশংসা। কোন ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া। হে আল্লাহ্! পাথেয় দাও আমাকে পরহেযগারীর, মাফ করে দাও আমার গুনাহ, আর যেদিকেই আমি ফিরি না কেন, সেদিকেই মঙ্গল রাখ আমার।

সোয়ারীর ওপর আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। পরে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন এটি, আমরা নিজের শক্তিতে এটি বশ করতে পারতাম না। আমাদের রবের দিকেই আমরা ফিরে যাচ্ছি।

পরে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِ هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْبُعْدَ -

হে আল্লাহ্! আমার এই সফরে তোমার কাছে প্রার্থনা করি সৎ কর্ম ও তাকওয়ার এবং তুমি যে আমল পছন্দ কর তার। হে আল্লাহ্! তুমিই তো সঙ্গী সফরে আর তুমিই স্থলবর্তী পরিবারে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই সফরের কষ্ট থেকে এবং ফেরার পর খারাপ কিছু দেখা থেকে। আমাদের জন্য সহজ করে দাও এই সফর এবং সঙ্কুচিত করে দাও দূরত্ব।

সফর থেকে ফেরার সময় বলতেন ঃ

اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

আমরা ফিরে আসছি, আমরা তওবা করি, ইবাদত করি আর আমাদের প্রভুর প্রশংসা করি।

যে সমস্ত যিকর-আযকারের ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের কতিপয় ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক দু'আ

সাধারণ যিক্‌র ও ওয়াজীফা

এখানে আমরা সেই সমস্ত যিক্‌র ও আওরাদ উল্লেখ করতে চাই হাদীসে যেগুলোর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলো সম্পর্কে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা ইমাম নাওয়াবী নামে প্রসিদ্ধ হযরত ইমাম আবূ যাকারিয়া মুহীউদ্দীন ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)-এর কিতাবুল আযকার ও শ্রদ্ধেয় ওয়ালিদ মরহুম মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী (র)-এর 'তালখীসুল আখবার' নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার পেশ করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔

দুটো শব্দ, যবানে খুব হালকা কিন্তু মীযানের পাল্লায় খুব ভারি আর রহমান ও দয়াময়ের কাছে খুব প্রিয়। শব্দ দুটো হলো ঃ

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল 'আজীম।

হযরত সামূরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) বর্ণনা করেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

احب الكلام الى الله تعالى اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ۔

চারটি কালেমা হলো আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঃ

সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার। এগুলোর যে কোন কালেমা দ্বারা শুরু কর না কেন কোন ক্ষতি নেই।

তিনি আরো বলেন ঃ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَانِ اَوْ تَمْلَاُ مَابَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আলহামদুলিল্লাহ্ ভরে দেয় মীযানের পাল্লা। সুবহানাল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহও ভরে দেয় আকাশ-যমীনের মাঝের ব্যবধানটুকু।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ -

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার—বলা যা কিছুর ওপর সূর্য ওঠে সেসব কিছু থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি দশবার এই দু'আটি পড়বে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারটি দাস আযাদ করার সওয়াব পাবে। দু'আটি হলো ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সমস্ত সাম্রাজ্য আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শ' বার উক্ত দু'আটি পড়বে, তবে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে, তার নামে একশ'টি নেকী লেখা হবে, তার একশ'টি গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে, সেই দিনের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার শয়তান থেকে হিফাযত হবে। যে ব্যক্তি এটি বেশি বার পড়েছে সে ছাড়া আর কারো আমল তার বরাবর হবে না।

তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শ' বার সুবহানাল্লাহিয়া ও বিহামদিহি পড়বে, সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও যদি তার গুনাহ্ হয় আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হলো ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া

সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ প্রতি দিন ভোরে তোমাদের শরীরে যতগুলো জোড় আছে ততটি সদকা করা তোমাদের জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সুবহানাল্লাহ বলা একটি সদকাস্বরূপ, আলহামদুলিল্লাহ একটি সদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি সদকা, আল্লাহু আকবার বলা একটি সদকা, সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি সদকা; আর দু'রাকাত চাশতের নামায এই সবক'টির পক্ষ থেকে যথেষ্ট।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন ঃ তোমাকে আমি কি জান্নাতের এক খাযানার সন্ধান দেব? আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই, হযরত! তিনি বললেন ঃ তাহলে বল, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হযরত আবূ সাঈদী খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দু'আটি পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। দু'আটি হলো ঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا -

আমি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট আল্লাহ্কে গ্রহণ করে রব বলে, ইসলামকে দ্বীন ও জীবন বিধানরূপে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাসূলরূপে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মে'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম! আপনার উম্মতকে আমার সালাম দেবেন এবং তাদের বলবেন, জান্নাতের মাটি বড় উর্বর, পানি বড় মিষ্টি, আর সে ময়দান খালি। এর চারা হলো ঃ সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর।

হযরত আম্র ইবনুল 'আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

فَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا -

যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ্ তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

১. মুসলিম শরীফ

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً ـ

যে ব্যক্তি আমার ওপর সবচে বেশি দরূদ পড়ে সে কিয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী থাকবে।[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ـ

তার নাকে মাটি লাগুক, সে লাঞ্ছিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ ـ

আমার কবরকে তোমরা আনন্দ মেলা বানিয়ো না। আমার ওপর তোমরা দরূদ পড়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়।[২]

হযরত কা'ব ইবনে 'উকবা (রা) বলেন ঃ একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে আমরা আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার ওপর সালাম কি করে পড়তে হবে তা তো আমরা জেনেছি, আপনার উপর দরূদ পড়ার পদ্ধতি কি? তিনি জবাবে ইরশাদ করলেন ঃ তা হলো এই— হে আল্লাহ্! তুমি রহমত নাযিল কর মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর, যেমনভাবে তুমি রহমত করেছ ইবরাহীম (আ)-এর ওপর এবং আলে ইবরাহীম (আ)-এর ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

১. তিরমিযী শরীফ
২. আবু দাউদ শরীফ

হে আল্লাহ্! বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর এবং আলে মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ) এবং আলে ইবরাহীম (আ)-এর ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।[১]

রাসূল (সা)-এর কতিপয় ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জনাময় দু'আ

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রচিত আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব থেকে নিম্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কতিপয় ব্যাপক অর্থসমৃদ্ধ দু'আর উল্লেখ করা হলো ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ পছন্দ করতেন। দীর্ঘ ও লম্বা দু'আ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। তিনি দু'আয় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে যাচ্ঞা করি সকল মঙ্গলের, যার কথা আমি জানি আর যা আমি জানি না সব কিছুর। আর তোমার কাছে পানাহ চাই সকল অমঙ্গল থেকে, যা আমি জানি এবং যা আমি জানি না সব থেকে।[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি সর্বদা হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত থাকতাম। তাঁকে আমি বেশি বেশি এই দু'আ পড়তে দেখেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ وَالْبَخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই চিন্তা থেকে, দুঃখ থেকে, অক্ষমতা থেকে, অলসতা থেকে, বখিলী থেকে, ভীরুতা থেকে, ঋণের হাড়ভাঙ্গা বোঝা থেকে ও মানুষের আধিপত্য থেকে।[৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম। এ সম্পর্কিত হাদীস ও এর হাকীকত ও তাৎপর্যের জন্য দ্রষ্টব্য আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের جلاءالا فهام فى الصلواة والسلام على خير الانام ও হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া-এর ফাযাইলে দরূদ।

২. মুসনাদ আহমদ, নাসাঈ

৩. বুখারী শরীফ

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

হে আল্লাহ্ ! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে, পানাহ্ চাই মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে, পানাহ্ চাই জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ্! আমি পানাহ্ চাই তোমার কাছে গুনাহ থেকে ও ঋণের বোঝা থেকে।

কোন একজন একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ঋণের বোঝা থেকে খুব বেশি পানাহ্র দু'আ করে থাকেন, ব্যাপার কি?

তিনি জবাবে বললেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ ـ

মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্যতম দু'আ ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ فُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ ـ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই আমার থেকে তোমার নিয়ামত অপসৃত হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার প্রদত্ত সার্বিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা বিদূরিত হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক ক্রোধ পতিত হওয়া থেকে এবং তোমার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।[২]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে একবার প্রশ্ন করলাম, যদি কোন দিন শবে কদর আমার নসীব হয় তবে কি দু'আ করব তখন? তিনি বললেন, এই দু'আ করবে ঃ

১. বুখারী, মুসলিম, ২. মুসলিম।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর; সুতরাং তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে পছন্দ দু'আ হলো আফিয়াত বা সুস্থতা ও নিরাপত্তার দু'আ।[২]

আবূ মালিক আশজাঈ (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া-সাল্লাম যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন তাদের নিম্নের দু'আটি পড়তে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْحَمْنِىْ -

হে আল্লাহ! হিদায়াত দাও আমাকে, রিযক দাও আমাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান কর আমাকে, আর রহম কর আমাকে।[৩]

বুস্র ইব্ন আরতাত (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এই দু'আ করতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ -

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল কাজের পরিণাম শুভ কর আর পানাহ দাও দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে।[৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন ঃ তোমরা কি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক দু'আ পছন্দ কর? সাহাবীগণ বললেন ঃ নিশ্চয়ই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি তখন বললেন, এই দু'আ করো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শক্তি দাও তোমার যিক্রের, তোমার প্রতি শুকর আদায়ের এবং তোমার সুন্দর ইবাদতের।[৫]

হযরত মু'আয (রা)-কে তিনি প্রতি সালাতের পর এই দু'আ পড়তে বলেছিলেন।[৬]

---

১. তিরমিযী, ২। মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩. মুসলিম, ৪. মুসনাদ আহমদ, ৫ মুস্তাদরাকে হাকিম, ৬. তিরমিযী শরীফ।

সাহাবীগণকে তিনি এই দু'আটি শিখিয়েছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَتُوْبَ عَلَىَّ وَتَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَّ فِىْ خَلْقِكَ فِتْنَةً فَنَجِّنِىْ اِلَيْكَ مِنْهَا غَيْرَ مَفْتُوْنٍ اللّٰهُمَّ وَاسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّبَلِّغُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ ـ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে চাই পবিত্র বস্তুসমূহ, ভাল কর্ম, মন্দের পরিত্যাগ, দরিদ্র-মিসকীনদের প্রতি ভালবাসা। আর চাই তুমি কবূল কর আমার তওবা, মাফ করে দাও আমাকে, রহম কর আমার ওপর। যখন তুমি তোমার সৃষ্টি সম্পর্কে ফিতনার ইরাদা কর, তখন তুমি আমাকে এ থেকে নাজাত দিয়ে ফিতনামুক্ত করে তোমার কাছে নিয়ে যেয়ো। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে চাই তোমার মুহব্বত, তোমাকে যারা মুহব্বত করে তাদের মুহব্বত এবং যে আমল আমাকে তোমার মুহব্বতের পৌঁছে দেবে সে আমলের মুহব্বত।[১]

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল (সা) তাঁকে নিম্নের দু'আটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَقَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ وَاَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَةُ رُشْدًا ـ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই সকল মঙ্গল নগদ ও বাকি সব ধরনের, যা আমি জানি তা-ও আর যা জানি না তা-ও। আর তোমার কাছে পানাহ চাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অমঙ্গল থেকে , যা আমি জানি আর যা জানি না তা থেকেও। চাই তোমার নিকট জান্নাত এবং যে কথা ও কাজ এর নিকটবর্তী করে তা। আর পানাহ চাই তোমার কাছে

১. মুস্তাদরাকে হাকিম।

জাহান্নাম থেকে এবং যে কথা ও কাজ এর নিকটবর্তী করে তা থেকেও। চাই তোমার কাছে সে মঙ্গল থেকে কিছু যে মঙ্গলের প্রার্থনা করেছেন তোমার কাছে তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা) আর আমাদের জন্য তুমি যা কিছুর ফয়সালা করেছ সে সব কিছুর পরিণাম যেন ভাল হয় তা-ও তোমার কাছে চাই।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই দু'আটিরও বর্ণনা করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ -

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি এমন সব উপকরণ, যা তোমার রহমত ও মাগফিরাত পাওয়ার কারণ বলে গণ্য হয় এবং চাই সকল গুনাহ থেকে সফলতা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি।[২]

১. মুস্তাদরাকে হাকিম

২. মসনুন দু'আসমূহের হিকমত, তাৎপর্য ও উপকারিতার জন্য দ্রষ্টব্য সীরাতে মুহাম্মদী দু'আকে আইনে মে।

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

দীন ও সীরাতে নবূবীর আলোকে জিহাদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে দাওয়াত ও পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন তা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ মারিফাত ও পরিচয় লাভ, বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত আকাইদের ঈমান ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য, ভালবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম আত্মিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না, এই সকল কিছুর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাঁর পয়গামের অন্যতম বুনিয়াদী স্তম্ভ ও একান্ত প্রিয় আমল।

আল্লাহ তা'আলা ইরাশাদ করেন ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

তিনিই, যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূল হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ, যেন বিজয়ী করেন তা সকল দীন ও মতাদর্শের ওপর, যদিও এতে নাখোশ হয় কাফিররা। [সুরা তওবা ঃ ৩৩, সূরা সাফ্ ঃ ৯]

আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

লড়াই চালিয়ে যাও এদের বিরুদ্ধে যতদিন না ফিতনা অর্থাৎ কুফরীর আধিপত্য খতম হয়েছে, আর দীন পুরাপুরি না হয়েছে কেবল আল্লাহ্‌রই।

[সূরা আনফাল ঃ ৩৯]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম যাদুল মা'আদে লেখেন ঃ

জিহাদ ইসলাম-সৌধের সুউচ্চ চূড়া। দুনিয়ায় যেমন মুজাহিদের মর্যাদা ও সম্মান সবার ওপরে তেমনি আখিরাতেও হবে তার তেমনি সুমহান ও সুউচ্চ

সম্মান ও মর্যাদা। আর তাই এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের অধিষ্ঠান। তাঁর মধ্যেই ঘটেছিল জিহাদের সব ধরন ও সব কিসিমের সমন্বিত সমাহার। আল্লাহ্‌র রাহে মন ও মস্তিষ্ক, দাওয়াত ও তাবলীগ, তীর ও তলওয়ার সব ধরনের জিহাদের হক পুরো করে দেখিয়ে গেছেন তিনি। সারাটা সময়ই তাঁর নিয়োজিত ছিল আত্মিক, শাব্দিক ও শারীরিক জিহাদে। দুনিয়ায়ও তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অতিরিক্ত আর আল্লাহ্‌র কাছেও তিনি সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বাপেক্ষা নিকটতম। আল্লাহ্‌র দুশমনদের সাথে বাইরের জিহাদ নফসের সাথে অভ্যন্তরীণ জিহাদেরই একটা অঙ্গ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করে। সুতরাং নফসের সাথে জিহাদ বাইরের দুশমনদের সাথে জিহাদের তুলনায় মর্যাদাসম্পন্ন এবং তা এর আসল বুনিয়াদ।

বিভিন্ন প্রকারের জিহাদ ও গুরুত্ব হিসাবে এগুলোর অবস্থানক্রমে জিহাদ চার প্রকারঃ

ক. নফসের সাথে জিহাদ।

খ. শয়তানের সাথে জিহাদ।

গ. কাফিরদের সাথে জিহাদ।

ঘ. মুনাফিকদের সাথে জিহাদ।

এইগুলোর আলাদা আলাদা শ্রেণী ও ক্রমবিন্যাসও রয়েছে। হাদীসে আছে ঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزِ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ -

যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় যে সে জিহাদ করেনি বা মনে মনে জিহাদের আশা পোষণও করেনি সে মুনাফিকীর একটা অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মারা গেল।

জিহাদের সকল স্তর ও শ্রেণী একত্রে যাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে তিনিই হবেন আল্লাহ্‌র কাছে ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানবসত্তা বলে গণ্য। শেষ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে নৈকট্য লাভকারী ও পূর্ণতা অর্জনকারী বান্দা। জিহাদের যত শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে সবারই পরিপূর্ণ প্রতীক ছিলেন তিনি। আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের পরিপূর্ণ হক

আদায় করে দেখিয়েছিলেন তিনি। নুবুওয়াতের শুরু থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজকে জিহাদে মশগুল রেখেছেন, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজেই সব সময় ব্যাপৃত থেকেছেন, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডেকেছেন। কঠিন ও দুঃসহ কষ্ট ও পীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীগণকে। প্রবল নির্যাতনের মুখে একদল সাহাবীকে হাবশা দেশে হিজরত করে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল। শেষে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদের হিজরত করে যেতে হলো মদীনায়। মদীনা শরীফে তাঁদের অবস্থান কিছুটা দৃঢ় হলো। আল্লাহ্‌র বিশেষ নূসরত ও মু'মিনদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য করলেন, পরস্পরে সৌভ্রাতৃত্ব ও সদ্ভাব সৃষ্টি করে দিলেন। আনসার সাহাবী ও অপরাপর মুসলিম সেনানী তাঁর সাথে সীসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় এসে দাঁড়ালেন, নিজেদের প্রাণ লুটিয়ে দিলেন তাঁরই জন্য; বাপ-দাদা, পুত্র-পৌত্র, স্বামী-স্ত্রী সকলের তুলনায় তাঁরা অধিক ভালবাসতেন তাঁকে। আরব মুশরিক ও য়াহূদীরা মিলে তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের মুকালিয়ায় দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তখনও আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের ধৈর্য ধারণ ও ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতে থাকেন। ক্রমে মুসলিমদের জামা'আত সুদৃঢ় হলো এবং একটি শক্তি হিসাবে যখন আত্মপ্রকাশ করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ও যুদ্ধের অনুমতি দেন, কিন্তু তা ফরয করেন নি তখনও। ইরশাদ হলো ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ -

লড়াইর অনুমতি দেয়া হলো তাদের, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে। কারণ তারা মজলুম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাহায্য করার সবিশেষ ক্ষমতা রাখেন। [সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩৯]

এর পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করে দেয়া হলো। আর যারা যুদ্ধ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়নি। ইরশাদ হলো ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ -

তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। [সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯০]

অতঃপর সকল মুশরিক ও কাফিরের বিরুদ্ধে লড়াই ফরয বলে ঘোষণা হল। ইরশাদ হলো ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

এদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতদিন না ফিতনা ও কুফরী নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং সমস্ত দীন না হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌রই। [সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৯]

জিহাদের ফযীলত, এর আদব ও উপকারিতা

হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ উম্মতের কষ্ট হবে এই আশংকা যদি না হতো তবে আমি কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকতাম না। আহ, আমাকে যদি আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ করা হতো, আবার যিন্দা করা হতো, আবার শহীদ করা হতো, আবার যিন্দা করা হতো, আবার শহীদ করা হতো!

আরো ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের উদাহরণ হলো সেই রোযাদারের মত, যে মুজাহিদের ফিরে না আসা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে আল্লাহ্‌র সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করছে, অথচ সে সিয়াম সালাত কোনটিতেই ক্লান্ত হচ্ছে না।

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ আল্লাহ্‌র রাহের একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা দুনিয়া এবং এর সব কিছু থেকে উত্তম। আরো ইরশাদ করেন ঃ তলওয়ারের ছায়ায় হলো জান্নাত।

আরো ইরশাদ করেন ঃ যে দুটো পা আল্লাহ্‌র রাহের ধুলোয় ধূসরিত হয়েছে তা জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে গেছে।

আরো ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র রাহের ধুলো আর জাহান্নামের আগুন কখনও একত্র হবে না।

আরো ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র রাহে মোর্চা বেঁধে প্রহরা দান দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম। আরো ইরশাদ করেন ঃ জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া।

হাদীসে আছে, যুদ্ধ যখন ভীষণভাবে লেগে যেত তখন সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আশ্রয় নিতেন। এই কঠিন অবস্থায়ও তিনি শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকতেন।

নারী ও শিশুদের ওপর তলওয়ার তুলতে তিনি নিষেধ করেছেন। সেনাদল প্রেরণ করার সময় তাদের আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁকওয়ার নসীহত করতেন তিনি। বলতেনঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা কর আল্লাহর রাহে, যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। মুছলা বা নিহত ব্যক্তির চোখ, কান, নাক কেটে তার চেহারা বিকৃত করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানত করবে না। কোন শিশুকে হত্যা করবে না।

যাকে তিনি কোন সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করতেন তাকে উপরোক্ত নির্দেশের সাথে সাথে আরো বলতেন, শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সময় তাদের তিনটা বিষয়ের প্রতি আহ্‌বান জানাবে। এর যেটি তারা গ্রহণ করবে তোমরাও সেটিকে গ্রহণ করে নেবে। প্রথম, তওহীদ ও ইসলামের প্রতি আহ্‌বান জানাবে। তারা যদি একটি গ্রহণ করে নেয় তবে তাদের থেকে তোমার হাত গুটিয়ে নেবে। নিজেদের এলাকা থেকে মুহাজিরীনের অঞ্চলে হিজরত করে যেতে বলবে তাদের, তাহলে অপরাপর মুহাজির যে অধিকার ভোগ করেন সেখানে তারাও তদ্রূপ অধিকার ভোগ করতে পারবে এবং তাদের মতো একই রূপ দায়িত্বও তাদের ওপর বর্তাবে। আর এরা যদি হিজরতে প্রস্তুত না হয় তবে বলবে বেদুঈন পল্লীতে বসবাসরত আরবীদের মতো হবে তার অবস্থা। সাধারণ মু'মিনদের সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্‌র বিধান ও হুকুম-আহ্‌কামের সাথে এরাও সংশ্লিষ্ট থাকবে। তারা যদি অপরাপর মুসলিমের সাথে যুদ্ধে শরীক হয় এমতাবস্থায়ই কেবল তারা গনীমত ও ফায় সম্পদ থেকে হিস্যা পাবে। এর জন্য যদি তারা প্রস্তুত না হয় তবে জিযয়ার দাবি জানাবে। এতে তারা যদি রাযী হয় তবে ভাল কথা; এদের বিরুদ্ধে তখন আর লড়বে না। আর যদি তা-ও দিতে প্রস্তুত না হয়, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখে যুদ্ধ শুরু করে দেবে।[১]

লুটতরাজ ও মুছলা[২] করে নিহতদের চেহারা বিকৃত করা থেকেও তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি এ-ও বলতেন, সকল মুসলিমের চুক্তি একই বরাবর, সাধারণ কোন মুসলিমও কারো সাথে চুক্তি করতে পারে (অন্যদের ওপরও তা মেনে নেয়া জরুরী বলে গণ্য) তিনি বলতেন ঃ যারা চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রু তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের গাযওয়া অর্থাৎ যে সমস্ত যুদ্ধে তিনি নিজে শরীক হয়েছেন–এর সংখ্যা হলো সাতাশটি। আর সারিয়্যা অর্থাৎ যে সমস্ত যুদ্ধে তিনি নিজে শরীক হন নি, সাহাবীদের প্রেরণ করেছেন সে সবের

১. মুসলিম, সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা থেকে।
২. নিহত বা আহত শত্রুর নাক মুখ কেটে ফেলা বা তাকে টুকুরো টুকরো করা।
৩. যাদুল মা'আদ থেকে সংক্ষেপিত, ২৯২-৩২৬।

সংখ্যা হলো ষাট। এগুলোতে অবশ্য বাকায়দা যুদ্ধ হয়নি। গাযওয়া ও সারিয়্যাসমূহের নিহতদের সংখ্যা একত্র করলে দেখা যায় পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে কম রক্তপাতের কোন নজীর নেই। মুসলিম ও কাফির উভয় বাহিনী মিলে সমস্ত যুদ্ধে নিহতদের মোট সংখ্যা হলো এক হাজার আঠার জন।[১] তবে এই সামান্য রক্ত মানবতাকে যে বিপুল বেইয্যতী ও অবমাননা থেকে রক্ষা করেছে এবং মনুষ্য রক্তের অবমূল্যায়নকে রোধ করেছে—এর পরিপূর্ণ হিসাব ও মূল্যায়ন কেবল মুশকিলই নয়, বরং অসম্ভবও। এরই ফলে আরব ও এর চতুষ্পার্শে অভূতপূর্ব শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয়। ইরাকের এক প্রান্ত হীরা[২] থেকে রওয়ানা হয়ে এক মুসাফির মেয়েও মক্কার কা'বা শরীফের তওয়াফ করে আবার একাকী স্বীয় দেশে ফিরে যেত। কিন্তু এক আল্লাহ্ ছাড়া তার আর ভয়ের কেউ ছিল না।[৩]

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

আল্লাহ্র বান্দাদের মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে এক ও লা-শরীক আল্লাহ্র গোলামী ও বন্দেগীতে নিয়ে আসার, বিভিন্ন ধর্ম ও পথের যুলুম ও আদর্শবিমুখতা থেকে নাজাত দিয়ে ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেয়ার, এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে এবং নাফ্স ও প্রবৃত্তি-পূজার ক্ষুদ্র ও অপরিসর পিঞ্জর থেকে বের করে চরাচরব্যাপী গণ্ডিহীন সুপরিসরতা ও সীমাহীন এক সুব্যাপ্ত অন্তহীনতায় নিয়ে আসার মহান ও কল্যাণময় মাধ্যম হলো এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

হাদীসে আছে, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন ঃ জিহাদ আমার যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জারি থাকবে। আমার উম্মতের শেষ একটি দল দাজ্জালের সাথে আখিরী জিহাদ করবে। কোন জালিমের যুলুম ও নির্যাতন বা কোন ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসকের ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা কিছুই জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না।[৪]

একটি হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, জিহাদের কোন চিহ্ন না নিয়ে যদি কেউ মারা যায় তবে আল্লাহ্র সাথে তার এই অবস্থায় মুলাকাত হবে যে তার সারাটা শরীর থাকবে দাগভর্তি।[৫]

---

১. মাওলানা কাযী সুলায়মান মান্সূরপুরী, রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন।
২. ইরাকের প্রান্তবর্তী একটা বিখ্যাত শহর।
৩. আল্লামা সুয়ূতী, জামে কবীর, হযরত আনাস থেকে দায়লামীর বরাতে।
৪. জামে কবীর, আল্লামা সুয়ূতী, হযরত আনাস থেকে দায়লামীর বরাতে।
৫. তিরমিযী, আবূ দাউদ।

আরেকটি রিওয়ায়েতে ইরশাদ হয়েছে, যে জিহাদ না করে বা জিহাদের নিয়্যত না রেখে যদি কেউ মারা যায়, তবে মুনাফিকীর মৃত্যু হলো তার।[১]

ইসলামী নীতিমালা, আদব ও আহকাম অনুযায়ী জিহাদ করা হলে তা খুবই বরকত ও কল্যাণময় বলে গণ্য হয় এবং পৃথিবীর জন্য অপার মঙ্গল, সৌভাগ্য ও মানবতার জন্য বিপুল রহমত বয়ে নিয়ে আসে তা।[২] যেদিন থেকে মুসলিমদের মধ্যে জিহাদের চেতনা হ্রাস পেয়েছে, এই মহান ধারা হয়ে গেছে রুদ্ধ। আর জাতি বা দেশের নামে বস্তুবাদী যুদ্ধ ও বিপ্লব দখল করে নিয়েছে এর স্থান, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন বা আল্লাহ্‌র নামকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে এবং জাহিলিয়ত, তাগুতী শক্তি ও স্বার্থবাদিতার থাবা থেকে মানবতাকে মুক্ত করে অপার সৌভাগ্যমণ্ডিত করার সুমহান প্রেরণা নিয়ে যুদ্ধ করার চেতনা যেদিন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেদিন থেকে পৃথিবী জিহাদের উপকারিতা ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, সেদিন থেকে মুসলিমরা সারা পৃথিবীতে হচ্ছে লাঞ্ছিত এবং হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের মর্যাদা। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হতে দেখা গেল তখন থেকেই। হাদীসটি হলো ঃ ক্ষুধার্তরা যেমন খানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি বিভিন্ন দুশমন জাতি তোমাদের ওপর শীঘ্রই ঝাঁপিয়ে পড়বে। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা মুসলিমদের সংখ্যা কি সেই দিন খুব কম থাকবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ না, তখন সংখ্যায় তোমরা অনেক থাকবে। কিন্তু স্রোতের মুখে ফেনার মতো হয়ে পড়বে তোমরা। দুশমনদের মন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভীতি বিদূরিত করে দেবেন আর তোমাদের মনে 'ওয়াহ্‌ন' ঢেলে দেবেন। একজন প্রশ্ন করলেন, 'ওয়াহন' অর্থ কি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ দুনিয়ার মুহাব্বত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[৩]

---

১. আবূ দাউদ।

২. সীরাতে মুস্তাকীম, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ফায়দা-মাতবায়ে সালাফিয়া, লাহোর। আগস্ট ও ডিসেম্বর ১৯৮২-তে বৈরুতে মুসলিমদের যে ধ্বংসযজ্ঞ হয় তা আমাদের এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লেবাননী ফেলাঞ্জিস্ট, খ্রিস্টান ও য়াহুদীদের হাতে ফিলিস্তিনিদের ওপর যে ভয়াবহ ও নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাতে যে কোন মানুষখেকো জংলী জাতি ও হিংস্র প্রাণীদের নির্মমতাও এর সামনে লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাবে। এর বিপরীতে মুসলিম জাহানের অসহায়ত্ব, আরব দেশগুলোর অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধের অভাবও লক্ষণীয়ভাবে পীড়াদায়ক। এতে রয়েছে নিদর্শন চক্ষুষ্মানের জন্য।

৩. সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল মালাহিম।

সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَايَنْتَزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوا اِلٰى دِيْنِكُمْ -

যখন তোমাদের লেনদেন হবে সুদভিত্তিক, আর পড়ে থাকবে তোমরা গরুর লেজ আঁকড়ে, কেবল চাষবাসেই তোমরা থাকবে মগ্ন হয়ে আর জিহাদ পরিত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ্ তোমাদের এমন লাঞ্ছনার সম্মুখীন করবেন যা থেকে তোমরা মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না দীনের দিকে ফিরে এসেছ তোমরা।[১]

যুদ্ধ ও সম্মুখ সমর জিহাদের প্রধান উচ্চ শৃঙ্গ বটে, কিন্তু তা কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ্র 'কালেমা'-কে সুউচ্চ করার মানসে ও দীনকে গালিব ও বিজয়ী আদর্শ হিসাবে তুলে ধরার মানসে যে প্রচেষ্টা চালান হবে তাই আল্লাহ্র রাহে জিহাদ বলে গণ্য। হাদীসে আছে, যালিম সরকারের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

স্বীয় দীনী ভাই, দুর্বল ও অসহায় মযলুম মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা, তাদের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন একজন মুসলিমের জন্য কোনক্রমেই বৈধ নয়। পৃথিবীর কোন সুদূর কোণায়ও যদি কোন মুসলিম জনপদ কেবল মুসলিম হওয়ার অপরাধে যুলুম, নির্মমতা, অবমাননা, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও নিপীড়নের এবং নানা ধরনের পাশবিকতার শিকার হয়, তবে সামগ্রিকভাবে সারা দুনিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর কর্তব্য হলো এই অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রয়াস চালানো। অত্যাচারী নিপীড়কদের সুস্পষ্টভাবে নিজেদের ঘৃণা, অসন্তুষ্টি ও তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়ে দিতে হবে তখন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ الْحُمّٰى -

১. আবু দাউদ।

তোমরা মু'মিনদের দেখবে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহমর্মিতায় একই শরীরের মতো। কোন একটি অঙ্গও যদি ব্যথা পায় তবে অনিদ্রা ও জ্বরে সকল অঙ্গই তার সাথে ব্যথিত হতে দেখা যায়।[১]

অপর একটি হাদীসে আছে ঃ

مَنْ لَّمْ يَهْتَمَّ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ـ

মুসলিমদের অবস্থা যদি কাউকে চিন্তিত না করে তবে সে তাদের মধ্যে গণ্য নয়।[২]

১. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলা ওয়াল আদাব; বুখারী শরীফ, কিতাবুল আবাদ।

২. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান।

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংগঠন

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য

কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও আগমনের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য, সুমহান মৌলিক লক্ষ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ـ

যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদের মাঝে তোমাদের থেকে এক রাসূল। তিনি পাঠ করেন তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তোমাদের এবং শিক্ষা দেন তোমাদের কিতাব ও হিকমত, আরো শিক্ষা দেন তোমাদের তা, যা তোমরা জানতে না। [সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫১]

আরো ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ্ মু'মিনদের ওপর, তিনি পাঠিয়েছেন তাদের মাঝে একজন রাসূল তাদের নিজেদের মধ্য থেকে। তিনি পাঠ করেন তাদের কাছে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের আর শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিকমত, যদিও ছিল তারা পূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমগ্ন। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৪]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

তিনিই যিনি পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল তাদের থেকে, তিনি পাঠ করেন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিকমত, যদিও তারা ছিল পূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমগ্ন। [সূরা আল-জুম'আ ঃ ২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত এবং তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রাখে। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি আমাদেরে পরিষ্কার ব্যক্ত করে দেয়, হিকমত বলতে উচ্চ চরিত্র মাধুরী ও ইসলামী আদব-কায়দাকেই বোঝায়। কুরআন মজীদের সূরা ইসরায় ইসলামী চরিত্র ও আদবসমূহের নীতিমালা ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহের উল্লেখ করার পর 'হিকমত' শব্দ দ্বারা এই সব কিছুর পরিচিতি দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ـ

হে নবী, এই সব হচ্ছে তা যা ওয়াহী করেছেন আপনার রব আপনার কাছে হিকমত থেকে। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৩৯]

হযরত লুকমানের নৈতিক শিক্ষাসমূহের উল্লেখ করার পূর্বে ভূমিকা হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ط وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

নিশ্চয়ই আমি দান করেছিলাম লুকমানকে হিকমত, তুমি শোকর কর আল্লাহ্‌র। আর যে শোকর করে সে তো শোকর করে নিজের জন্যই। আর যে কুফরী করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো বেনিয়ায ও প্রশংসিত। [সূরা লুকমান ঃ ১২]

অনুগৃহীত জনকে খোটা না দিয়ে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করা, অভাব ও দারিদ্র্যকে ভয় না করা এবং আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও ভরসা রাখা সম্পর্কে নির্দেশ দেবার পরপরই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ج وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ط وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

তিনি হিকমত দান করেন যাকে চান। আর যাকে দান করা হয়েছে হিকমত তাকে তো দান করা হয়েছে প্রভূত কল্যাণ। উপদেশ গ্রহণ করে না কেউ, জ্ঞানীরা ছাড়া। [সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাঁকে প্রেরণের সুমহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাকীদের সাথে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ -

মাকারিমে আখলাক বা সুমহান নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের নিমিত্তই আমি প্রেরিত হয়েছি।[১]

তিনি নিজেও ছিলেন সচ্চরিত্রতার সর্বোত্তম আদর্শ এবং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ উস্‌ওয়া। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

হে নবী ! নিশ্চয়ই আপনি আছেন সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

(সূরা আল-কলম ঃ ৪)

হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ -

কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।[২]

আত্মসংশোধন ও হিকমত অর্জন হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংসর্গ ও বরকতময় সাহচর্যের ফলশ্রুতি। তাঁরই মেহেরবানীর ছায়ায়, তাঁরই সুমহান সাহচর্যে এমন এক জাতি ও এমন এক গোষ্ঠীর উত্থান ও বিকাশ ঘটে যাঁরা ছিলেন উচ্চ চরিত্র-মাধুরী ও সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত; আর মন্দ স্বভাব ও মন্দ আচরণ, ঘৃণ্য বদ গুণাবলী, নফসের ফিত্‌না ও দুষ্টামী, জাহিলী প্রভাব ও শয়তানের ধোঁকার শিকার হওয়া থেকে ছিলেন রক্ষাপ্রাপ্ত। কুরআন মজীদ তাঁদের আদর্শিক দৃঢ়তা, সততা, মহান চরিত্র-মাধুরী ও আত্মশুদ্ধির সুউচ্চ মর্যাদার অভিষিক্ততার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ط لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ

১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক ; ইব্‌ন আব্‌দিল বার্‌র বলেন ঃ হাদীসটি মুত্তাসিল ও সহীহ্। হযরত আবূ হুরায়রা ও অন্য আরো কতিপয় সাহাবীর বরাতে এটি বর্ণিত। হযরত ইমাম আহমদ সংকলিত মুসনাদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে مكارم الاخلاق স্থলে صالح الاخلاق (নেক চরিত্র) শব্দে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

২. মুসলিম শরীফ।

اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط اُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ ـ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

জেনে রাখ, নিশ্চয়ই রয়েছেন তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন তবে তোমরাই পড়বে কষ্টে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমান, আর তা সুশোভিত করেছেন তোমাদের অন্তরে। অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, পাপকর্ম ও অবাধ্য আচরণ। এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সুপ্রাজ্ঞ। [সূরা আল-হুজুরাত ঃ ৭-৮]

নববী ভাষায়ও দেয়া হয়েছে এর সাক্ষ্য। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ـ

আমার যুগের লোকেরা হলো সবচেয়ে ভাল লোক।[১]

অত্যন্ত সৌকর্যময় ভাষায় সাহাবীদের পরিচিতি দিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ইব্‌ন মাস'ঊদ। সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ভাষায় তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

اَبَرُّ النَّاسِ قُلُوْبًا، وَاَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، وَاَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا ـ

হৃদয় তাঁদের পবিত্র, জ্ঞান তাঁদের সুগভীর আর তাঁরা ছিলেন লৌকিকতা ও ভণিতা থেকে মুক্ত।

তাঁরা ছিলেন ইসলামের বাসন্তী মওসুম, মানুষ গড়ার নবুবী নমুনা, নবুবী তরবিয়্যাত ও পরিশুদ্ধিতার অলৌকিক নিদর্শন।

মানুষ গড়ার এক সার্বক্ষণিক কারখানা

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন আর নববী সাহচর্যের বরকতময় ধারা যখন গেল ছিন্ন হয়ে, তখন থেকে কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ ও সীরাত পাক এই স্থান পূরণ করে এসেছে। রূহানী বিজ্ঞান ও হিকমত মানুষের মনের রোগ-ব্যাধি ও নফসের দুষ্টামী ও শয়তানের চক্রান্তের শিকার হওয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক চিকিৎসালয় ও বিশ্বহাসপাতাল হিসাবে কাজ করে আসছে।

১. বুখারী।

কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কার্যকরণের প্রভাবে ও যুগের বিবর্তনে হাদীসের নৈতিক প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধিকরণ দিকটিও এর বুনিয়াদী পঠন-পাঠন পদ্ধতি, ব্যাখ্যাকরণ ও পাঠ দান পদ্ধতি ম্লান হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে এমন সব রীতি ও পদ্ধতি ক্রমশ প্রবলতর হয়ে ওঠে যা ছিল সমকালীন সমাজের জন্য অধিকতর আকর্ষণীয়, মানুষের কাছে বেশি মর্যাদা প্রাপ্তির মাধ্যম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ ও স্থান লাভের পক্ষে সহায়ক। হাদীসের ব্যাখ্যা ও পাঠ দান নিজ নিজ মাযহাব প্রতিষ্ঠাকরণ এবং এর পক্ষে দলীল সরবরাহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে আর সীরাত আলোচনা হয়ে পড়ে ইতিহাস ও একাডেমিক আলোচনা-পর্যালোচনার চৌহদ্দীতে রুদ্ধ।

তবুও, এই সব কিছুর পরও কুরআন মজীদের পরে হাদীস ও সীরাত আলোচনাই মূলত চরিত্র গঠন, আত্মার পরিশুদ্ধি, মনের জং ধরা ময়লা বিদূরিত করার ও মানব হৃদয়ের আয়নাটিকে ঝকঝকে করে তোলার সবচেয়ে কার্যকরী ও সহজ মাধ্যম।

এই বিষয়ে হাদীসে যে সমস্ত তথ্য ও উপকরণ পাওয়া যায় তা দু'ধরনের। এক ধরনের হচ্ছে সেগুলো, যেগুলোর সম্পর্ক হলো বিভিন্ন ইবাদত ও আমল, এগুলোর বিভিন্ন রূপ ও কাঠামো, দৃষ্টি ও স্পর্শগ্রাহ্য বিধি-বিধান। যেমন কিয়াম, রুকূ', সিজদা, তিলাওয়াত-তাসবীহ, দু'আ, যিকির-আযকার, দাওয়াত-তাবলীগ, জিহাদ-যুদ্ধ ও সন্ধি উভয় বেলায় মিত্র ও শত্রুর সাথে ব্যবহার ও আচরণবিধি এবং অন্যান্য হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসাইলের সাথে। দ্বিতীয় ধরনের হাদীসসমূহ হচ্ছে সেগুলো যেগুলো এই সমস্ত ইবাদত ও আমল আদায়কালে সংঘটিত মানসিক ও অভ্যন্তরীণ ভাব ও অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আসলে ইবাদত ও বিধি-বিধানসমূহের মূল উদ্দেশ্য ও বুনিয়াদী লক্ষ্য এ-ই। এই বাতিনী কৈফিয়তসমূহকে আমরা অভিহিত করতে পারি ইখলাস ও আন্তরিকতা, ইহ্তিসাব ও পুণ্য কামনা, সবর ও ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্র ওপর ভরসা, যুদ্ধ ও জাগতিক মোহমুক্তিতা, ইস্তিগনা ও অনাপেক্ষতা, ঈছার ও আত্মত্যাগ, সাখাওয়াত ও বদান্যতা, আদব-কায়দা ও লজ্জাশীলতা, খুযু ও বিনয়নম্রতা, ইনাবত ও তাযাররু বা আল্লাহমুখিতা ও কাতরতা, দু'আর সময় মনের আকুল মিনতি, দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দান, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, তাঁর দীদার লাভের আকুলতা, স্বভাবের প্রান্তিকতাহীনতা, রুচির সুস্থতা, সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুকম্পা, দুর্বলদের প্রতি সহমর্মিতা, উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা, আবেগ ও প্রেরণার পবিত্রতা, দানশীলতা, সহনশীলতা, বিনয় ও নিরহংকার, শৌর্য-বীর্য,

আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালবাসা বা কারো প্রতি শত্রুতা, সততা, ভদ্রতা ও মানবতার খুঁটিনাটি ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতিও দৃষ্টি রাখা, মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা প্রদর্শন, সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, উপেক্ষাকারীর সাথেও দাক্ষিণ্যের ব্যবহার প্রদর্শন ইত্যাদি। এছাড়া আরো বহু বাতিনী ও অভ্যন্তরীণ ভাব ও অবস্থা রয়েছে যেগুলো বাস্তব নমুনা ও উদাহরণ ব্যতীত বোঝা মুশকিল। প্রত্যক্ষ দর্শন বা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত দলপরম্পরা আগত সংবাদ–খবরে মুতাওয়াতির ব্যতিরেকে যেগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপনও সম্ভব নয়।

যে সমস্ত সত্য ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে কাছের, নবীজীর পারিবারিক ও সামাজিক, ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত, ভেতর ও বাইরের—সব ধরনের অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা ছিলেন সমধিক অবহিত, মানুষের মন-মানসিকতা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহের ওপর ছিল যাঁদের গভীর ও প্রাজ্ঞ দৃষ্টি সেই সাহাবীগণের জামা'আত কর্তৃক বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সর্বব্যাপক সুমহান চরিত্র-মাধুরী ও গুণাবলী সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। এরপর তাঁর শামাইল বা আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কেও কিছু উল্লেখের আশা রাখি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুমহান ও সর্বব্যাপক গুণাবলী

নিম্নে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সর্বোত্তম আকৃতি ও সুমহান চরিত্র সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর মামা হযরত হিন্দ ইব্‌ন আবী হালা থেকে একটি এবং হযরত আলী (রা) থেকে আরেকটি সাক্ষ্য পেশ করতে চাই, আর এই বিষয়ে এতটুকু বিবরণই যথেষ্ট হবে বলে আমরা মনে করি।

হিন্দ ইব্‌ন আবী হালা বলেন ঃ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিরবধি আখিরাতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। কোন সময় তা ছিন্ন হতো না তাঁর। অধিকাংশ সময়ই তিনি চুপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে তিনি কথা বলতেন না। কথা বলার সময় প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন তিনি। কথাবার্তা ও ভাষণ খুবই স্পষ্ট, অত্যন্ত পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন হতো তাঁর ঃ অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘও হতো না তা, আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও হতো না। তিনি কোমল ও নরম স্বভাবের

ছিলেন। কথাবার্তাও অত্যন্ত কোমল ছিল তাঁর। কঠোর ভাষী ও মরুওয়াতশূন্য ছিলেন না তিনি। কাউকে তিনি লজ্জা দিতেন না বা অপমানিত করতেন না, তেমনিভাবে নিজেকেও অপমানিত হতে দিতেন না। আল্লাহ্‌র নিয়ামতের অত্যন্ত কদর করতেন, এর মর্যাদা দিতেন। পরিমাণে যত কমই হোক না কেন, তিনি তা-ই অনেক বেশি বলে মনে করতেন, এর কোন দোষ বর্ণনা করতেন না। খাদ্য জাতীয় বস্তুর মন্দও বলতেন না, প্রশংসাও করতেন না। দুনিয়া বা জাগতিক কোন বিষয়ে তিনি কখনও রাগ করতেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন হক নষ্ট হতে দেখলে তিনি এত রাগ করতেন যে, তখন তাঁর জালাল ও পরাক্রমতার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না। এর বদলা নিয়ে নিতেন তিনি। নিজের জন্য কখনও তাঁর ক্রোধ দেখা যায়নি বা নিজের জন্য তিনি কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। কোন কিছুর প্রতি ইশারা করলে পরিপূর্ণভাবে করতেন। কথা বলার সময় বা ভাষণ দেয়ার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের বুড়া আঙ্গুলের সাথে মেলাতেন। রাগের বা অপছন্দনীয় কোন কথা বা বিষয় হলে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিতেন এবং পুরাপুরি এটিকে উপেক্ষা করতেন। আনন্দিত হলে দৃষ্টি লুকিয়ে ফেলতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মুচকি হাসতেন। এতে শিশিরের ন্যায় ঝকঝকে সুন্দর পরিপাটি দান্দান মুবারক ভেসে উঠত।"

রাসূল (সা) সম্পর্কে জানার অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন হযরত 'আলী (রা)। তিনি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতমদের অন্যতম। সাথে সাথে দৃশ্য নির্মাণ ও বর্ণনা-নৈপুণ্যও ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি হযরত রাসূল (সা)-এর চরিত্র ও গুণাবলীর দৃশ্য আঁকতে যেয়ে বলতেন ঃ

"প্রকৃতিগতভাবেই তিনি লজ্জাকর, অশ্লীল কাজ ও খারাপ কথন থেকে দূরে থাকতেন। ভণিতা করেও, এমন কি জোর করেও তিনি এই ধরনের আচরণ বা কথা বলতে পারতেন না। হাটে-বাজারে তিনি আওয়াজ উঁচু করেন নি কখনও। মন্দের বদলে মন্দ করতেন না, বরং হামেশা তিনি ক্ষমা ও সহনশীলতার মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। জিহাদের ময়দান ছাড়া তিনি কারো ওপর হাত তোলেন নি কখনও। ঘরের খাদিম বা মেয়েদের ওপরও তিনি কোনদিন হাত ওঠান নি। আল্লাহ্‌র কোন বিধি বা নির্ধারিত সীমার বিরোধিতা কেউ না করলে কেবল নিজের জন্য তিনি কখনও প্রতিশোধ নেন নি। তবে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ধ্বংস হতে দেখলে এবং শরীয়তের সম্ভ্রমের ওপর হাত পড়তে দেখলে তিনিই সবচে' বেশি ক্রোধান্বিত হতেন। দুটো বিষয়ের একটি গ্রহণ করতে বলা হলে সব

সময় তিনি সহজটিকেই বেছে নিতেন। বাড়ির ভেতর তশরীফ নিয়ে গেলে অপরাপর গৃহী লোকদের মতো মনে হতো তাঁকে। নিজেই নিজের কাপড় ধুতেন, বকরীর দুধ দোহাতেন এবং নিজের কাজ নিজের হাতেই আঞ্জাম দিতেন।

"প্রয়োজন ছাড়া তিনি মুখ খুলতেন না। মানুষের মন রক্ষা করতেন, তাদের বিতৃষ্ণ করতেন না। কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখাতেন এবং ভাল আসনে তাকে অভিষিক্ত করতেন। কারো সম্পর্কে তিনি খুবই সতর্ক মন্তব্য করতেন। সকল সাহাবী ও সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। অপরাপরদের সম্পর্কে তিনি খবরাখবর ও জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

"ভাল কথা ও কাজকে ভাল বলে তিনি ঘোষণা দিতেন এবং একে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করতেন। মন্দ কথা ও মন্দ কাজের খারাবী তুলে ধরতেন এবং এটিকে দুর্বল ও বিদূরিত করার প্রয়াস নিতেন। তাঁর ব্যবহার ছিল এক বরাবর ও ভারসাম্যপূর্ণ। এর ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন হতো না কখনও। তিনি কারো কথার প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করতেন না, যেন অন্যে অমনোযোগিতা বা বিরক্তি প্রকাশ না করে। প্রতিটি অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী আবশ্যক উপকরণাদি তাঁর ছিল। হক ও সত্যের ব্যাপারে তিনি কখনও অলসতা বা ত্রুটি প্রদর্শন করতেন না এবং এ নিয়ে কোনরূপ বাড়াবাড়িও করতেন না। তাঁর নিকট যাঁরা থাকতেন তাঁরা ছিলেন উত্তম ও মনোনীত সত্তা। মানুষের শুভ কামনা ও নৈতিকতায় যাঁরা ভাল হতেন তাঁরাই হতেন অধিক মর্যাদার অধিকারী। মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও পরোপকারের ক্ষেত্রে যাঁরা যত অগ্রগামী হতেন, তাঁরা তত বেশি তাঁর নিকট আদরণীয় ও সম্মানের অধিকারী হতেন। আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তিনি দাঁড়াতেন আর আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তিনি বসতেন। কোথাও গেলে মানুষের বসা যেখানে শেষ হতো সেখানেই তিনি বসে যেতেন এবং অন্যদেরও এর নির্দেশ দিতেন। উপস্থিত সকলের প্রতি তিনি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতেন। প্রত্যেকেই মনে করত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কেউ বুঝি নেই। কেউ যদি তাঁকে নিজের প্রয়োজনে আলাপ করতে বসত তবে তিনি সম্পূর্ণ ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে তার পুরা কথা শুনতেন। যতক্ষণ না সে নিজেই তার কথা শেষ করে চলে যেত, ততক্ষণ তিনি নিজে থেকে সরতেন না। যদি কেউ তাঁর কাছে কিছু যাচ্ঞা করত বা সাহায্য চাইত তবে তিনি ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন না মিটিয়ে চলে আসতেন না। কিছু না হলে অন্তত মিষ্টি ভাষায় তাকে তিনি বুঝিয়ে দিতেন।

তাঁর সদ্ব্যবহার ছিল সকলের জন্যে সাধারণ। তিনি ছিলেন সকলের পিতৃতুল্য। সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে সকলে ছিল তাঁর কাছে সমান।

"তাঁর দরবার ছিল ইল্‌ম ও আখিরাত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, লজ্জা-শরম, ধৈর্য ও আমানতদারীর সমন্বিত প্রতীক। শোরগোল করত না কেউ সেখানে, কারো দোষ বর্ণনা করা হতো না, আর না কারো সম্পর্কে আঘাত করে কথা বলা হতো। কারো দুর্বলতা প্রচার করা হতো না। সকলেই ছিল এক সমান। কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে সেখানে মর্যাদা নির্ধারণ করা হতো। বড়দের প্রতি করা হতো সম্মান এবং ছোটদের করা হতো স্নেহ। অভাবীকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়া হতো। মুসাফির ও আগন্তুক পথিকদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হতো এবং তাদের হিফাযত করা হতো। সব সময় তিনি আনন্দিত ও হাসিমুখ থাকতেন। উদার ও খোলা মনে মিশতেন সবার সাথে। তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই নরম ও কোমল। সম্ভ্রমপূর্ণ অথচ বিনয়ী অবস্থা ছিল তাঁর। কঠোর ব্যবহার ও রুক্ষ কথা বলার অভ্যাস ছিল না তাঁর। বিকট আওয়াজে তিনি কথা বলতেন না। গেঁয়ো ও নীচু ধরনের কথা তিনি বলতেন না। কারো দোষ দিতেন না তিনি। তিনি ছিলেন না সংকীর্ণ হৃদয় ও কৃপণ। কোন কথা পছন্দ না হলে তা উপেক্ষা করতেন, ধরতেন না তা; পরিষ্কার নিরাশ করতেন না, বরং কোনরূপ জবাব দিতেন না তাকে। এই তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে তিনি বিলকুল বাঁচিয়ে চলতেন—ঝগড়াঝাটি, অহংকার আর বেহুদা কাজকর্ম ও কথাবার্তা। অপর মানুষদেরকেও তিনি এই তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রাখতেন।

"কারো মন্দ বলতেন না, কারো প্রতি দোষ আরোপও করতেন না এবং কারো দুর্বলতা ও গোপন বিষয়ের পেছনেও পড়তেন না। যে কথায় সওয়াবের আশা করা যায় কেবল সেই ধরনের কথাই বলতেন তিনি। যখন কথা বলতেন তখন উপস্থিত সাহাবীরা আদবের খাতিরে এমনভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে স্থির হয়ে বসতেন যে, মনে হতো তাঁদের মাথায় যেন পাখি বসে রয়েছে। তিনি কথা বলে চুপ করার পর তাঁরা কথা বলতেন। তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবীরা কখনও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতেন না। কোন একজন যদি কথা বলতেন তবে বাকিরা চুপ করে তা শেষ না করা পর্যন্ত শুনতেন। প্রথম জন যেমন কথা বলার পূর্ণ সুযোগ পেতেন, তেমনি সকলেই তা পেতেন। সকলেরই স্থান ও মর্যাদা ছিল এক। সকলে যে কথা বলে হাসতেন তিনিও তাতে হাসতেন। অন্যরা যে কথায় বিস্ময় প্রকাশ করতেন, তিনিও তাতে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। আগন্তুক, পথিক বা পরদেশী মুসাফিরদের সকল ধরনের বেআদবী সহ্য করতেন এবং তাদের সকল

ধরনের প্রশ্ন একান্ত ধৈর্যের সাথে স্থির হয়ে শুনতেন। শেষে অন্য সাহাবীরা এসে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতেন একে। তিনি বলতেন ঃ কাউকে যদি অভাবে বা অসুবিধায় দেখ তবে তার সাহায্য করো। বাড়াবাড়ি না করে যদি কেউ প্রশংসা করত তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন। কারো কথার মাঝে তিনি কথা বলতেন না এবং কারো কথা কেটে দিতেন না। তবে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করলে তাকে নিষেধ করে দিতেন বা নিজেই মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উদার ও বিশাল মনের অধিকারী। সত্যবাদিতা, কোমল স্বভাব, ব্যবহার ও সামাজিকতায় ছিলেন সুভদ্র ও অতিশয় অনুগ্রহশীল। প্রথমবার যে তাঁকে দেখত সে সম্ভ্রমজনিত ভয়ে ভীত থাকত। কিন্তু যত দিন অতিবাহিত হতো, তাঁর সাথে যতই চেনা-জানা বাড়ত ততই সে আরো অনুরক্ত, আরো পাগলপারা হয়ে উঠত তাঁর। তাঁর কথা বলতে যেয়ে সকলকেই বলতে হতো ঃ তাঁর পূর্বেও কাউকে এমন দেখেনি, আর না তাঁর পর এমন কাউকে দেখেছি। সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম।"[১]

এক নজরে রাসূল (সা)-এর সুমহান চরিত্র-মাধুরী

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ, উদার, খোলা মন ও কোমল স্বভাবের ছিলেন তিনি। বংশের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা মর্যাদার অধিকারী। সাহাবীগণের থেকে তিনি নিজেকে আলাদা করে রাখতেন না। সবার সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে থাকতেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয়েও আলাপ-সালাপ করতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের সাথে হাসি-খুশি, এমন কি রসিকতা-তামাশাও করতেন তিনি। শিশুদের আদর করে নিজের কোলে এনে বসাতেন। গোলাম, বাঁদী, স্বাধীন, দরিদ্র ও মিসকীন সকলের দাওয়াত তিনি কবূল করতেন। মদীনার এক প্রান্তে বসবাসকারী কোন অসুস্থ ব্যক্তির কথা শুনলে তিনি তাঁরও খোঁজ-খবর নিতে যেতেন, তার সেবা-যত্ন করতে যেতেন। তিনি মানুষের ওযর কবূল করতেন।[২] সাহাবীগণের মজলিসে কখনও পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি তাঁকে যেন এতে কারো কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

সাহাবীগণ একে অন্যজনের কবিতা শুনতেন, নিজেও অন্যজনকে তা শোনাতেন। কোন কোন সময় জাহিলী অবস্থার কথাও তাঁদের মাঝে আলোচিত হতো। তিনি তখন চুপ থাকতেন এবং মাঝে মাঝে মুচকি হাসতেন। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন, আর দয়া ও করুণার ছিলেন প্রতিমূর্তি।

১. শামাইল তিরমিযী।

২. আনাস ইবন মালিকের বরাতে আল-হিলয়া লি আবী নুআয়ম।

প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলতেন ঃ ছেলেরা কোথায়? ডেকে আন ওদের। হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা) দৌড়ে আসতেন। উভয়কে তিনি আদর-সোহাগে ভরে তুলতেন। বুকে সাপটে ধরতেন।[১] একবার তাঁর এক দৌহিত্রীকে কোলে নিলেন তিনি। ঐ সময় সেই মেয়েটির শেষ অবস্থা ছিল। এ দেখে হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছিল তখন। সঙ্গী সাহাবী হযরত সা'দ আশ্চর্য হয়ে বললেন, হযরত, এ কি? আপনিও কাঁদছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ এ হলো স্নেহ ও দয়া, আল্লাহ্ যাকে চান সেই বান্দার হৃদয়ে তা ঢেলে দেন। আর আল্লাহ্ রহমদিল ও দয়ার্দ্র বান্দাদেরই তো দয়া করে থাকেন।[২]

বদরের যুদ্ধে বন্দী কাফিরদের মধ্যে চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। রাত্রে যখন তিনি তাঁর আহাজারি শুনলেন তখন আর স্থির থাকতে পারেন নি। সারা রাত ঘুম আসেনি তাঁর। আন্‌সার সাহাবীরা এই কথা শুনে হযরত আব্বাসের বাঁধন ঢিলা করে দেন এবং হযরত আব্বাসের মুক্তিপণও রহিত করে দিতে তাঁরা ইচ্ছা করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুক্তিপণ ক্ষমা করার অনুমতি দেন নি।

মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন তিনি। তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি খুব খেয়াল করতেন তিনি। সাধারণত মানুষ যেসব বিরক্তি বা ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে বা অনেক সময় মন বসে পড়ে এই সবের দিকেও তিনি খুব দৃষ্টি রাখতেন এবং এই সব অবস্থার রেআয়াত করতেন। কেউ যেন বিরক্তির শিকার না হয়, সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে ওয়াজ-নসীহত করতেন। শিশুর কান্না কানে গেলে সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। বলতেন ঃ আমি সালাতে যখন দাঁড়াই, ইচ্ছা করি লম্বা সালাত পড়তে, কিন্তু শিশুদের কান্না কানে আসলেই এই আশংকায় সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিই, শিশুটির মার যেন কোনরূপ অসুবিধা না হয়। তিনি বলতেনঃ তোমরা আমার কাছে অন্য কারো অভিযোগ নিয়ে আসবে না। কারণ আমি তোমাদের সকলের সামনে এমনভাবে আসতে চাই যেন প্রত্যেকের প্রতিই আমার মন পরিষ্কার থাকে। মুসলিমদের জন্য তিনি স্নেহশীল পিতার মতো ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ কেউ সম্পত্তি রেখে গেলে তা তার ওয়ারিছদের আর ঋণ রেখে গেলে তা আমার যিম্মায়।

তিনি সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত থাকতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যদি কখনও দুটো কাজের একটি গ্রহণ করতে বলা হতো তবে তিনি হামেশা সহজটিকেই গ্রহণ করতেন

১. তিরমিযী শরীফ, বাবু মানকিবিল হাসান ওয়াল হুসায়ন।
২. বুখারী শরীফ, বাবু 'ইয়াদাতিস্ সিবইয়ান।

যদি না এতে গুনাহের কোন সম্পর্ক থাকত। গুনাহ্‌র বিন্দুমাত্র গন্ধও যদি থাকত তবে এ থেকে যোজন দূরে অবস্থান করতেন তিনি। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্ চান বান্দার মধ্যে তাঁর নিয়ামতের আছর দেখতে।

ঘরের মধ্যে তিনি সাধারণ মানুষের মতোই থাকতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজের কাপড় নিজেই ধুতেন, নিজেই বকরীর দুধ দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন। কাপড়ে নিজেই তালি লাগাতেন। নিজেই জুতা সেলাই করতেন। একবার হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘরের ভেতর কেমনভাবে থাকতেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ তিনি ঘরের কামে-কাজেই থাকতেন, সালাতের সময় হলে এর জন্য বের হয়ে চলে যেতেন।

তিনি আরো বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি নরম এবং সবচেয়ে বেশি দয়ালু। পরিবারের লোকদের সাথে তিনি স্ফূর্তি-তামাশা করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর মতো পরিবার-পরিজনদের প্রতি এত অধিক স্নেহবৎসল ও দয়ার্দ্র আর কাউকে আমি দেখিনি।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পরিবার-পরিজনদের বিষয়ে যে ব্যক্তি উত্তম, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিকতর উত্তম। পরিবার-পরিজনদের বিষয়ে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেন নি। মনে চাইলে খেতেন, ভাল না লাগলে রেখে দিতেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি দশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের খাদিম হিসাবে থেকেছি। তিনি কোনদিন আমাকে বিরক্তিসূচক 'হুঁ' পর্যন্ত বলেন নি। কখনও বলেন নি ঃ এ কাজটি এভাবে কেন করেছ? সে কাজটি কেন করলে না?

তাঁকে আসতে দেখলে সাহাবীগণ কখনও দাঁড়াতেন না। কেননা তিনি তা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন ঃ খ্রিস্টানরা হযরত 'ঈসার প্রশংসা করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমার গুণ ও প্রশংসা করতে গিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করবে না। আমি তো আল্লাহ্‌র এক দাস মাত্র। তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও দাস হিসাবেই বলবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ মদীনার একটা সামান্য দাসীও তাঁকে ধরে যা বলার বলতে পারত, নিজের প্রয়োজনে যতদূর ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলে তিনি তাঁকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বসার জন্য তাকিয়া পেশ করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তা আদী ও তাঁর মাঝে রেখে দিলেন এবং নিজে মেঝেয় বসে পড়লেন। হযরত আদী বলেন ঃ এতে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি বাদশাহ নন। একবার তাঁকে দেখে একজন ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন ঃ ভয় পেয়ো না। আমি কোন বাদশাহ নই। আমি কুরায়শেরই এক মহিলার সন্তান, শুকনো গোশ্‌ত ছিল যার খাদ্য।[১]

তিনি নিজেই ঘর ঝাড়ু দিতেন, উট বাঁধতেন, এটিকে ঘাস-বিচালি দিতেন। ঘরে বাঁদীর সাথেও আহার করতে ঘৃণা বোধ করতেন না। আটা খামীর করতে তিনি সাহায্য করতেন। বাজার থেকে নিজেই জিনিসপত্র কিনে আনতেন।

কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কাজ করছে বলে জানতে পারতেন তবে সরাসরি বলতেন না যে, অমুক লোক অমুক কাজ কেন করছে, বরং বলতেন ঃ লোকদের কি হলো, এমন কাজ তাদের থেকে হচ্ছে বা এই ধরনের ব্যাপকভিত্তিক নসীহত করতেন এবং নাম উল্লেখ না করেও তাকে সেই কাজ থেকে বিরত করতেন। দুর্বল, অসহায় প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর প্রতিও তাঁর ছিল অসাধারণ মমত্ববোধ। এগুলোর সাথেও কোমল ও ভাল ব্যবহার করতে তিনি সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন ঃ প্রতিটি বস্তুর সাথে কোমল ও সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের। সুতরাং কতল বা যবেহ করার সময় সহজ ও সুন্দরভাবে কর। কোন প্রাণীকে যবেহ করার পূর্বে ভাল করে ছুরি ধার করে নেবে এবং প্রাণীটিকে আরামে যবেহ হতে দেবে।

আরো ইরশাদ করেন ঃ বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আরোহণ যখন করবে ভালভাবে কর। যখন খাবে তখনও ভাল অবস্থায় খাবে।

মজুর, চাকর ও গোলামদের সাথে তিনি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেনঃ যা নিজেরা খাও তা-ই তাদের খাওয়াও। যা নিজেরা পর তা-ই তাদের পরাও। আল্লাহ্‌র মখলূককে কষ্ট দিও না। যাদের আল্লাহ্‌ তোমাদের অধীনস্থ করেছেন তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের সাহায্যকারী। সুতরাং যার অধীনে

১. ইবন মাজা শরীফ, কিতাবুল আমওয়াল।

তার ভাই আছে সে যেন তাকে তা-ই আহার করায় যা সে নিজে আহার করে, তা-ই যেন পরায় যা সে নিজে পরে। তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিও না। যদি এমন কাজ করাতেই হয় তবে নিজে তাকে সাহায্য কর।

এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ আমি আমার অধীনস্থদের, চাকর-বাকরদের দিনে কতবার ক্ষমা করব? তিনি বললেন ঃ সত্তরবার হলেও ক্ষমা করবে। আরো ইরশাদ করেন ঃ ঘাম শুকানোর পূর্বেই মজুরের মজুরি দিয়ে দাও।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শামাইল বা সুন্দরতম আকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতি

অনাদিকাল থেকেই মানুষের স্বভাব হলো, সে তার প্রিয় ও ভালবাসার জনের, তার শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির সেই সব অভ্যাস ও আচার-আচরণকেও গ্রহণ করার প্রয়াস পায়, শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে যেগুলো পালন করা তার জন্য আবশ্যক নয়। ভালবাসার রীতিনীতি সব থেকে আলাদা। সত্যিকার প্রেমিক সব সময় চায় প্রিয়তমের আদত-অভ্যাস ও তাঁর প্রিয় বস্তুসমূহ এবং এর বিপরীতে প্রিয়তমের নিকট অপছন্দনীয় অভ্যাস, রীতিনীতি ও অপ্রিয় বস্তুসমূহ সম্পর্কে জানতে। প্রিয়তমের ওঠাবসা, চালচলন, লেবাস-পোশাক ও সেইসব বিষয় সম্পর্কেও সে ওয়াকিফহাল হতে চায় যেগুলোর সম্পর্ক কেবল আইনের নয়। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ওলামায়ে কিরাম শুরুর যুগ থেকে শামাইলে নবী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্বভাব ও গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কেও বিরাট বিরাট সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখনও এই রচনা-ধারা বিদ্যমান। এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থ ও রচনাসমূহের মাঝে ইমাম তিরমিযী রচিত শামাইল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে।[২] নিম্নে উক্ত কিতাবটি থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শামাইল বা আকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, মনে হতো ওপর থেকে নিচের দিকে বুঝি নামছেন। কারো দিকে ফিরলে চেহারা পুরোপুরি ঘুরিয়ে ফিরতেন। সাধারণত তাঁর দৃষ্টি থাকত নিচের দিকে। আকাশের

১. প্রখ্যাত মুফাসসির, ঐতিহাসিক, জীবনীকার আল্লামা ইব্ন কাসীর এ বিষয়ে 'শামাইলুর রাসূল' নামেও একটা স্বতন্ত্র পুস্তক সংকলন করেছেন।

২. নবী-ই-রাহমত ২ ঃ ১৭৪-২-৯-এর সংক্ষিপ্তসার। সিহাহ্ সিত্তা, সুনান গ্রন্থসমূহ থেকে এই সমস্ত হাদীস গৃহীত। নবী-ই-রহমতের সমস্ত বরাত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতি অপেক্ষা মাটির দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি থাকত। সাধারণত চোখের কিনারায় তাকানোর অভ্যাস ছিল তাঁর। একত্রে চলার সময় সঙ্গী-সাহাবীদের সামনে দিয়ে নিজে নিজে হাঁটতেন তিনি। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নিজেই আগে সালাম দিতেন। কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল তাঁর। কানের লতি থেকে কিছুটা বেশি আর কাঁধ পর্যন্তের চেয়ে কম লম্বাও হতো তাঁর চুল। মাথার মাঝামাঝি সিঁথি কাটতেন তিনি। মাথায় তিনি অনেক তেল ব্যবহার করতেন। দাঁড়িও খুব আঁচড়াতেন তিনি। ওযূ বা চিরুণী করা বা জুতা পরা ইত্যাদির সময় ডান দিক থেকে তিনি শুরু করতেন। একটি সুরমাদানী ছিল তাঁর। প্রতি রাত্রে একেক চক্ষে তিনবার করে তিনি সুরমা লাগাতেন। পোশাকের মধ্যে কোর্তা পরতে ভালবাসতেন তিনি। নয়া কাপড় পরার সময় আগে এর নাম নিতেন যেমন বলতেন, আল্লাহ্ আমাকে এই কোর্তাটি, এই পাগড়িটি বা এই চাদরটি মেহেরবানী করে দিয়েছেন। এরপর এই দু'আটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَمَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ۔

হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমারই, আমাকে এই কাপড়টি পরিয়েছ তুমি। তোমার কাছে যাচ্ঞা করি এর মঙ্গল এবং এটি যেজন্য বানানো হয়েছে তার মঙ্গল, আর পানাহ চাই তোমার কাছে এর অমঙ্গল থেকে এবং এটি যেজন্য বানানো হয়েছে এর অমঙ্গল থেকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ তোমরা সাদা রং গ্রহণ কর। বেঁচে থাকতেও তা পরা উচিত, আর মৃতকেও এতে কাফন দেয়া উচিত। সাদা কাপড় সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়ের মধ্যে গণ্য।

হাবশার সম্রাট নাজাশী তাঁর খেদমতে দুটো কালো মোজা হাদিয়া হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা পরে মসেহও করেছিলেন। তিনি বলতেন ঃ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না। হয়ত উভয় পায়ে পরে হাঁটবে, নয়ত উভয় পা খালি রেখে হাঁটবে। বাম হাতে আহার করতে এবং এক পায়ে জুতা পরে চলাফেলা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পা দেবে আর খোলার সময় বাম পা আগে খুলবে। ডান হাতে তিনি আংটি পরেছেন। তাঁর একটি আংটি ছিল। এতে এক লাইনে মুহাম্মদ, অপর লাইনে রাসূল ও ওপরের লাইনে আল্লাহ্ শব্দ অংকিত ছিল। ইস্তিনজাখানায় যাওয়ার সময় তিনি এটি খুলে রাখতেন।

মক্কা বিজয়কালে মক্কা নগরীতে প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল। পাগড়ী বাঁধার সময় দুই কাঁধের মাঝে শামলা ছেড়ে রাখতেন। হযরত উবায়দ ইবনে খালিদ আল-মুহারিবী বলেন ঃ আমি মদীনার পথ দিয়ে একবার হাঁটছিলাম। পেছন দিয়ে একজনকে বলতে শুনলাম, লুঙ্গী ওপরে তুলে পর। পেছনে ফিরে দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম। বললাম ঃ হযরত! এ তো মামুলী একটা কাপড় (এতে অহঙ্কার সৃষ্টি হওয়ার তো কিছুই নেই)। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আমি কি তোমার জন্য আদর্শ নই? তখন তাঁর লুঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখলাম, পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত মাত্র ঝুলিয়ে তা পরেছেন তিনি।

কিছুতে হেলান দিয়ে তিনি আহার করতেন না। তিনি বলতেন, ঠেক লাগিয়ে আমি খাই না। খাওয়ার পর তিনবার আঙ্গুল চেটে নিতেন। টেবিলের ওপর রেখে তিনি খানা খান নি। ছোট ছোট তশতরী সাজিয়েও তিনি খান নি। তাঁর জন্য কখনও চাপাতি রুটি প্রস্তুত করা হয়নি। হযরত কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিসের ওপর রেখে খানা খেতেন? তিনি বললেন ঃ চামড়ার দস্তরখানে রেখেই খেতেন। লাউ তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। হালুয়া ও মধুও তাঁর খুবই পছন্দের ছিল। গোশতের মধ্যে প্রিয় ছিল হাতার গোশত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হাতার গোশ্‌ত সবচেয়ে প্রিয় ছিল, কথা তা নয়; ব্যাপার হলো, কখনও কখনও গোশ্‌ত খাওয়ার সুযোগ হতো আমাদের। হাতার গোশ্‌ত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হতো। তাই তিনি হাতার গোশ্‌ত পছন্দ করতেন, যাতে তাড়াতাড়ি খানা থেকে ফারেগ হয়ে তিনি তাঁর মহান কাজগুলোতে লিপ্ত হতে পারেন। ডেকচি ও পেয়ালার বেঁচে থাকা খাবার তিনি আগ্রহ করে খেতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে কেউ যদি খানা খায় তবে তার সাথে শয়তানও শরীক হয়। তিনি আরো বলেছেন ঃ খানা শুরু করার সময় যদি বিসমিল্লাহ্‌ বলতে কেউ ভুলে যায় তবে বলবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ـ

আল্লাহ্‌র নামে শুরুতেও এবং শেষেও।

খানা খাওয়ার পর তিনি পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলিম বানিয়েছেন।

দস্তরখানা ওঠানোর সময় বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা তাঁরই আমরা করি। তাঁর থেকে আপেক্ষও হওয়া যায় না বা তাঁকে পরিত্যাগও করা যায় না। তিনিই আমাদের পরওয়ারদিগার।

তিনি ইরশাদ করেন ঃ বান্দা যখন কিছু খায় বা পান করে তখন যদি সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তবে আল্লাহ্ খুব খুশি হন।

ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পানীয়। তিনি বলতেন ঃ খানা ও পিনা উভয়ের কাজ দেয় এমন জিনিস দুধ অপেক্ষা আর কিছুই নেই। তিনি যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতেন। পানি সাধারণত তিন শ্বাসে খেতেন।

তাঁর একট আতরদানী ছিল। এ থেকে তিনি আতর লাগাতেন। আতর হাদিয়া দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি বলতেন, তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয় ঃ তাকিয়া, সুগন্ধি ও দুধ।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার গন্ধ ছড়ায় কিন্তু রং হয় না, কিন্তু মেয়েদের সুগন্ধি হলো যার রং হয় কিন্তু গন্ধ ছড়ায় না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথার ভঙ্গি তোমাদের মতো এত দ্রুত ও জড়ানো হতো না, বরং পরিষ্কার করে প্রতিটি বিষয় ও বাক্য আলাদা আলাদা উচ্চারণ করতেন তিনি। সামনে যারা থাকতেন সকলেই খুব ভালভাবে তা বুঝে নিতে পারতেন। অনেক সময় একটি কথাকে তিনি তিনবার করেও বলতেন যাতে উপস্থিত সকলেই তা ভাল করে ধরে নিতে পারতেন।

তিনি স্মিত হাসি হাসতেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা বেশি আর কাউকে এত স্মিত হাসি হাসতে দেখিনি। কখনও তিনি এতটুকু হাসতেন যে, তাঁর দাঁত মুবারক ঝিলিক দিয়ে উঠত।

জরীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও তাঁর কাছে যেতে বাধা দেন নি। আর যতবারই আমাকে দেখতেন তিনি স্মিত হাসতেন।

হযরত আনাস বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে খুবই মিশতেন, এমন কি হাসি-তামাশাও করতেন। আমার একটি ছোট ভাই ছিল। তিনি তাকে দেখলে ছড়া কেটে বলতেন ঃ

يَاأَبَا عُمَيْرَ مَافَعَلَ النُّغَيْرُ -

ও হে আবূ উমায়র!

কি হলো তোমার চড়াইর।[১]

সাহাবীগণ একবার তাঁর খেদমতে আরয করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন! বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ করি, তবে মিথ্যা কৌতুক করি না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। কখনও কখনও অন্যান্য কবিতা থেকেও আবৃত্তি করেছেন তিনি। কবি তুরফার এই পংক্তিটি তিনি কোন কোন সময় আবৃত্তি করতেন ঃ

وَيَاتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تَزَوَّدِ -

তোমাদের কাছে সেও সংবাদ নিয়ে আসে যাকে তোমরা কোন পাথেয় দাও নি।

কোন কোন সময় বলতেন ঃ কবিরা যা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সত্য হলো কবি লবীদ ইব্‌ন রবীআর এই পংক্তিটি ঃ

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلُ -

জেনে রেখো, আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই বাতিল, সব কিছুই ধ্বংসশীল।

একবার ঠোকর খেয়ে তাঁর পায়ের নখ যখমী হয়ে গেলে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دُمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ -

১. নুগায়র বা চড়াই পাখির মতো দেখতে একটা পাখির বাচ্চা আবূ উমায়র পালতেন। কিন্তু সেটি পরে মরে গেলে তাকে তিনি এই কৌতুক করেছিলেন।

তুই তো একটা অঙ্গুলি মাত্র রক্তাক্ত হয়েছিস,

আর আল্লাহ্‌র পথেই তা তুই লাভ করেছিস, সুতরাং দুঃখের কি আছে আর।[১]

হুনায়নের যুদ্ধের সময় তিনি আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ـ

আমি নবী, মিথ্যা নয় তা,

আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান (মিথ্যা নয় তাও)।

অন্যদেরও তিনি কবিতা রচনা ও কবিতা আবৃত্তির অনুমতি দিয়েছেন এবং এর জন্য পুরস্কৃতও করেছেন।[২] হযরত জাবির ইবন সামুরা বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের এখানে শতাধিক মজলিসে অংশ গ্রহণ করেছি। এই সমস্ত মজলিসে সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি ও জাহিলী যুগের ঘটনা ও জাহিলী কাহিনী বর্ণনা করেছেন আর তিনি তাতে বাধা দেন নি, বরং চুপ করে তা শুনেছেন, এমন কি কখনও কখনও তাদের সাথে স্মিত হাসিও হেসেছেন।

হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতের জন্য মসজিদে মিম্বর স্থাপন করেছিলেন। এতে দাঁড়িয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে না'ত আবৃত্তি করতেন, তাঁর পক্ষ থেকে কবিতার মাধ্যমে কাফিরদের জওয়াব দিতেন। রাসূল (সা) বলতেন ঃ রূহুল কুদস জিবরীলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হাস্‌সানের সাহায্য করেন যখন তিনি ইসলামের রক্ষায় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের জওয়াবে কবিতা রচনা করেন।

তিনি যখন শুতে ইচ্ছা করতেন তখন ডান হাত ডান গালের নিচে রাখতেন। দু'আ পড়তেন ঃ

رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

হে আমার রব! তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা কর, তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবে যেদিন।

---

১. কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেয়নি আর তা তাঁর জন্য উচিতও নয়। এই আলোকে কবিতাটির ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। এর জওয়াবে বলা হয়, এক-আধবার ছন্দবদ্ধ বাক্য কারো মুখ থেকে নিঃসৃত হলে তাকে কবি বলা হয় না। দ্বিতীয় এটি অন্য আরেকজনের রচনা, তিনি আবৃত্তি করেছিলেন মাত্র; সুতরাং এটি উক্ত আয়াতের পরিপন্থী নয়।

২. হযরত কা'ব ইবন মালিকের কাসিদা তিনি শুনেছিলেন এবং তাঁকে একখানা চাদর উপহার দিয়েছিলেন।

বিছানায় যেয়ে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى -

হে আল্লাহ্! আপনার নাম নিয়েই মারা যাই, আপনার নামেই জীবিত হই।

ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের যিন্দা করেছেন মৃত্যু প্রদানের পর, আর তাঁর কাছেই হবে পুনরুত্থান।

তাঁর বিছানা ছিল চামড়ার। এর ভেতরে ছিল খর্জুরের ছাল। তিনি অসুস্থ লোকদের দেখতে যেতেন। জানাযায় শরীক হতেন। একজন দাসও যদি দাওয়াত করত তাও তিনি গ্রহণ করতেন। বলতেন ঃ বকরীর সামান্য একটা পায়াও যদি দেওয়া হয় তবে তা–ও আমি নেব, আর এতটুকুর জন্য দাওয়াত করলে তাও গ্রহণ করব।

পুরাতন এক হাওদায় চড়ে তিনি হজ্জ করেছেন। সামান্য একটা কাপড় এতে মেলানো ছিল। চার দিরহামও এর মূল্য ছিল না। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন বিষয় অপছন্দ হলে মুখের ওপর না করতেন না। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর বিনিময়ে কিছু না কিছু দিতেন। পর্দাবৃতা কুমারী মেয়েদের অপেক্ষাও তিনি লজ্জাশীল ছিলেন। কোন বিষয় অপছন্দ হলে চেহারা দেখে তা বোঝা যেত।

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের রব্বানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আধ্যাত্মিক রোগ ও নাফ্সানী শয়তানিয়াতের প্রতিষেধক

এখানে আমরা কালামে পাকের কিছু আয়াত, কিছু হাদীস উল্লেখ করতে চাই। এগুলোতে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের বুনিয়াদী, মৌলিক শিক্ষা ও নির্দেশনা বিদ্যমান। নফসের ফিত্না ও দুষ্টামী, শয়তানের চক্রান্ত, ধোঁকা ও আধ্যাত্মিক রোগ নামক বিষের মহৌষধ এগুলোতে রয়েছে। এগুলোতেই আছে এ সবের সর্বোত্তম চিকিৎসা। সাথে সাথে তা'ছীর ও কার্যকারিতার দিক থেকেও এগুলো অতুলনীয় ও নজীরবিহীন। কেননা এগুলো হলো হাকীম ও আলিম, পরম হিকমতওয়ালা ও পরম বিজ্ঞ এক সত্তা, যিনি সব কিছু জানেন ও দেখেন, তাঁর কালাম। সকল মানুষের স্রষ্টা, তাদের হৃদয় মনের কারিগর ও নির্মাতা কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-বিধান ও নীতিমালা হলো এগুলো। তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْر -

শোন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি বেখবর! তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সব কিছু সম্পর্কে অবহিত। [সূরা আল-মুল্ক ঃ ১৪]

এই সমস্ত হিদায়াত ও শিক্ষা হচ্ছে মা'সূম ও নিষ্পাপ সেই নবীর, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেছিলেন আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ, কিতাব ও হিকমতের তা'লীম দানের জন্য। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

اَدَّبَنِى رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبِى -

আমার রব আমার তরবিয়ত করেছেন আর সর্বোত্তমভাবে আমাকে তরবিয়্যত দিয়েছেন তিনি।

এই সমস্ত নির্দেশনা ও শিক্ষা যে কেউ অনুসরণ করবে, দৃঢ় সংকল্প হয়ে মনেপ্রাণে এবং ইখলাস ও আমানতদারীর সঙ্গে এগুলো অবলম্বন করবে সে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র মাধুরীর চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। গুরুত্ব সহকারে যে এইগুলোর পাবন্দী করবে সে সৌভাগ্য, পবিত্রতা ও রূহানী মর্যাদার সুউচ্চ স্তরে অভিষিক্ত হতে পারবে। কোন সমাজ যদি মূলনীতি ও নিজেদের কর্তব্যকর্ম হিসাবে এইগুলো গ্রহণ করে তবে তা একটা অনুকরণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক সমাজ হিসাবে পরিচিত হতে পারবে।

কতিপয় আয়াত

ইখলাস ও আন্তরিকতা

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

তারা তো কেবল এরই নির্দেশ পেয়েছিল, তারা যেন ইবাদত করে আল্লাহ্‌র, তাঁরই জন্য দীনকে খালিস করে একনিষ্ঠ হয়ে, আর যেন কায়েম করে সালাত, যেন আদায় করে যাকাত, আর এই তো হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত সোজা দীন! [সূরা আল-বায়্যিনা ঃ ৫]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ـ

শোন, আল্লাহ্‌র জন্যই হলো খালিস ও নির্ভেজাল দীন।

[সূরা আয-যুমার ঃ ৩]

সত্যিকার তওবা

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ـ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে পরিষ্কার মনে তওবা কর।

[সূরা আত্-তাহরীম ঃ ৮]

ধৈর্য্য, অধৈর্য্য ও ক্ষমা

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ـ

আর যে ধৈর্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে, নিশ্চয়ই তা তো দৃঢ় সংকল্প বিষয়ক কাজের শামিল। [সূরা আশ্-শূরা ঃ ৪৩]

আল্লাহ্‌কে হাযির-নাযির জানা

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ـ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন।

[সূরা আল-হাদীদ ঃ ৪]

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ـ

তিনি জানেন চক্ষুর খেয়ানতসমূহ আর যা গোপন থাকে মনে তাও।

[সূরা আল-গাফির ঃ ৯৯]

তাকওয়া এবং কথা ও কাজে সুদৃঢ় থাকা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ -

হে মু'মিনগণ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌র যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত।

[সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০২]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا -

হে মু'মিনগণ! ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং বল সোজা ও সঠিক কথা।

[সূরা আল-আহযাব ঃ ৭০]

য়াকীন ও তাওয়াক্কুল

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

আল্লাহ্‌র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। [সূরা ইবরাহীম ঃ ১১]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَايَمُوْتُ -

ভরসা রাখ চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র ওপর যাঁর কখনও মৃত্যু নেই।

[সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫৮]

হকের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকা

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ -

হে নবী! দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন যেমন আপনি নির্দেশিত হয়েছেন।

[সূরা হূদ ঃ ১১২]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ - اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ্, অতঃপর তারা দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে; নেই কোন ভয় তাদের আর দুঃখিতও হবে না তারা। এরাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা হামেশা থাকবে সেখানে। এ হলো তা, যা করত এর বিনিময়। [সূরা আহ্কাফ ঃ ১৩-১৪]

কিতাব ও সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ ঘটে তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছেই পেশ কর। [সূরা আন্-নিসা ঃ ৫৯]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

রাসূল যা নিয়ে আসেন তোমাদের কাছে তা গ্রহণ কর আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক। [সূরা আল-হাশর ঃ ৭]

আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসা

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ -

আর যারা ঈমান রাখে তারা তো সবচেয়ে বেশি ভালবাসে আল্লাহ্কেই। [সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৫]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ -

বলুন! তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, গোষ্ঠী, সম্পদ যা তোমরা কামাই কর, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দার তোমরা ভয় কর এবং ঘরবাড়ি যা তোমরা পছন্দ কর—এই সব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর যতদিন আল্লাহ্ তাঁর আযাবের নির্দেশ না পাঠিয়েছেন। [সূরা আত্-তাওবা ঃ ২৪]

তাকওয়া ও সৎ কাজে পরস্পর সহযোগিতা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى - وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, আর গুনাহ্ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না; ভয় কর আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। [সূরা আল-মায়িদা ঃ ২]

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। [সূরা আল-হুজরাত ঃ ১০]

আমানত আদায় করা

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا -

আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানত ফিরিয়ে দেবে তার অধিকারীর নিকট। [সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮]

পরস্পরে সন্ধি স্থাপন এবং উপকারী ও ভাল কাজসমূহ

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ م بَيْنَ النَّاسِ -

তাদের বেশির ভাগ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই, কিন্তু মঙ্গল আছে তারা যে হুকুম দেয় সদকার, নেক কাজের ও মানুষের পরস্পরে সুসম্পর্কের। [সূরা আন-নিসা ঃ ১১৪]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ -

সুতরাং ভয় কর আল্লাহ্কে, আর মানুষের পরস্পরে সন্ধি স্থাপন কর।

[সূরা আল-আনফাল ঃ ১]

কোমল ব্যবহার ও বিনয়

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

নরম ও কোমল করুন আপনার ব্যবহার মু'মিনদের জন্য।

[সূরা আল-হিজর ঃ ৮৮]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ـ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ـ

য়াতীমের ওপর যুলুম করো না, আর প্রার্থীকে ধমকিও না।

[সূরা আদ্-দুহা ঃ ৯-১০]

রাসূল (সা)-এর অনুসরণ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

হে নবী! বলুন, যদি তোমরা ভালবাস আল্লাহকে, তবে অনুসরণ কর আমার; তবে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ্। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, খুবই দয়ালু।

[সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩১]

ভয় ও আস্থা

وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنَ ـ

কেবল আমাকেই তোমরা ভয় কর। [সূরা বাকারা ঃ ৪০]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ يٰا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

হে নবী! আমার তরফ থেকে বলে দিন ঃ হে আমার বান্দাগণ, যারা সীমালংঘন করেছ নিজেদের ওপর! তোমরা নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্র রহমত থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মাফ করে দেন গুনাহ্ সবই। নিশ্চয়ই তিনিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আয্-যুমার ঃ ৫৩]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

আল্লাহ্র কৌশল থেকে একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তরাই নিরাশংক থাকে।

[সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৯৯]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় না কেউ কাফিররা ছাড়া। [সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭]

লোভ-লালসাহীনতা ও অল্পে তুষ্টি

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ـ

সম্পদ ও সন্তান—এ সবই পার্থিব জীবনের অলংকার। আর যে সব সৎ কাজ স্থায়ী থাকে, সে সব তোমার প্রভুর নিকট ও ছওয়াবের দিক থেকেও ভাল এবং আশা করার দিক থেকেও উত্তম। [সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ৪৬]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

দুনিয়ার এ জীবন তো খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয়! আখিরাত হলো সবসময়ের থাকার স্থান। হায় এরা যদি তা জানত!

[সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৬৪]

ঈছার ও আত্মত্যাগ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

এঁরা (সাহাবী ও মু'মিনগণ) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও .... নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়। [সূরা আল-হাশর ঃ ৯]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ـ

মুহব্বত থাকা সত্ত্বেও তারা খাদ্য দান করে দরিদ্র, য়াতীম ও বন্দীদের। [সূরা আদ-দাহ্‌র ঃ ৮]

অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হারাম

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

এই আখিরাতের আবাস, যারা পৃথিবীতে দাপট প্রদর্শন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইচ্ছা রাখে না তাদের আমি তা দেই। পরিণাম তো তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরই। [সূরা আল-কাসাস ঃ ৮৩]

সচ্চরিত্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

আর এরা (মু'মিনরা) ক্রোধ সম্বরণ করে এবং লোকদের ক্ষমা করে। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন নেককারদের। [সূরা আল-ইমরান ঃ ১৩৪]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

خُذِالْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ـ

ক্ষমা প্রদর্শন গ্রহণ কর, সৎ কাজের আদেশ প্রদান কর এবং মূর্খদের উপেক্ষা কর। [সূরা আল-'আরাফ ঃ ১৯৯]

সৎ লোকদের সংসর্গ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ـ

যারা সকাল-সন্ধ্যা নিজেদের প্রভুকে ডাকে, যারা তাঁরই সন্তুষ্টি চায়, তাদের সঙ্গে আপনি নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। [সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৮]

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

হে মু'মিনগণ! ভয় করবে আল্লাহ্কে আর থাকবে সত্যপন্থীদের সাথে।
[সূরা আত্-তওবা ঃ ১১৯]

এক মুসলমানের হক অন্য মুসলিমের ওপর

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

হে মু'মিনগণ! কেউ কারো উপহাস করবে না। কারণ হতে পারে তারা এদের থেকে ভাল! এক মেয়ে অপর মেয়েকে উপহাস করবে না। কারণ

হতে পারে তারা এদের তুলনায় ভাল। তোমরা তোমাদের নিজেদের (মু'মিন ভাইদের) দোষারোপ করবে না, একে অন্যের মন্দ লকবও লাগাবে না! ঈমান আনার পর খারাপ নামে নামকরণ কতই না মন্দ! আর যারা তওবা করবে না তারাই যালিম। [সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১]

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ۔

হে মু'মিনগণ! অনেক ধারণা থেকে নিজেদের দূরে রাখ। কেননা কতক ধারণা পাপ বটে। একজন অপরজনের গীবতও করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করবে মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে? তা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে। আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খুবই তওবা কবূলকারী, খুবই মেহেরবান। [সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১২]

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۔

যারা কষ্ট দেয় মু'মিনদের এই সমস্ত বিষয় দ্বারা যা তারা করেনি, তারা তো বহন করে অপবাদ প্রদানের অপরাধ ও সুস্পষ্ট গুনাহ্‌র বোঝা।

[সূরা আল আহযাব ঃ ৫৮]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ۔

যখন তোমরা এই কথা শুনেছিলে তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা কেন নিজেদের সৎ ধারণা করল না এবং বলল না, এ হলো স্পষ্ট মিথ্যা।

[সূরা আন্-নূর ঃ ১২]

কতিপয় হাদীস

সকল কাজে সহীহ্ নিয়্যত ও আল্লাহ্র থেকে ছওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখার গুরুত্ব

(১)

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اَمْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَاَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ۔

নিয়্যতের ওপর আমলের মর্যাদা নির্ভর করে। যে যা নিয়্যত করবে সে তা পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের আশায় বা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশে হিজরত করবে তার হিজরত সে জিনিসেরই বলে গণ্য হবে যে জিনিসের জন্য সে হিজরত করল। [বুখারী, মুসলিম]

(২)

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ۔

যে ব্যক্তি ঈমান রেখে ও ছওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করবে তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ঈমান রেখে ও ছওয়াবের আশায় কদর-রাত্রিতে ইবাদত করবে তারও পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

[বুখারী শরীফ]

ঈমানের শর্তসমূহ ও সত্যিকার মুসলিমের পরিচয়

(৩)

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ۔

তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার প্রবৃত্তিকে আমার আনা দীনের অনুগত করেছে। [হাকিম, তিরমিযী, খতীব বাগদাদী]

(৪)

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

তোমাদের মাঝে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হব। [বুখারী শরীফ]

(৫)

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ ـ

তোমাদের একজন মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় হব। [মুসনাদে আহমদ]

(৬)

لَايُؤْ مِنُ اَحَدَكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَ خِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ـ

তোমাদের একজন মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য, যা পছন্দ করে তার অপর এক ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে।

[বুখারী, মুসলিম]

(৭)

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ اُمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ

মুসলিম হলো সে, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম হিফাযত থাকে, আর মু'মিন হলো সে যার সম্পর্কে মানুষ তাদের জান ও মাল-সম্পদের বিষয়ে নিরাপত্তা অনুভব করে। [তিরমিযী, নাসাঈ]

(৮)

لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُهٗ وَلِسَانُهٗ وَلَا يُؤْمِنُ حَتّٰى يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقُهٗ قَالَ الرَّاوِىْ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَمَا بَوَائِقُهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَشْمُهٗ ظُلْمُهٗ ـ

কোন বান্দা ততক্ষণ মুসলমান হতে পারবে না, যতক্ষণ তার অন্তর ও যবান উভয়ই মুসলিম না হয়েছে। মু'মিন হতে পারবে না কেউ যতক্ষণ না তার প্রতিবেশীরা তার 'বাওয়াইক' থেকে নিরাপদ হয়েছে। বর্ণনাকারী ইব্‌ন মাস'ঊদ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বাওয়াইক কি? রাসূল (সা) বললেন ঃ অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা।

(৯)

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ـ

একজনের ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজ পরিত্যাগ করা।

[মালিক, আহমদ, তিরমিযী]

(১০)

ثَلَاثٌ مِنَ الْاِيْمَانِ اَلْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ـ

তিনটি বিষয় হলো ঈমানের ফল ঃ অভাবের সময়ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা, পৃথিবীতে সালামের রেওয়াজ ঘটান, নিজেদের ব্যাপারেও ইনসাফের ব্যবহার করা। [বায্‌যার]

(১১)

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يَقْذَفَ فِى النَّارِ ـ

যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই, আর যার দীনদারী নেই সে চুক্তি পালন করে না। এই তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সে ঈমানের মজা অনুভব করতে পারে ঃ (ক) আল্লাহ্‌ ও রাসূল তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হবে; (খ) আল্লাহ্‌র জন্যই কেবল একজনকে সে ভালবাসবে; (গ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন সে না-পছন্দ করে তেমনি কুফরীর দিকে ফিরে আসাকে সে না-পছন্দ করে। [বুখারী, মুসলিম]

(১২)

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ (ثلاثا) قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ -

দীন হলো মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার নাম (এ কথাটি রাসূল (সা) তিনবার উচ্চারণ করলেন)। সাহাবীগণ তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিমগণের নেতৃবৃন্দের ও সাধারণ মুসলিমদের। [মুসলিম]

(১৩)

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

মুনাফিকদের চিহ্ন হলো তিনটি ঃ (ক) কথা বললে মিথ্যা বলে; (খ) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; (গ) আমানত রাখলে তাতে খিয়ানত করে।

[বুখারী, মুসলিম]

(১৪)

اِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ -

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। [বুখারী, মুসলিম]

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَّاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُّسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ -

তোমরা হারাম থেকে বেঁচে থাক, তবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী বলে গণ্য হবে; আল্লাহ্‌ তোমার কিসমতে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক, তবে তুমি সর্বাপেক্ষা অমুখাপেক্ষী বলে গণ্য হবে; তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তবে তুমি মু'মিন বলে গণ্য হতে পারবে; নিজেদের জন্য যা পছন্দ কর অপরের জন্যও তা পছন্দ কর, তা হলে তুমি মুসলিম হতে পারবে। আর তোমরা অধিক হাসবে না, কারণ অধিক হাসলে দিল মুরদা হয়ে যায়। [তিরমিযী]

নববী ইরশাদ ও শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজচিত্র

(১৬)

اَلَا اِنَّ الْمُسْلِمَ اَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ لِاَخِيْهِ شَيْئًا اِلَّا مَا اَحَلَّ مِنْ نَفْسِهٖ -

শুনে রাখ, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সুতরাং নিজের জন্য যা হালাল ও বৈধ, অপর মুসলিমের জন্যও ততটুকু হালাল ও বৈধ। [তিরমিযী]

(১৭)

لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَلَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَّكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيَشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ اَلْمُسْلِمُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ -

তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করবে না, বিকিকিনিতে ধোঁকা দেবে না, বিদ্বেষ ভাব রাখবে না, কারো পেছনে দোষ বলবে না। কারো বিকিকিনির দাম-দস্তুরের সাথে তুমি দাম-দস্তুর করতে যেয়ো না। আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হিসাবে তোমরা বসবাস কর। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সুতরাং তাকে যুলুম করবে না, তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেবে না, তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখবে না। বুকের দিকে তিনবার ইশারা করে বললেন ঃ তাকওয়া হলো এখানে; কোন মুসলিম ভাইকে নীচ মনে করা একজনের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের ওপর হারাম অপর মুসলিমের খুন, তার মাল-সম্পদ ও তার ইয্‌যত। [মুসলিম]

(১৮)

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

কারো জন্য জায়েয নয় তিনদিনের অধিক তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে থাকা। উভয়ের সাক্ষাত হয়, কিন্তু এ-ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের মধ্যে যে প্রথমে সালাম করবে সে হলো শ্রেষ্ঠ। [বুখারী]

(১৯)

اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَائِهِ -

এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়নাস্বরূপ। এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। সুতরাং তার কর্তব্য হলো অপরজনের সম্পত্তি রক্ষা করা এবং অপরজনের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করা।

[আবূ দাউদ]

(২০)

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ -

সিয়াম, সালাত ও সদকা থেকেও উচ্চ মর্যাদার কাজের কথা কি তোমাদের বলব? সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, নিশ্চয় তা বলুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা হলো পরস্পরে সুসম্পর্ক স্থাপন। পরস্পর সম্পর্ক নষ্ট হওয়া হলো ধ্বংসকর বস্তু। [আবূ দাউদ]

(২১)

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَّلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ -

সামান্যতম ভাল কাজকেও কখনও ছোট মনে করবে না, তা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা করার মতোও হোক না কেন। [মুসলিম]

(২২)

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

পরস্পর দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মুসলিমরা একটা শরীরের মত। শরীরের একটা অংশেও যদি কষ্ট হয়, তবে গোটা শরীরই তাপ ও অনিদ্রায় সকল ক্ষেত্রেই তা সমভাবে অনুভব করে থাকে।

[বুখারী, মুসলিম]

(২৩)

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ -

গোটা সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের সাথে ভাল আচরণ করে। [বায়হাকী]

(২৪)

مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اِنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ -

হযরত জিবরীল প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে আমাকে এত বেশী ওসীয়ত করেছেন যে, আমার মনে হয়েছিল তাদের বুঝি ওয়ারিছই বানিয়ে দেয়া হবে। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

(২৫)

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ -

যারা দয়া করে দয়াময় তাদের দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের ওপর দয়া কর, আকাশবাসী তোমাদের ওপর দয়া করবেন। [তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

ধ্বংসকর আমল ও ব্যবহার এবং জান্নাত প্রবেশ রুদ্ধকারী কাজসমূহ

(২৬)

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ -

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

(২৭)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ وَّفِىْ رِوَايَةٍ قَتَّاتٌ -

চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না। [বুখারী, মুসলিম]

(২৮)

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ

اَلْحَطَبَ -

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ আগুন যেমন কাঠ পুড়িয়ে ফেলে তেমনিভাবে হিংসাও নেক আমলকে পুড়িয়ে দেয়। [আবূ দাউদ]

(২৯)

رَبِّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلِكُمْ اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ـ

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ব্যাধি তোমাদেরও স্পর্শ করছে। আর সে ব্যাধি হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। এ রোগ হলো ধ্বংসকর রোগ। এ চুল কাটে না বটে, কিন্তু দীনকে কেটে শেষ করে দেয়। [তিরমিযী, আহমদ]

(৩০)

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ -

দুটো হিংস্র ব্যাঘ্র যদি ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া যায়, তবে তাও এত ক্ষতি করতে পারে না, যশ ও সম্পদের মোহ মানুষের দীনের যা ক্ষতি সাধন করতে পারে। [তিরমিযী, আহমদ]

সচ্চরিত্রবান হওয়ার ফযীলত, তাকওয়া ও বুদ্ধিমত্তার দাবিসমূহ

(৩১)

اَمَرَنِيْ رَبِّيْ بِتِسْعٍ خَشْيَةِ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ وَاُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِيْ فِكْرًا وَنُطْقِيْ ذِكْرًا وَنَظَرِيْ عِبْرَةً وَّاٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ -

আমার রব আমাকে নয়টি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ভয় করতে, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলতে; দারিদ্র্য ও সম্পদে সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে; যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথেও সম্পর্ক অটুট রাখতে; যে ব্যক্তি

আমাকে বঞ্চিত করেছে তাকেও দান করতে; যে ব্যক্তি আমার ওপর যুলুম করেছে তাকেও ক্ষমা করতে; আর আমার চুপ থাকা যেন হয় চিন্তা ও ধ্যানসমৃদ্ধ; কথা যেন হয় আল্লাহ্‌র স্মরণসমৃদ্ধ; দৃষ্টি যেন হয় শিক্ষা লাভের জন্য এবং সর্বাবস্থায় যেন আমি সৎ কাজের আদেশ প্রদান করি। [রাযীন]

(৩২)

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ـ

যে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষা করার বদলে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে মূলত সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা যায় না। সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্নকারীর সঙ্গেও সম্পর্ক অটুট রাখে। [বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী]

(৩৩)

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ اَخْلَاقًا وَّ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ـ

চরিত্র ও ব্যবহার যার ভাল সেই হলো তোমাদের মধ্যে কামিল মু'মিন। আর তোমাদের মধ্যে ভাল হলো সে, যে তার স্ত্রীর নিকট ভাল। [তিরমিযী]

(৩৪)

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ـ

নিশ্চয়ই একজন মু'মিন তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে লাগাতার সিয়াম সালাতকারীর দরজা লাভ করতে পারে। [আবূ দাউদ]

(৩৫)

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ ـ

যাতে সন্দেহ আছে তা ত্যাগ কর, যাতে সন্দেহ নাই তা গ্রহণ কর। [আহমদ, দারিমী]

(৩৬)

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ اَلْبِرُّ مَا اطْمَاَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَاَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَاَفْتَوْكَ ـ

নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে চলো। মন ও বিবেক যাতে স্বস্তি পায়, ইত্মিনান পায় তা হলো নেক কর্ম, আর মনে ও বিবেকে যে কাজ সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ হয় তা হলো বদ কর্ম তা মানুষ তোমাকে যতই ফতওয়া দিক না কেন।

(৩৭)

اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ -

যেখানেই থাক আল্লাহ্কে ভয় কর। কোন খারাপ কাজ করে ফেললে সাথে সাথে একটা ভাল কাজ করে ফেলবে, এ ওটাকে মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে সব সময় সদ্ব্যবহার করবে। [আহমদ, তিরমিযী, দারিমী]

(৩৮)

مَنْ يَّضْمِنْ لِيْ بَيْنَ لَحْيَيْهِ ضَمِنْتُ لَهٗ بِالْجَنَّةِ -

উভয় পা'র মাঝে যা আছে (লজ্জাস্থান) এবং উভয় পাটির মাঝে যা আছে (জিহ্বা)-এর জামানত যে দিতে পারবে আমি তার জান্নাতের জামানত দেব। [বুখারী, তিরমিযী]

(৩৯)

مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ -

যে ব্যক্তি ভয় করে সে রাতেও চলতে থাকে। আর যে ব্যক্তি রাতেও চলে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছেই যায়। শুনে রাখ, আল্লাহ্র সওদার মূল্য খুব বেশি। আল্লাহ্র সওদা হলো জান্নাত। [তিরমিযী]

(৪০)

مَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ هَمَّهٗ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاءَ فِيْ قَلْبِهٖ وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهٗ وَاَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَّمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهٗ جَعَلَ اللّٰهُ مَقْرَهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهٗ وَلَمْ يَاْتِهٖ مِنْهَا اِلَّا مَا قُدِّرَ لَهٗ -

আখিরাত যার চিন্তার কেন্দ্র—আল্লাহ্ তার দিলকে ধনী করে দেন, তার সকল সূত্রকে একত্র করে দেন আর দুনিয়া খলীল (প্রভু) হয়ে তার পেছনে আসে। পার্থিব বস্তু যার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ্ তার দৃষ্টির সামনে অভাব ছড়িয়ে রাখেন, তার সকল সূত্র করে দেন বিক্ষিপ্ত আর দুনিয়া থেকে মাত্র ততটুকুই সে পায়, যতটুকু তার তকদীরে রাখা হয়েছে।

[তিরমিযী]

(৪১)

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِى ـ

প্রকৃত বুদ্ধিমান হলো সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের নফসের সমীক্ষা বজায় রাখে আর মৃত্যুর পরের সময়ের জন্য কাজ করে। দুর্বল ও অকামের হলো সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে আর কল্পনা করে আল্লাহ্র থেকে পাওয়ার। [তিরমিযী]

ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের গুরুত্ব, এর প্রয়োজনীয়তা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এর বৈপরীত্য

যে দীন ও জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনের সব ক্ষেত্রের ওপর ব্যাপ্ত, যে দীন বিশেষ এক আকীদা, বিশ্বাস ও জীবনবোধের আলোকে মানুষের জীবনকে বিশেষ এক কাঠামোতে গড়তে চায় সেই দীন ও জীবনব্যবস্থা তার নিজস্ব সংস্কৃতি, এর সহায়ক ও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ ব্যতিরেকে কখনও যিন্দা থাকতে পারে না। জীবন ও জীবনের মুহূর্তগুলোর এক বিরাট অংশের ওপর ব্যাপ্ত ইবাদত ও আরাধনা, ফারাইয ও কর্তব্যকর্মের এক বিশেষ ব্যবস্থা যে দীন ও জীবনব্যবস্থায় রয়েছে, যে দীন ও ধর্ম ব্যবস্থার ইবাদতসমূহ আঞ্জাম দেয়ার রয়েছে বিশেষ কিছু শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতি, পবিত্রতা ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি যে দীনের মাঝে বিদ্যমান, বড় বড় নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার অর্থই কেবল যেখানে নৈতিক নির্মলতা বা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অর্থ ব্যক্ত নয়, বরং পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতা শব্দটি যেখানে আরো ব্যাপক ও গভীরতর, সেই দীন ও এর অনুসারীদের পক্ষে, বিশেষ করে এমন এক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে সহাবস্থান কেমন করে সম্ভব, কতিপয় ঐতিহাসিক কার্যকারণের প্রেক্ষিতে যে সংস্কৃতি ও তমদ্দুন লালিত ও বর্ধিত হয়েছে, কখনও বা নিরেট বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে, এমন কি কখনও বা ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আবহাওয়ায় হয়েছে যার পরিস্ফুটন? পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনব্যবস্থার মূল রহস্য ও আসল রূপ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দার্শনিক কবি ইকবাল মাত্র একটি পংক্তিতে গোটা ব্যবস্থাটি চিত্রিত করে তুলে ধরেছেন ঃ

كه روح اس مدنيت كى ره سكى نه عفيف -

এই তমদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থার নেই কোন প্রাণ

আর নেই কোন নির্মলতাও।

ইসলামী তমদ্দুনের গোটা ইবাদত ব্যবস্থাই তাহারাত বা পবিত্রতার সাথে বিজড়িত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় বড়জোর পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে

কিছুটা ধারণা রয়েছে মাত্র। ইসলামী তমদ্দুন দৃষ্টি, হৃদয়, এমন কি কল্পনার নির্মলতা অর্জনেরও প্রবক্তা এবং সকল কিছুর ক্ষেত্রেই সে কলুষহীনতা ও ইফ্ফাতের আবেদন জানায়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও তমদ্দুনের মাঝে কেবল আইনগত কাঠামোর বড়জোর প্রচলিত ধারণা ও রীতিরই মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। প্রচলিত রীতি, পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে তার চোখে কোন আচরণই আর মন্দ ও নৈতিক নির্মলতার পরিপন্থী বলে বাকি থাকে না।

পর্দা ও শালীনতার প্রতি ইসলাম সব সময়ই সোচ্চার এবং তার গোড়া সমর্থক। শরীয়তপ্রদত্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে সে তা মেনে চলে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজ বর্তমানে হিজাব ও পর্দার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কেও অনবহিত ও অজ্ঞ। এই সংস্কৃতির সূচনা লগ্নেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা। নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ইসলাম সমর্থন করে না। সমাজের জন্য একে খুবই ক্ষতিকর ও বহু নৈতিক অসুস্থতার কারণ বলে এটিকে চিহ্নিত করে সে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় জীবনের অগ্রগতির অন্যতম বুনিয়াদ এটি এবং একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে বিশ্বাস করা হয় একে।

উভয় সংস্কৃতিতে এই সমস্ত মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য ছাড়াও ছবি, কুকুর, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য ও রেশমের ব্যবহার, যবেহ করা না করার প্রভেদ এবং এই ধরনের আরো বহু খুঁটিনাটিতে উভয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে পার্থক্যই কেবল নয়, অধিকন্তু বৈপরীত্যও বিদ্যমান।

জানদারের ছবি ও চিত্রকর্মের সপক্ষে কলাসমৃদ্ধ যত যুক্তিই প্রদর্শন করা হোক না কেন, ইসলাম কখনও একে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে না। রাসূল (সা) একে ঘৃণা করতেন, অপছন্দ করতেন। সহীহ্ হাদীসে আছে, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও মূর্তি থাকে ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ করেন না,[১] অথচ ছবি ও চিত্রকর্ম ছাড়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কথা তো চিন্তাও করা যায়

১. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة অর্থাৎ যে ঘরে ছবি রয়েছে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। অপর একটি রিওয়ায়েতে আছে ঃ لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل অর্থাৎ যে ঘরে কুকুর ও মূর্তি রয়েছে সে ঘরে ফেরেশতা আসেন না। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত জিবরাঈল বলেন ঃ انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب অর্থাৎ আমরা সে ঘরে যাই না যে ঘরে ছবি ও কুকুর বিদ্যমান।

না![১] আর তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার পর ইসলামের পবিত্রতা ও নির্মলতা, হিজাব ও পর্দা, লজ্জাশীলতা ও শালীনতা, অনাড়ম্বরতা ও সামঞ্জস্যশীলত া সুন্নত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের উস্ওয়া প্রদর্শিত পথে কায়েম থাকা কখনও সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে না।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করার পরই কেবল এই সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে কথা নয়, এমন কি আংশিকভাবে বা সাময়িকভাবেও যদি কেউ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছাঁচে গঠিত সমাজে বা পরিবেশে সামান্য সময়ও কাটায় তবে তাকেও এই সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে নির্মিত (এশিয়া ও প্রাচ্য দেশসমূহে, এমন কি আরব এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে নির্মিত) বড় বড় হোটেলে কিছু সময় অবস্থান করা দ্বারাও এই কথার আন্দায একজনের হয়ে যেতে পারে। এইগুলোতে অবস্থানকালে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন ও ফরযসমূহের পাবন্দী করা খুবই মুশকিল হয়ে ওঠে, এমন কি অনেক সময় শরীয়তনির্ধারিত সীমা অতিক্রমেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়।[২] সুতরাং বিশুদ্ধ আকীদা বা বিশ্বাস, ইবাদত, সুন্নত ও মুস্তাহাব কাজসমূহ, আযকার বা সূরার অর্থ বা হাদীসে বর্ণিত যিকর-আযকার এবং ইসলামী চরিত্র ও অভ্যাস (এই পুস্তকটিতে যেগুলোর প্রয়োজনীয় বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে) গড়ে তোলার সাথে সাথে স্বীয় পরিবার ও পরিবেশে ইসলামী সমাজ চিত্রের প্রতিফলনেও সচেষ্ট হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, এর বৈশিষ্ট্যাবলী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, যথা ঃ নরনারীর অবাধ মেলামেশা, বে-পর্দেগী, ছবির অবাধ ব্যবহার, বিশেষ করে সিনেমা, টেলিভিশন, গান-বাদ্য, কুকুর-প্রীতি ও এর স্পর্শ লাভ, সন্দেহজনক খাদ্যাহার ইত্যাদি থেকে যথেষ্ট দূরে থাকা কর্তব্য। পর্দা-পুশিদা, পবিত্রতা ও তাহারাতের ব্যবস্থা, পানি ব্যবহারের আরামপ্রদ সহজ পদ্ধতি, কিবলার দিক সম্পর্কে জ্ঞান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্রের পরিচ্ছন্নতা, সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দান ও দীনী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মেয়েদের ওয়াকিফহাল করে তুলতে সজাগতার সাথে তৎপর থাকতে হবে। এ ছাড়া শরীয়ত ও সুন্নত অনুসরণে জীবন যাপন তো দূরের কথা, দীনী ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্যসমূহ পালন করাও বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

১. আরবদেশও আজ এই ফিতনার শিকার এবং এর পরিণামও আজ সেখানে প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

২. লেখকের বারবার এই বিষয়টির পরীক্ষা হয়েছে। সফরনামা ও বিভিন্ন ভাষণে এ কথার উল্লেখও আমি করেছি।

স্বকীয় দীন ও শরীয়তের ছায়ায় গঠিত ও লালিত, বিশেষ দীনী ও ধর্মীয় পরিবেশে বর্ধিত ও সমৃদ্ধ তাহযীব-তমদ্দুন থেকে কোন জাতিকে দূরে সরিয়ে দেয়ার অর্থই হলো জীবনের কর্মকাণ্ড থেকে একে পৃথক করে কেবল আকীদা ও বিশ্বাস, ইবাদত ও দীনী রসম-রেওয়াজের সীমায় একে সীমাবদ্ধ করে দেয়া। আর তা হলো সে জাতিকে তাঁর অতীত থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দেয়ারই নামান্তর। ফলে সে জাতি ক্রমান্বয়ে নিজেদের বুনিয়াদী আকীদা ও জীবন-দর্শন থেকে পর্যন্ত বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং তখন সময় হয়ে যায় মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইরতিদাদ ও ধর্মচ্যুতি ঘটার। এদের মধ্যে তখন সামাজিক নৈরাজ্য, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা ও নৈতিক কুষ্ঠ রোগাক্রমণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে শুরু হয়, মদ্যপান ও নেশার বিস্তার ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজে আজ এরই চরম রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে, আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে লিপ্ত মুসলিম দেশসমূহও বর্তমানে তা-ই নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছে।

কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু পরামর্শ

পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়সমূহে ইসলামের বিশেষ প্রকৃতি ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ, বিশুদ্ধ ইসলামী ও সুন্নী আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইসলামের বৈধ আদত ও রীতিসমূহ, রাসূল (সা)-এর সুন্নতসমূহ, ইবাদতসমূহে তাঁর অনুসৃত রীতি-নীতি, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ও আল্লাহ্‌র নামকে বুলন্দ করার বিষয়ে তাঁর আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি, চরিত্র গঠন ও তাযকিয়া-এ-নাফ্‌স বা আত্ম-সংশোধনের কুরআনসম্মত ও নববী অনুসৃত মর্ম, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (সা)-এর সুন্নতে এর গুরুত্ব, রাসূল (সা)-এর চরিত্র, তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি ও পবিত্র সীরাত সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, চরিত্র গঠন ও চরিত্র সংশোধন, একজন আদর্শ সমাজ সদস্য নির্মাণ এবং নফসের ফিত্‌না, শয়তানের বিভিন্ন চাল ও ষড়যন্ত্র, স্বভাব-চরিত্র ও ক্রিয়াকর্মে বিভিন্ন বিপজ্জনক দুর্বলতা থেকে হিফাযতের বিষয়ে যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে তা একজনের জন্য যথেষ্ট যে নিজেকে সংশোধন করার সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টিত; যে জন নফসের ধোঁকায় প্রবঞ্চিত না হয়ে ঈমান ও ইহ্‌সানের সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার অভিলাষ ও আশা পোষণ করে, বিলায়াতে 'আম্মা ও খাস্‌সা বা সাধারণ ওলীর দরজা বা বিশেষ ওলীর দরজা এবং রাসূল (সা)-এর কামিল ইকতিদা ও অনুসরণের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার অপার প্রেরণা ও সাহস যার অন্তরে ঊর্মিমুখর, তার জন্য এর চেয়ে আর বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

যারা আমার জন্যে মুজাহাদা করছে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথ দেখিয়ে দেব; আর আল্লাহ্ তো সৎকর্মশীলদের সাথেই রয়েছেন।

[সূরা আল-'আনকাবুত ঃ ৬৯]

পাঠকের হয়ত ধারণা হতে পারে, সংক্ষিপ্ত এই পুস্তকটিতে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা তো নতুন কিছু নয়। এগুলো হলো সাধারণ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, আল্লাহ্র কালাম ও রাসূল (সা)-এর হাদীসসমূহে এগুলোর বিবরণ ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন ও বর্তমান যুগের নির্ভরযোগ্য আলিমদের রচিত গ্রন্থসমূহে একই স্থানে না হোক, বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত আকারে হলেও এইগুলো বিদ্যমান, লেখক নিজেই (ভূমিকায়) ইমাম গাযালীর যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুগের রচিত এই জাতীয় গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সংক্ষিপ্ত করা, সহজীকরণ ও বর্তমান যুগ মানুষের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেয়া ছাড়া গ্রন্থটিতে নতুনত্ব বলতে তো কিছুই নেই। এতে নতুন কোন আবিষ্কার বা লুক্কায়িত কোন ভাণ্ডারের কোনরূপ সন্ধান নেই। সুতরাং এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু থেকে উপকার লাভের এবং এটির মূল লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতে, আমাদের যে জীবন বর্তমানে এক বিশেষ রীতি ও ধারায় প্রবহমান—একে ঈমান, ইহ্তিসাব ও জবাবদিহির ধারণা এবং আল্লাহ্র ফরমাঁবরদারী ও আনুগত্যসঞ্জাত জীবনে পরিবর্তিত ও রূপায়িত করার, ঈমানের রঙে রঞ্জিত ও ইসলামী আখলাক ও চরিত্রে সুসজ্জিত জীবনে বদলে দেয়ার কি পথ? বর্তমান যুগের একজন মুসলিম কোন্ পয়েন্ট থেকে শুরু করবে এই কাজ? কোন্ জিনিসটিকে দিতে হবে অগ্রাধিকার যাতে সন্তোষজনক ফল লাভ সম্ভব হয়ে উঠতে পারবে? পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে সম্ভাবনাময় অনুভূতিগ্রাহ্য পরিবর্তন সূচিত হতে পারবে? আর যা প্রত্যক্ষ করে তার নিজের হৃদয় ও বিবেক আশ্বস্ত হতে পারবে এবং সাথে সাথে সমস্যাবলী ও তা বাস্তবভাবে উপলব্ধি করতে পারবে সেটি কি?

এই প্রশ্ন ও এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই এখানে কিছু অভিজ্ঞতার কথা, পরামর্শস্বরূপ কয়েকটি বিষয় পেশ করছি। আশা করি, বিদগ্ধ ও সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক যাদের 'আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন সাহস ও সংকল্প এবং সুশোভিত

করেছেন হাকীকত ও তাৎপর্যপূর্ণ বিলাসী মন ও ইখলাসপূর্ণ হৃদয় সম্পদ দিয়ে—তাঁরা এ থেকে সন্তোষজনক ফায়দা ওঠাতে সক্ষম হবেন।

সর্বপ্রথম এই গ্রন্থটিকে স্বীয় জীবনের জীবন-বিধান, স্বীয় আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে একটি গাইড-বুক ও নির্দেশিকা পুস্তকরূপে গ্রহণ করে নেয়ার প্রয়াস নিতে হবে। তা এইজন্য নয়, এটি এমন একজন মুজতাহিদ ও নির্ভরযোগ্য মুহাক্কিক আলিমের রচনা যাকে আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। আসলে তা নয়, নিজের শক্তি ও হাকীকত সম্পর্কে লেখক খুবই অবহিত, বরং গ্রন্থটিকে এজন্যই গ্রহণ করা দরকার, এটিতে ইসলামের প্রাথমিক জরুরী ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহ মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাত যে সমস্ত দীনী বিষয়ে একমত সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনাসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নত, তাঁর আখলাক ও আকৃতি-প্রকৃতির বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী। সুতরাং অনুরোধ হলো বিনোদন বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটান বা লেখকের দক্ষতা, সফলতা কিংবা তার অসফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণের উদ্দেশে যেন কেউ গ্রন্থটি অধ্যয়ন না করেন। এই বিষয়ে লেখক নিজেকেও পাঠকদের কাতারে শামিল বলে মনে করেন। কারণ এর বিষয়বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়ে সে অন্য কারো চেয়ে কম মুখাপেক্ষী নয়।[১]

এক. মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর তাবলীগ ও রিসালত প্রচারের কাজ যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করেছিলেন সেই বিষয়টির মাধ্যমেই আমাদেরও শুরু করা উচিত। আমাদের আকীদা ও বিশ্বাসের ইসলাহ ও তা বিশুদ্ধ করতে হবে সবার আগে। কুরআনুল কারীমের আলোকে (কেননা কুরআন এই বিষয়ে কোনরূপ কলুষতা ও দুর্বলতার অবকাশ বা প্রশ্রয় দেয় না) নিজেদের আকীদা ও বিশ্বাসকে যাচাই করে নিতে হবে। কুরআনই এমন পরিষ্কার ঝকঝকে এক আয়না, যাতে প্রত্যেকেই নিজের চেহারা ও আকৃতি-প্রকৃতি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে অবলোকন করতে পারে। আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহে এই গ্রন্থটিতে কুরআনী শিক্ষা, নববী হিদায়াত ও নির্দেশনার সার উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে এবং সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা হতে মুক্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী আলিমদের অধ্যবসায় ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসারের বিবরণও এতে এসে গেছে।

১. দীনহীন অনুবাদকের অবস্থাও তথৈবচ।

দুই. জাহিরী ও বাতিনী—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, জিসমানী ও রূহানী, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক—সকলভাবেই ইসলামী বিধানানুসারে অনুমোদিত ইবাদতসমূহ এবং চারটি আসলী রুক্‌ন, যথা—সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্জের পুরোপুরি ইহতিমাম করা, এগুলোর গুরুত্ব দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয়ে যথাসম্ভব রাসূল (সা)-এর হুবহু পদাংক অনুসরণ করে চলা দরকার। দায়িত্বশীলতার ও ঐকান্তিকতার সাথে রাসূল (সা)-এর আমল পদ্ধতি, তাঁর উসওয়া ও সুন্নতসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। কারণ তিনিই এই সব কিছুর সর্বোত্তম নমুনা, পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ। ইবাদতসমূহের কথা তো আছেই, অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ—যে ব্যক্তি আশা করে আল্লাহ্‌র, শেষ দিনের এবং যিকর করে আল্লাহ্‌র অধিক হারে। [সূরা আল-আহযাব ঃ ২১]

রাসূল (সা)-এর যতটুকু অনুসরণ আমরা করব, তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণে যতটুকু আমরা সফল হব সেই পরিমাণেই আমাদের ইবাদত পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারবে। আল্লাহ্‌র দরবারে তা কবূলিয়ত ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। হাদীস গ্রন্থসমূহ ও সহীহ্ হাদীসসমূহের সংকলনগুলোতে তাঁর ইবাদত, দ্বীনী ফারাইয ও কর্তব্যাদি সম্পাদন এবং আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত ও জিহাদের ছোট-বড় সকল কথা, তাঁর সুন্নত ও অনুসৃত রীতিনীতিসমূহের আজো এমন পরিপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড বিদ্যমান যার নজীর আর কোথাও নেই।

রাসূল (সা)-এর অবদান ও তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে আমল সম্পাদনের সাথে প্রত্যেকের এই খেয়ালও রাখতে হবে, সকল ইবাদত, বিশেষ করে সালাত তার হাকীকত ও মূল তাৎপর্যে যেন উদ্ভাসিত ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে, তার রূহ ও অন্তস্থিত শক্তির সাথে যেন শক্তিময় ও ভরপুর হয়ে ওঠে যাতে আখলাক ও সকল প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার শুভ প্রভাব ও কল্যাণকর পরিণাম পরিস্ফুট হয়ে উঠতে সক্ষম হয়

এবং তা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ও মারিফাত বা প্রত্যয় অভিজ্ঞানে এবং আল্লাহ্‌র মুহব্বত ও প্রেম বৃদ্ধিতে শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল মাধ্যমরূপে পরিগণিত হয়ে উঠতে পারে।

তিন. আকীদা, ফরয ইবাদত ও হুকূকুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র হকসমূহের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার সম্পন্ন বিষয় হলো হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হকসমূহ। আল্লাহ্ তাঁর হকসমূহ মাফ করে দেন, কথাটি সত্য—কিন্তু বান্দার হক ও দাবীসমূহ মাফ করার ইখতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকেই দিয়ে রেখেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কারো যিম্মায় যদি কোন ভাইয়ের কোনরূপ দাবি, ইয্যত-আব্রু সম্পর্কিত কোন বিষয় বা অন্য আরো কোন বিষয় থেকে থাকে তবে আজ দুনিয়াতেই সে যেন এর সাফাই করে নেয় সেই সময় আসার আগেই যে সময় দিনার বা দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তার (অভিযুক্ত ব্যক্তির) কোন নেক আমল থাকে তবে হকদারকে তার হক ও দাবি অনুসারে সেই নেক আমল থেকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি নেক আমলে না হয় তবে হকদারের গুনাহ থেকে তাকে (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে) দিয়ে দেয়া হবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

মুসলিম শরীফের আর একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবা-কিরামকে বললেনঃ তোমরা বল তো কাঙাল কে? সাহাবীগণ বললেন ঃ যার টাকা-পয়সা বা মাল-সামান নেই, তাকেই তো কাঙাল বলে মনে করা হয়। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত কাঙাল ও দরিদ্র হলো সে ব্যক্তি—যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি আমল নিয়ে উঠবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে হয়ত কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কাউকে মেরে এসেছিল। ফলে তার নেক কাজের সওয়াব ওদের দিয়ে দেয়া হবে। এভাবে তার নেক খতম হয়ে যাওয়ার পরও তার ওপর হকদারের বিভিন্ন হকের দাবি থেকে যাবে। শেষে হকদারদের গুনাহ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে তাকে।

এই ধরনের অবস্থা ও আশংকা থেকে হিফাযতে থাকার ও নিজের হিসাব পরিষ্কার রাখার জন্য মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে এবং আচার-আচরণের ব্যাপারে খুবই পরিষ্কার থাকা উচিত। এতদ্বিষয়ে হুকুম-আহকাম ও মাসলা-মাসায়িল সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য খুবই তৎপর থাকা দরকার এবং বিষয়টির খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত, আর এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা কর্তব্য। এই সমস্ত সহীহ্ হাদীস (কুরআন করীমের আয়াত দ্বারাও যেগুলো সমর্থিত)-এর আলোকে নিরপেক্ষ ও জবাবদিহির মনোভাব নিয়ে আমাদের নিজেদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা এবং সকল আচার-আচরণ ও লেনদেনের ব্যাপারে যাচাই করে দেখা উচিত। যদি কারো কোনরূপ হকের দাবি আমার যিম্মায় থেকে থাকে, ঋণ হোক বা বিকিকিনির ব্যাপারে হোক, এজমালী সম্পত্তির বিষয় হোক বা মীরাছের বিষয় হোক, কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়ার বিষয় হোক বা হক নষ্ট করার বিষয় হোক, তুহমত বা অপবাদ সম্পর্কিত বিষয় হোক বা গীবত সম্পর্কিত বিষয়—এই দুনিয়াই হকদারের হক দিয়ে হোক বা তার স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে হোক, সব শুধরে নেয়া দরকার, সব পরিষ্কার করে নেয়া উচিত আমাদের। অপরের হক সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত অবহেলা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এর যিম্মাদারী থেকে যায়। উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে বিষয়টি খুবই গুরুত্বের অধিকারী। প্রথম অবকাশেই এদিকে সকলের মনোযোগ দেয়া দরকার।

চার. এরপর আমাদের কর্তব্য হলো চরিত্র গঠন. তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মসংশোধন এবং অন্তরকে সকল প্রকার কলুষতা ও মন্দ থেকে পবিত্র করে সুন্দর ও সৎগুণাবলী দ্বারা সুসজ্জিত করার সাধনায় নিমগ্ন হওয়া। মন্দভাব ও অসৎ গুণাবলী হচ্ছে ভারী ও মোটা একটি পর্দা। নববী শিক্ষা থেকে ফায়দা অর্জন ও আল্লাহ্র রঙে নিজেকে রঞ্জিত করার পথে এই পর্দাটি হলো বিরাট এক বাধা। এই জিনিসই মানুষকে প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত করে এবং তাকে শয়তানের লীলাক্ষেত্র হিসাবে বানিয়ে তোলে। আর দীন ও ধর্মক্ষেত্রে বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হিসাবে দেখা দেয় এ-ই। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ـ

আপনি কি সে লোকটিকে লক্ষ্য করেছেন, যে নিজের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তিকেই বানিয়ে নিয়েছে স্বীয় মা'বূদরূপে? [সূরা আল-জাছিয়া ঃ ২৩]

এই ক্ষেত্রেও কুরআন, সুন্নাহ ও নববী শিক্ষার মাপকাঠিরই আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য। স্বীয় নফ্স ও চরিত্র সংশোধনের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র ফয়সালাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া উচিত। একজন মানুষ যতই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সূক্ষ্মদর্শীই হোক না কেন, কেবল কোন না কোন আয়নার সামনেই সে নিজের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করতে পারে। সৌভাগ্যের অধিকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্বীয় দুর্বলতা ও চারিত্রিক রোগ-বালাই, যথা ঃ অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা, কৃপণতা, বিদ্বেষ, দুশমনী, দুনিয়ার মুহব্বত, সম্পদ-লিপ্সা, কোন মুসলিমকে হীন দৃষ্টিতে দেখা, নীচতা ইত্যাদি মন্দ ও অসৎ গুণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এইগুলোকে বিদূরিত করার ও এগুলো থেকে মুক্তি লাভের চিন্তায় অস্থির। জ্ঞানী দুশমনের সাথে একজন যেমন আহবে লিপ্ত হয় ঠিক অদ্রূপ সে-ও এইগুলোর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে নিজেকে রাখে ব্যাপৃত।

সেই ব্যক্তি অত্যন্ত খোশনসীব ও সৌভাগ্যশীল, আল্লাহ্ তা'আলা আলিম, সুবিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী কোন রূহানী চিকিৎসকের সাক্ষাৎ যার ভাগ্যে ঘটিয়েছেন, যিনি তাকে সতর্ক ও সজাগ করেন, তার চারিত্রিক দুর্বলতা ও গোপন চারিত্রিক ও রূহানী রোগ সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে থাকেন, এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় বাতলে দেন, তার জন্য সহজতর ও কার্যকরী করা সম্ভবপর বানিয়ে তোলেন তাও তাঁর অভ্যন্তরীণ ও হৃদয়জ্যোতি রোগী ও প্রত্যাশীর ভেতর পরিব্যাপ্ত হয়ে তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিবিম্বিত হয় এর মাঝে। তাঁর আল্লাহ্ভীতি, নিজেকে মুহাসাবা ও যাচাই করার অবস্থা থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করে।

অতীত যুগে এই ধরনের আল্লাহ্ওয়ালা সত্তার সংসর্গই ছিল সবচেয়ে সহজ রূহানী চিকিৎসা-পদ্ধতি। বড় বড় আলিম ও বিদগ্ধ ব্যক্তি এই ধরনের মুখলিস ও আল্লাহ্ওয়ালা সত্তার তালাশে থাকতেন। নিজের থেকে জ্ঞানে কম মর্যাদার হলেও তারা এতে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কেননা তাঁদের দরবারে ও সংসর্গে এমন সব জিনিস তাদের লাভ হতো যা বাতিনী তরবিয়ত ও সংশোধনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হতো, নফস ও শয়তান থেকে হিফাযতের উপায় বলে বিবেচিত হতো।

হযরত ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রা)-এর পুত্র একবার তাঁকে অভিযোগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ যারা জ্ঞানে তাঁর চেয়ে নিম্নমানের এবং তাঁর ছাত্র হওয়ার যোগ্য এমন সব লোকদের ওয়াজ ও নসীহতের মজলিসে যেয়ে কেন তিনি বসেন? এতে তার নিজের লজ্জা হয়। অনেক সময় এতে অন্য মানুষের ভুল

বোঝাবুঝিরও সুযোগ হয়ে পড়ে। পুত্রের এই কথা শুনে হযরত ইমাম আহমদ বলেছিলেন ঃ

يَابُنَيَّ اِنَّمَا يَجْلِسُ الْمَرْءُ حَيْثُ يَجِدُ صَلَاحَ قَلْبِهِ -

প্রিয় বৎস! মানুষ সেখানেই যেয়ে বসে যেখানে সে নিজের কলব ও অন্তরের ফায়দা দেখে।

ফিত্না-ফাসাদের ক্রমোন্নতি ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও কোন যুগই এই ধরনের আল্লাহ্ওয়ালা ও আহ্লে দিল বুযুর্গ সত্তা থেকে পৃথিবী খালি থাকে নি; হয়ত কোন সময় তাঁদের সংখ্যা রয়েছে বেশি আর কোন সময় বা কম। তবে কোন কারণে যদি কারো সে ধরনের আল্লাহ্ওয়ালা সত্তার সংসর্গ নসীব না হয় তবে সে যেন তার বাতিনী অবস্থা ও নফ্সের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং নিরপেক্ষ বিচারক বা আতালিক হিসাবে কিংবা সুবিজ্ঞ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একজন সমালোচক হিসাবে যেন নিজের নফসের অবস্থার পর্যালোচনা ও জায়েযা নিতে থাকে এবং স্বীয় রূহানী দুর্বলতা ও রোগসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার নিয়্যতে চেষ্টা করতে থাকে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ - وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ -

বরং মানুষ সে নিজের ওপর নিজেই সাক্ষ্যদাতা, যদিও সে করতে থাকে ওযর-আপত্তি। [সূরা আল-কিয়ামা ঃ ১৪-১৫]

সন্দেহ নেই, ক্রমে সে ইনশাআল্লাহ স্বীয় অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ভেতরের সেই খানা-খন্দ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠবে যে সমস্ত খানা-খন্দে দীর্ঘদিন থেকে পচা পানি জমে জমে সমাজ জীবন পর্যন্ত যার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর তার কর্তব্য হবে কিতাব, সুন্নাহ ও এই উম্মতের আল্লাহ্ওয়ালা 'উলামা, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ রূহানী মুরব্বীদের অভিজ্ঞতা ও নির্দেশের আলোকে স্বীয় রূহানী চিকিৎসার চিন্তা করা।

এই বিষয়ে উলামা-ই-কিরাম অনেক কিছু লিখেছেন, হাজারো লাখো মুসলিম এ থেকে উপকার পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত ইমাম গাযালীর ইহ্য়াউল উলূম[১], আল্লামা ইব্ন জাওযীর[২] তালবীসে ইবলীস, আল্লামা ইবন কায়্যিমের ইগাছাতুল-হিফান ফী মাকাইদিশ্-শায়তান[৩] ও মাদারিজুস- সালিকীন বায়না সালাসিলি ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন। আল্লামা ইবন

১. দেখুন, ইহয়াউল উলুম-এর আল-মুহলিকাত পরিচ্ছেদ বা ইবন কুদামা মাকদিসীর মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন-এর রিয়াযাতুন-নাফ্স ওয়া তাহযীবুল-খুলক ওয়া মু'আলাজাতু আমরাযিল-কালব শীর্ষক অধ্যায়।

২. দেখুন, তালবীস ইবলীস-এর ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ অধ্যায়।

৩. মাকাইদুশ-শায়তান অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রাজাবের জামিউল 'উলূমি ওয়াল-হিকাম, শারহু খামসীনা হাদীছান মিন জাওয়ামি'ইল কিলাম, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের সীরাত মুস্তাকীম, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর তারবিয়াতুস-সালিক নিয়মিত অধ্যয়ন করার বিশেষ পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

এই ক্ষেত্রে অধিক হারে যিকর ও দু'আর, ভয়ংকর রূহানী রোগসমূহের ধ্বংসকর পরিণাম সম্পর্কে ভীতি ও আশংকা, নিজের নাফ্স সম্পর্কে আশ্বস্ত না হওয়া ও এর প্রতি অনাস্থা, উদাসীনতা থেকে এবং উদাসীন ও রূহানী ও আত্মিক রোগের আক্রান্ত লোকজন, নাফসানী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শয়তানী মকর ও ধোঁকায় লিপ্ত লোকদের সংসর্গে থেকে দূরে থাকা খুবই উপকারী ও সহায়ক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন ও গাফিল থেকে জীবন কাটায় আমি তার ওপর শয়তানকে চাপিয়ে দিই, আর সে-ই হয় তার সাথী।

[সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৩৬]

আকীদা ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা, ইবাদত ও যথাসম্ভব নাফসের সংশোধন ও মন্দ স্বভাব থেকে এর পুরাপুরি হিফাযত ব্যবস্থা অবলম্বনের পর পুরা যিন্দেগী, সকাল-সন্ধ্যা, আচার-আচরণ, লেন-দেন এমন কি সামর্থ অনুযায়ী স্বীয় আদব-অভ্যাস ও আকৃতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রেও সীরাতে নববীর অধ্যয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা দরকার। এটিকে জীবনের দিকদর্শন ও সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও নকল-হরকতে একে নমুনা ও আদর্শরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে এর ওপর আমল করার এবং এর অনুসরণে সদা সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত ফরমান ও ওয়াদার কিছু হিস্যা আমাদের নসীব হতে পারে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ্কে তোমরা ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর; ফলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ্সমূহ। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩১]

পাঁচ. আরকানে ছালাছা অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, যাকাত[১]-এর জরুরী মাসআলা-মাসাইল, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত-সমূহ, শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ লেনদেন এবং শরীয়ত নির্ধারিত হুদূদ ও সীমাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ একান্ত দরকার। বিশেষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যে পেশা বা কাজে লিপ্ত সে সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের জ্ঞান লাভ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা একজন আল্লাহ্ভীরু, দায়িত্ববোধসম্পন্ন ও আখিরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এর জন্য কোন নির্ভরযোগ্য, সুবিজ্ঞ হাক্কানী আলিম ও যাকে সমকালীন আলিমগণ আস্থাভাজন মনে করেন সেই ধরনের কোন আল্লাহ্ওয়ালা আলিমের লেখা ফিক্হ ও মাসআলা-মাসাইলের কোন কিতাব স্বীয় অধ্যয়নে রাখা দরকার।

ছয়. আমাদের মধ্যে অনেকেই সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত ওযূ, মসজিদে প্রবেশ করা বা বের হওয়ার দু'আ, বায়তুল-খানায় যাওয়া বা সেখান থেকে বের হওয়ার দু'আ, শোয়ার বা জাগরণের দু'আ, সকাল-সন্ধ্যার যিকর-আয্কার, সফরে যাওয়ার বা বাড়িতে ফিরে আসার দু'আ ইত্যাদির খুবই পাবন্দী ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু আশংকা হয়, এই সমস্ত দু'আ ও যিকরের যে ফযীলত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এগুলোর বিষয়ে যে সওয়াবের উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এগুলোর যে মরতবা ও মর্যাদা রয়েছে, আখিরাতে এগুলোর যে ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে, সে সবের প্রতি লক্ষ্য না করে অমনোযোগিতা, গাফলতি, অভ্যাসবশত আধুনিক যুগের কথামত টেপ রেকর্ডারের ন্যায় হয়ত এগুলো একজন কেবল আউড়ে যাচ্ছে। এমন অনেক ইবাদত আছে, যেগুলোর অত্যাবশ্যকতা সকলেরই জানা আছে, বিশেষ করে সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কার ও সওয়াবের কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে এই শর্তের কথাও বলা হয়েছে, সেই-ই কেবল তা পাবে যে ব্যক্তি পুরস্কারের আশা নিয়ে এবং এর য়াকীনসহ তা আদায় করবে। সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

আল্লাহ্র ওয়াদার ওপর য়াকীন ও প্রত্যয় রেখে এবং সওয়াব লাভের পোষণ করে যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার পেছনের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন।

১. হজ্জের মাসআলাসমূহ কার্যত হজ্জ করা ব্যতিরেকে আয়ত্তাধীন করা সাধারণের পক্ষে কঠিন।

আরো আছে ঃ

وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ۔

আল্লাহ্প্রদত্ত ওয়াদার ওপর য়াকীন প্রত্যয়সহ ও সওয়াবের আশা নিয়ে যে ব্যক্তি শব-ই-কদরের ইবাদত করবে, আল্লাহ্ তার পেছনের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ইবাদত হিসাবে করা ও অভ্যাসবশত করার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী এই শর্ত ও বিষয়টির প্রতি বেশি খেয়াল দেই না। ফলে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি আরকানসহ আমাদের বহু ইবাদতই একটা প্রথা, একটা রুটিন ওয়ার্কে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে, ঈমান ও ইহতিসাব[১]শূন্য নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

সাহাবা কিরাম, এই উম্মতের আওলিয়া, আল্লাহ্ওয়ালা উলামা ও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এই বিষয়টির নিরিখেই বিরাট ব্যবধান হয়ে যায়। এই সমস্ত আমলের ফযীলত তাঁদের সামনে সব সময়ই জাগরূক থাকত। এই সব আমল ও যিকর-আযকারে তাঁদের মধ্যে এমন ঈমান ও প্রত্যয়ী দশার সৃষ্টি করত যা মন-মগজ ছেয়ে যেত। এমন সাগ্রহ প্রেরণা ছিল তাদের, যা হৃদয়ের গভীরে ছাপ ফেলত। আল্লাহ্র দরবারে এগুলোর মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর অনুভূতি ও অতলান্ত উপলব্ধি নিয়ে তাঁরা এগুলো আদায় করতেন। যেমন ওযূর কথাই ধরা যাক। দিন ও রাতে বারবার বিষয়টি ঘটে থাকে। আমাদের অনেকেরই জীবনে একটি রুটিন ওয়ার্ক ও মেশিনী আনুষ্ঠানিকতায় আজ এই মহান ইবাদতটি পর্যবসিত। কিন্তু ঐ আল্লাহ্ওয়ালা বান্দারা যখন তা আদায় করতেন তখন তাদের সামনে রাসূল (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি সজীব ও জাগরূক থাকত ঃ

اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتْ مِنْ وَّجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهٖ مِنَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ

১. বুখারী শরীফে উল্লিখিত হযরত 'আব্দুল্লাহ্-ইব্ন আমর ইবনুল-আস বর্ণিত একটি হাদীসে ঈমান ও ইহতিসাব শব্দ দুটোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, চল্লিশটি আমল, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো কাউকে সাহায্য করার নিয়্যতে ছাগী দান করা; এর যে কোন একটি আমল যদি কেউ সওয়াবের আশায় মনে রেখে এবং এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্প্রদত্ত ওয়াদার ওপর বিশ্বাস রেখে করবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

الْمَاءِ اَوْ نَحْوُ هٰذَا وَ اِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّتِهِ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ -

মুসলিম বা কোন মু'মিন বান্দা যখন ওযূ করে আর সে যখন তার চেহারা ধোয় তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটাটির সাথে তার চেহারা থেকে সকল গুনাহ ঝরে যায় যা সে তার দু'চোখ দিয়ে করে ছিল। আর যখন হাত ধোয় তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটাটির সাথে তার হাত থেকে সকল গুনাহ ঝরে যায় যা সে হাত দিয়ে ধরে করেছিল। এমনিভাবে সে গুনাহ থেকে একদম পাক সাফ হয়ে বেরিয়ে আসে।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত কথায় ও খবরে তাঁদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যেমন তাঁরা তাঁদের চোখে তা প্রত্যক্ষ করছেন। প্রতিশ্রুতি, সওয়াবের আশা ও প্রেরণা নিয়েই তাঁরা সকল কাজ আঞ্জাম দিতেন। কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাতকালে তাঁরা যখন আনন্দ প্রকাশ করতেন, হাসতেন, তখনও তাঁদের মনে ঐ অবস্থা ও প্রেরণাই বিরাজ করত। ঐ প্রেরণা নিয়েই তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বীয় পেশা বা জীবনের অপরাপর কাজে-কর্মে লিপ্ত হতেন। যে কাজই তাঁরা করতেন, পুরস্কার, সওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই তাঁরা তা করতেন। ফলে তাঁদের ইবাদত ছিল আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও ইতা'আতের প্রতীক।

সওয়াব ও পুরস্কারের ইস্তিজহার বা সামনে জাগরূক রাখার অবস্থা যদি আমাদের হতো, আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, যিক্র-আযকার যদি ঈমান ও ইহ্তিসাব, প্রত্যয় ও পুণ্যের প্রেরণায় থাকত পরিপূর্ণ, প্রাণময়তা, হাকীকত ও তাৎপর্যময়তায় হতো ভরপুর, তা হলে যে সমস্ত কাজ আমরা করি, শৈশব থেকে যে সমস্ত কাজের অভ্যাস আমাদের হয়ে গেছে, সব যদি আমরা ইস্তিজহার ও ইহ্তিসাব, সওয়াবের আশা ও ফযীলতের কথা মনে জাগরূক রেখে আদায় করতে থাকি তবে তা আমাদের মাঝে অন্য এক আছর, অন্য ধরনের এক নূর পয়দা করত নিশ্চয়, এর স্পষ্ট আছর ও প্রভাব আমরা জীবনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে পারব ইনশাআল্লাহ্। এই জাগরূকতার সাগ্রহ প্রেরণা কেবল ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেই নয়, হালাল জীবিকা অর্জনে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য,

১. তিরমিযী শরীফ, মা-জাআ ফী ফাযলিত্-তুহূর।

কৃষিকর্ম ও অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের আসল নিয়ত হওয়া উচিত। কোন কোন হাদীসের কিতাবের মতানুসারে মুতাওয়াতির হিসাবে পরিচিত এবং ইমাম বুখারী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সংকলনটি নিয়ত সম্পর্কিত যে হাদীসটির মাধ্যমে সূচনা করেছেন সেই হাদীসটির প্রকৃত মর্ম এ-ই। হাদীসটি হলো ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَا لُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوٰى -

নিয়তের ওপরই আমল নির্ভর করে। যে নিয়ত করে তা-ই সে পায়।

যে সমস্ত হাদীস দীন ও ইসলামের বুনিয়াদ হিসাবে স্বীকৃত, এই হাদীসটি হচ্ছে সেগুলোর অন্যতম। হযরত ইমাম শাফি'ঈ বলেন ঃ এই হাদীসটি হচ্ছে জ্ঞানের তিন ভাগের এক ভাগ এবং ফিকহের সত্তরটি অধ্যায়ের সাথে এটি সম্পর্কিত।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সবচে' বড় ও অবিস্মরণীয় অনুগ্রহ ও ইহসান ও সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হচ্ছে এটিই; মানুষ নিয়ত এরই সন্ধানে ব্যাপৃত। একটা সহজ সরল, অথচ খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত ও গভীর অর্থবহ শব্দ 'নিয়্যত' বলে এটির চিত্র এঁকেছেন। হযরত রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَا لُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوٰى -

আমল নিয়তের ওপরেই করে নির্ভর। যে যা নিয়্যত করে তাই পায় সে।

সুতরাং কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ইখলাস, আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর চেতনা নিয়ে যে কাজ করা হবে তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন এবং ঈমান ও য়াকীনের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হবে। খালিস্ ও নির্ভেজাল দীন এ-ই, সকল প্রকার আবিলতার ছোঁয়াচ থেকে তা মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও যুদ্ধের আমল হোক বা রাজ্য পরিচালনা ও প্রশাসনের আমল হোক, আল্লাহ্‌প্রদত্ত দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ ভোগ করার বিষয় হোক বা নফসের, শরীয়ত অনুমোদিত চাহিদা পূরণের বিষয়, হালাল জীবিকা অর্জন ও চাকরী, পদবী হোক বা বৈধ বিনোদনের বিষয়, দাম্পত্য জীবনের সুখ ভোগ হোক বা অন্য কিছু—এই সব উক্ত নিয়্যতের আঙ্গিকে যখন হবে তখনই হবে তা দীন।

পক্ষান্তরে যে কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা থেকে খালি, আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ-এর, ঈমান ও তাঁরই ফরমাবরদারীর ধারণা থেকে হবে

শূন্য, অমনোযোগিতা, গাফলতি ও আখিরাত বিস্মরণের পর্দায় যে কাজ হবে আবৃত—তা ফরয সালাত বা হিজরত ও জিহাদ বা যিকর ও তাসবীহ–এমন কি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার মতো মহান আমল বা ইবাদত ও দীনী খেদমত হলেও দুনিয়াদারী বলেই আল্লাহ্‌র নিকট বিবেচ্য হবে। এ ধরনের অবস্থা নিয়ে যে কাজ করবে সে আলিম হোক বা মুজাহিদ, দীনের পথে অবস্থানকারী হোক বা দীন প্রচারক মুবাল্লিগ, এই ধরনের সকলকেই সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কোন মূল্য হবে না তার আমলের বরং আশংকা আছে, এই ধরনের আমল তার জন্য বিপদ ও আযাবের এবং আল্লাহ্ ও তাঁর মাঝে হিজাব ও আবরণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।[১]

দুনিয়াবাসীর প্রতি আখিরী নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমন অনুগ্রহের মধ্যে অন্যতম মহান অনুগ্রহ হলো দীন ও দুনিয়া বলতে যে বিরাট পার্থক্য ছিল মানুষের সে ধারণা তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এই দুটোকে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। দুটোকে কেবল আলাদা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি—এতদুভয়ের মাঝে বিরাট মোটা সীমারেখা টেনে রেখেছিল, গভীর ও অপূরণীয় ফাঁক সৃষ্টি করে রেখেছিল, এমন কি পরস্পরবিরোধী শত্রুভাবাপন্ন যুধ্যমান দুটো শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছিল। একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ও পরস্পরের যুদ্ধ ঘোষণা ছিল অত্যাবশ্যক। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পানি ও চিনির মতো দুটোকে একাকার করে মিশিয়ে দিলেন। একটি আরেকটির পরিপূরক, সহযোগী হিসাবে প্রেম-প্রীতির ডোরে উভয় দলকে বেঁধে দিলেন। সহঅবস্থানজনিত শান্তিময় পরিবেশে স্থান নেয়ার অবকাশ পেল প্রত্যেকেই। তিনি যেমন একত্ব ও ঐক্যের দূত, তেমনি বাশীর ও নাযীর, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীও। পরস্পর যুদ্ধরত এই দু' গ্রুপ থেকে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিয়ে তিনি তাদের ঈমান ও ইহ্‌তিসাব, প্রেম-প্রীতি, মনুষ্যত্বের প্রতি ভালবাসা ও দয়া এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণার একই কাতারে এনে দু'দলকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমাদের তিনি শিখিয়ে দিলেন অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যমণ্ডিত, গভীর মর্ম ও অর্থবহ মু'জিযানা এই দু'আ ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

হে আমাদের রব! দাও আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতে কল্যাণ। আর বাঁচাও আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে। [সূরা আল- বাকারা ঃ ২০১]

১. হাদীসগ্রন্থসমূহে এই বক্তব্যের সপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান। ইখলাস, নিয়ত, ঈমান ও ইহ্‌তিসাব বিষয়ক অধ্যায়গুলো দ্রষ্টব্য।

তিনি আরো ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য। [সূরা আল-আন্'আম ঃ ১৬২]

এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায়, মু'মিনের জীবন শ্রেণীবিভক্ত পরস্পরবিরোধী গ্রুপের সমষ্টির নাম নয়। এ একটি একক, ইবাদত ও ইহতিসাবের জীবনীশক্তি এর কোষে কোষে পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ্র ওপর ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়, তাঁর হুকুম-আহকামের ইতাআত ও আনুগত্য এর পথ প্রদর্শক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াকাণ্ডের ধারায় তা ব্যাপ্ত। তবে শর্ত হলো এসব ধরনের কাজে ইখলাস ও আন্তরিকতা, নিয়্যতের বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন আকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবহমান থাকতে হবে এবং আম্বিয়া কিরাম প্রদর্শিত পদ্ধতিতে তা আঞ্জাম দিতে হবে।

এতে বোঝা গেল, তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ একত্বের নবী, প্রীতি ও একতা, প্রেম ও মিলনের দূত, সাথে সাথে তিনি ছিলেন বাশীর ও নাযীর, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। দীন ও দুনিয়ার ব্যবধান ও পার্থক্যের ধারণা ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষের পুরাটা জীবন ইবাদতে ও গোটা বিশ্ব জাহানকে এক সুবিশাল ইবাদতগাহে পরিণত করে গিয়েছেন তিনি। পরস্পরবিরোধী বিভিন্নভাবে বিভক্ত শিবির থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে সৎ কর্ম, সৃষ্টির সেবা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের এক প্লাটফর্মে এনে সকলকে একত্র করে দিয়েছেন। এখানে দুনিয়ার পোশাকে দরবেশ, শাহী পরিচ্ছদের ভেতরে যাহিদ ও অনাসক্ত ফকীর, তসবীহ ও তলওয়ারের সমন্বয়ী, রাতের ইবাদতগুযার আর দিনের ঘোড়সওয়ার দৃষ্টিগোচর হয়। আর এতে কোনরূপ বৈপরীত্য ও ভেদ উপলব্ধি হয় না তাদের।

সাত. প্রতি দিনের জন্য কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের বিষয় যতটুকু তার পক্ষে নিয়মিত পাবন্দী করা সম্ভব, ততটুকু পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করে নেয়া উচিত। অসুস্থতা বা কঠিন কোন অসুবিধা ও ওযর ব্যতিরেকে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ তিলাওয়াত করা বাদ না দেয়। কুরআন করীম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

সামনে বা পেছনে কোন দিক থেকে এতে মিথ্যার আগমন ঘটতে পারে না। এ তো সুপ্রাজ্ঞ ও সকল প্রশংসার আধার মহান সত্তা কর্তৃক অবতীর্ণ।

[সূরা হামীম আস-সাজদা ঃ ৪২]

সুতরাং আল্লাহ্‌র এই কালামের তিলাওয়াতে যতটুকু সময়ই ব্যয় হোক না কেন, ততটুকুকে জীবনের কামাই এবং সৌভাগ্য ও বরকতের সবচেয়ে মূল্যবান সময় বলে বিশ্বাস করতে হবে। এই সময়টা নিজেকে আল্লাহ্‌র বহু নিকটবর্তী বলে ভাবা উচিত। আমাদের অবস্থা ও প্রভাব গ্রহণীয়তা এই পর্বতের চেয়ে যেন কোন অংশে কম না হয়, যে পর্বতের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

যদি আমি এই কুরআন কোন পর্বতের ওপর নাযিল করতাম তবে আপনি দেখতেন, এটি আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও চৌচির হয়ে পড়েছে।

[সূরা আল-হাশর ঃ ২১]

পাহাড় তো একটি স্থূল পদার্থ আর আমরা মানুষ তো আশরাফুল মাখলুকাত—সৃষ্টির সেরা! ঈমান দিয়ে ও কুরআনের মাধ্যমে সম্বোধন করার দাওয়াত দিয়ে অভিষিক্ত করেছেন তিনি এই জাতিকে। এই মনুষ্য জাতিরই কারো কারো অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

যখন তিলাওয়াত করে শোনানো হয় তাদের তাঁর (আল্লাহ্‌র) আয়াত, তখন ঈমান বৃদ্ধি পায় তাদের। আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা রাখে।

[সূরা আল-আনফাল ঃ ২]

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ـ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ـ ثُمَّ تَلِيْنَ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

আল্লাহ্ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম বচন, একটি কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরস্পর সাযুজ্যপূর্ণ, পুনরাবৃত্ত হয়েছে যেগুলো; কেঁপে ওঠে এতে শরীরের চামড়া তাদের যারা ভয় করে তাদের রবকে। অতঃপর কোমল ও নরম হয়ে পড়ে তাদের শরীর এবং হৃদয় ঝুঁকে পড়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে। [সূরা যুমার ঃ ২৩]

কুরআন থেকে উপকার লাভ ও জীবনের পরিধিতে এর প্রভাব পরিস্ফুট হওয়ার বিষয়ে পূর্বেকার আলিম ও ওলীদের মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁদের মধ্যে যে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের বেশ-কম দেখা যায়, তা কেবল কুরআনের মর্ম, তাৎপর্য ও এর রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার ফলশ্রুতিতে ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহ্‌র পূর্ণতা, পরাক্রমশীলতা, তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব, মানবীয় শক্তি অনুসারে উপলব্ধি এই কালামের বিপুল মর্যাদাবোধ, এর অলৌকিকতা, এর সুমহান সৌন্দর্য ও আকর্ষণের অপার্থিব মজা ও স্বাদ ভোগের ফলশ্রুতি।

এই ক্ষেত্রে দুটো জিনিস খুবই উপকারী ঃ

ক. কুরআনের ফযীলত, এর তিলাওয়াতের ফযীলত ও এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন, সওয়াব ও পুরস্কার, আখিরাতে যে সমস্ত নিয়ামত পাওয়া যাবে—এর জ্ঞান ও বিশ্বাস এবং সদা তা মনে জাগরূক রাখা।

খ. সাহাবা, তাবিঈন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, আল্লাহ্‌ওয়ালা উলামা ও আওলিয়া কিরামের তিলাওয়াত, কুরআন গবেষণা, কুরআনের ব্যাপারে তাঁদের আদব ও ভক্তি এবং এর প্রতি তাদের গুরুত্ব প্রদান সম্পর্কিত কাহিনীসমূহের অধ্যয়ন।[১]

অভিজ্ঞতা এর সাক্ষ্য দেয়, কুরআনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনও এই ক্ষেত্রে খুবই উপকারী হয়ে থাকে। কুরআনের সাথে আমাদের এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যেন এর ও আমার মাঝে কোন মানবীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শরাহ ও তাফসীর প্রাচীর হয়ে না দাঁড়ায়। ঐ সমস্ত মানবীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর যেন আমরা সীমাবদ্ধ না হয়ে পড়ি এবং ঐগুলোকে কুরআনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে না ফেলি যে, সেগুলো থেকে কুরআনকে আলাদা করা ও সকল ধরনের প্রভাবমুক্ত মন নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন মুশকিল হয়ে পড়ে, বিশেষ করে পরবর্তী যুগের আলিমগণ যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন সে আলোকে যেন আমরা কুরআন বুঝতে ব্যাগ্র না হয়ে পড়ি।

কারো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, নিজস্ব আবেগ ও আকর্ষণের প্রতিবিম্ব সমকালীন যুগের পরিবেশ ও চিন্তাধারার প্রভাব কুরআন করীমের গুরুত্ব, সৌন্দর্য, এর মহত্ত্ব, অলৌকিকতা, এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশুদ্ধতাকে আচ্ছাদিত করে ফেলতে চায়, যেমন ঝর্ণার পরিষ্কার টলটলে পানির ওপর ঘন গাছের ছায়া পড়ে

১. এই বিষয়ের বিশেষ করে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের শাগরিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর মিরওয়াযী বাগদাদীর রচিত কিয়ামুল-লায়ল ও হযরত মওলানা যাকারিয়া (রা)-এর ফাযাইল কুরআনের অধ্যয়ন উপকারী হবে।

তাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। ফলে পাঠক কুরআন করীমের সৌন্দর্য ও মাধুরী দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার সাথে সাথে বিশেষ তাফসীর ও তাফসীরকারের ব্যক্তিত্ব ও কুরআনের মর্ম উদ্‌ঘাটনে তার শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিভা দ্বারাও অবচেতনভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠতে থাকে।

তবে সহীহ্ হাদীস বা সাহাবা কিরাম ও ইমামগণের বরাতে কুরআন করীমের কঠিন শর্তাবলীর অর্থ হিসাবে বা কোন কোন জটিল আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সমস্ত তাফসীর বর্ণিত আছে তা অবশ্য আমার পূর্বোল্লিখিত নীতির ব্যতিক্রম। এমনিভাবে কুরআন করীমের গভীর একাডেমিক অধ্যয়নকারী ও গবেষণাকর্মী, বিশেষ করে অনারব পাঠকের গবেষণার ক্ষেত্রে যে সমস্ত কুরআনিক অভিধান ও তাফসীরের প্রয়োজন পড়ে সেগুলোও আমার উক্ত নীতির মধ্যে শামিল নয়। কুরআন করীমের মাধুরী আস্বাদনের জন্য পুরো কাকুতি ও বিনয়ের সাথে এর মহত্ত্ব ও মর্যাদাবোধের সাথে সাথে এই কালামের মূল অধিকারী আসল কথক আল্লাহ্ রাব্বুল-ইয্যতের মহান গুণাবলী জাগরূক রেখে এর তিলাওয়াত করতে হবে।

তাফসীর বিশেষজ্ঞ উলামা, তাফসীর বিষয়ে বই-পুস্তক, অভিসন্দর্ভ রচনাকারী বা এর অধ্যাপনা ও গবেষণায় লিপ্ত বিশেষজ্ঞবর্গ এবং তাফসীর সম্পর্কে যাঁরা সবিশেষ, বিস্তারিত ও গভীর অধ্যয়ন করতে চান তাঁরাও আমার উক্ত কথার ব্যতিক্রম। তবে হ্যাঁ, কুরআনের প্রত্যেক পাঠকের জন্য এই ধরনের বিস্তারিত অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই।

আট. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক ও ভালবাসা আরো মযবুত করার জন্য, তাঁর মুহব্বত আরো বৃদ্ধির জন্য ও তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য হাদীস গ্রন্থসমূহ, শামাইল ও সীরাতের ওপর লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ ও এর আলোচনা খুবই উপকারী। দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি হলো যার সাথে যার ভালবাসা হয় সে তার বারবার আলোচনা করে, তার স্মরণ করে থাকে। এমনিভাবে কেউ যদি কারো আলোচনা বেশিভাবে করে, কারো জীবনের অবস্থা জানার জন্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, তবে তারও ভালবাসার বিরাট এক হিস্যা লাভ হয়। যে সমস্ত দিলওয়ালা বুযুর্গ রাসূলপ্রেমের বিরাট হিস্যার অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁদের জীবনেতিহাস ও কাহিনীও এক্ষেত্রে অনেক উপকারী হয়ে থাকে। এই ধরনের নবী-প্রেমে মাতোয়ারা আল্লাহ্ওয়ালাদের অবস্থা, তাঁদের মালফুজাত ও বাণী, তাঁদের রচিত না'ত ও কবিতা পাঠ নবীর প্রতি ভালবাসা ও মুহব্বত সৃষ্টিতে আশ্চর্য ধরনের কার্যকারিতা রাখে; যদি

কারো মাঝে প্রেমের বীজ থেকে থাকে তবে ঐ সমস্ত বিষয় তো লালন ও বর্ধনে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে।[১]

অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠও এই ক্ষেত্রে খুব উপকারী। কুরআন করীমে দরূদ শরীফ পড়ার অত্যন্ত তাগিদ এসেছে এবং এই বিষয়ে খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতারা এই নবীর ওপর দরূদ প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।

[সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ـ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার ওপর দশবার রহমত করেন। [মুসলিম শরীফ]

আরও ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً ـ

যে ব্যক্তি আমার ওপর অধিক দরূদ পড়বে সে-ই কিয়ামতের দিন আমরা সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকবে। [তিরমিযী শরীফ]

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার অপরাপর যিকর-আযকার বাদ দিয়ে কেবল আপনার ওপর দরূদ পড়ব কি? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন ঃ

---

১. এই ক্ষেত্রে কাযী ইয়ায রচিত আশ্-শিফা ফী হুকূকিল মুস্তাফা, ইব্ন কায়্যিম রচিত জিলা' উল-আফহাম, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রচিত খুতবাতে মাদরাস, কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান সাহেব মনসূরপুরী রচিত রাহমাতুল-লিল-আলামীন, মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গীলানী রচিত আন্নাবীউল-খাতিম-এর অধ্যয়ন খুবই উপকারী। মদীনা শরীফ ও মসজিদে নববীর জয্বায় যে সমস্ত পুস্তক রচিত হয়েছে, যেমন লেখকের কারওয়ানে মাদীনা, সেই ধরনের পুস্তক-পুস্তিকাও আগ্রহ ও প্রেম বৃদ্ধিতে সহায়ক। শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত না'ত ও প্রশংসাসূচক কবিতাও এই বিষয়ে খুবই কার্যকরী প্রভাব রাখে। উদাহরণস্বরূপ, জামী ও কুদসীর ফার্সী না'তসমূহ, মুহসীন কাকুরী, ইকবাল, জাফর আলী খান (কাজী নজরুল, ফররুখ আহমদ –অনুবাদক) প্রমুখ রচিত না'তগুলো পাঠ করা যায়। তবে প্রশংসার বাড়াবাড়ি পরিত্যাজ্য। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ থেকে নিষেধ করেছেন।

হ্যাঁ, তা পড়। এতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সকল পেরেশানী বিদূরিত করে দেবেন এবং তোমার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

নয়. কিছু বিশেষ বিশেষ যিকর ও ওয়াজীফাও পাঠ করা দরকার। যিকর দ্বারা সর্বদা আমাদের যবান আর্দ্র রাখা উচিত। বিশেষ বিশেষ সময় ও স্থান সম্পর্কে যে সমস্ত দু'আর উল্লেখ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে সেগুলোরও পাবন্দী করা দরকার।

দশ. যে সমস্ত আল্লাহ্ওয়ালা, আলিম, আওলিয়ায়ে কিরাম ও ইখলাসের অধিকারী ও অল্পে তুষ্ট, আইসা-এ-দ্বীনের আকীদা ও সুন্নতের পরিপূর্ণ ইত্তিবা, কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান, নফস ও শয়তানের চক্রান্ত ও ধোঁকা সম্পর্কে তাঁদের অবহিতি ও সজাগ থাকা, আখিরাতে উপকারী বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ও ফিকর সম্পর্কে এই উম্মত একমত॥সেই সমস্ত আলিম, বুযুর্গ ও ইমামগণের জীবনী ও ইতিহাস পাঠ করা আমাদের উচিত। প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ সমালোচক হযরত আল্লামা ইবনুল জাওযী তৎ প্রণীত 'সায়দুল খাতির' গ্রন্থে লেখেন ঃ

"আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি ফিক্হ অর্জন বা হাদীস শ্রবণের মাঝে লিপ্ত থাকা কলব ও অন্তরের বিশুদ্ধতা অর্জন ও এর সংশোধনের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এর উপায় হলো, এগুলোর সাথে সাথে পূর্ববর্তী ওলী ও আল্লাহ্ওয়ালা আলিমগণের জীবনী ও তাঁদের প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনাবলীও অধ্যয়ন করা। হারাম ও হালালের কেবল জ্ঞান হৃদয়ের কোমলতা ও আর্দ্রতা সৃষ্টিতে খুব বেশি কার্যকরী হয় না। আওলিয়া ও উলামার জীবনী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী কাহিনী ও ঘটনাবলীই হৃদয়ে কোমলতা ও আর্দ্রতা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা হাদীস ও কুরআনের যে মূল উদ্দেশ্য তা তাঁদের জীবনে বাস্তবায়িত ছিল এবং তা অর্জনে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। শরীয়তের হুকুম-আহ্কামের ওপর তাঁদের আমল বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ছিল না, বরং এর মূল মিযাজ ও তাৎপর্য, প্রকৃত মর্ম ও সার-নির্যাস তাঁরা লাভ করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই আমি এই মন্তব্য করছি। উচ্চ সনদ ও অর্জিত হাদীস সংখ্যার আধিক্য লাভের পেছনে সাধারণভাবে মুহাদ্দিস ও হাদীস শিক্ষার্থীদের গোটা লক্ষ্য ব্যয় করতে আমি দেখেছি। এমনিভাবে ফকীহদেরও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে তর্কবিদ্যা ও বিপক্ষকে হারিয়ে দেয়ার বিদ্যা লাভ করা। এই ধরনের শিক্ষা দ্বারা হৃদয়ে কেমন করে কোমলতা, আর্দ্রতা ও ভয় সৃষ্টি হতে পারে? সলফে সালেহীন ও আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ ইল্ম বা জ্ঞানের জন্য নয়, অনেক সময় শুধু আচার-ব্যবহার ও রীতি-পদ্ধতি দেখার জন্য, শেখার জন্য কোন নেক আল্লাহ্র ও ওলীর খেদমতে

যেতেন। কারণ এই সমস্ত বাস্তব আচার-আচরণ ও রীতি-পদ্ধতিই জ্ঞানার্জনের আসল ফলশ্রুতি। এই বিষয়টি ভাল করে তোমরা বুঝে রাখ, হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সলফে সালেহীন, মহান পূর্বসূরী, যাহিদ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বুযুর্গদের জীবনেতিহাসের অধ্যয়নও করতে থাকবে। এতে তোমাদের অন্তরে কোমলতা ও আর্দ্রতা আসবে।"

তিনি আরো লেখেন ঃ

"আমি সুপ্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত আওলিয়া ও মহান পূর্বসূরিদের প্রত্যেকের জীবনী, সুলুক ও আচার-আচরণ সম্পর্কে এক-একটি পুস্তক লিখেছি। হযরত হাসান বসরী, সুফিয়ান সওরী, ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম, বিশর হাফী, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, মা'রূফ কারখী প্রমুখ আল্লাহ্‌ওয়ালা আলিম ও যাহিদগণের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। আসল লক্ষ্য ও চরম কাম্য বস্তু লাভ আল্লাহ্‌র দেয়া তওফীকেই কেবল হয়ে থাকে। ইল্‌মের কর্মী দ্বারা সহীহ আমল হতে পারে না। উভয়ের সম্পর্ক হলো সায়েক (যে পেছন থেকে কাফিলা হাঁকিয়ে নিয়ে যায়) ও কায়েদ (সামনে থেকে যে টেনে নিয়ে যায়)-এর ন্যায়। এই উভয়ের মাঝে নফ্‌স আপন স্থান থেকে নড়তেও চায় না। হ্যাঁ, কায়েদ ও সায়েক উভয়ে যদি তৎপর থাকে তবে মনযিল অতিক্রান্ত হয়ে যেতে থাকে। সকল অলসতা ও উদাসীনতা থেকে আল্লাহ্‌রই পানাহ চাই।"[১]

এই সব সত্য ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ ও দীন প্রচারকদের সম্পর্কে অন্ততপক্ষে আমাদের মনে কোনরূপ কুধারণার জন্ম না হওয়া উচিত। এঁদের হাতেই দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। দীন ও ইসলামের হাকীকত ও সার এঁদের মধ্যেই ছিল বিরাজিত। সুতরাং তাঁদের এই সব ইহসান ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান, তাঁদের জন্য দু'আ, তাঁদের সুনাম কীর্তন, তাঁদের পক্ষ থেকে সমালোচনার জবাব প্রদান, তাঁদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য ও বৈশিষ্ট্য হওয়া দরকার। সৎ ও যোগ্য উত্তরসুরিদের প্রশংসা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ ۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

১. সায়দুল খাতির-২ ঃ ৩০২, ৩০৩।

যারা এসেছে এঁদের পরবর্তীতে তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের মাফ করুন এবং আমাদের সেই সব ভাইকেও মাফ করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে, আমাদের মনে মু'মিনদের সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ ভাব রাখতে দেবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত মেহেরবান, খুবই দয়ালু। [সূরা আল-হাশর ঃ ১০]

আয়াতটি এই কথাটি তুলে ধরছে এই উম্মতের পূর্বসূরীদের সম্পর্কে এবং ঈমান ও সৎ কর্মে যাঁরা অগ্রবর্তী তাদের বিষয়ে যেন আমরা মন্তব্য করতে খুবই সতর্ক থাকি। কুরআনী আদব ও নবুবী শিক্ষাও এই, কোন মুসলিম সম্পর্কে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য করতে যেয়ে আমরা যেন পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করি। এই বিষয়ে যেন আমরা তাড়াহুড়া বা উত্তেজনার শিকার না হয়ে পড়ি! দিনের মতো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত, নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সন্দেহাতীত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারো সম্পর্কে যেন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বসি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا ۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ـ

মু'মিনগণ! কোন ফাসিক ও অন্যায়কারী যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা এর খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করবে। এমন যেন না হয় অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের তোমরা ক্ষতি করে ফেলবে। ফলে তোমাদের কৃতকর্মের ওপর তোমরা লজ্জিত হবে।

[সূরা আল-হুজুরাত ঃ ৬]

এগার. আমাদের জীবনের কর্তব্য-কর্মগুলোর মধ্যে দাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের জন্যও একটা অংশ রাখা আবশ্যক। এই দাওয়াত ও তাবলীগই ছিল আম্বিয়া-কিরাম প্রেরণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আর এই উদ্দেশেই তো আসমানী কিতাবসমূহ হয়েছে অবতীর্ণ এবং এই উম্মতের করা হয়েছে আবির্ভাব। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য হয়েছে তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ আর ঈমান আন আল্লাহ্তে। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০]

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্যে এমন একদল হতে হবে যারা মঙ্গলের দিকে ডাকে আর সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

[সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৪]

তবে দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের বিশেষ কোন আঙ্গিক বা নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্র বা নির্ধারিত কোন এমন পদ্ধতি সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়নি যার পরিবর্তন, পরিবর্ধন সম্ভব নয় বা যা থেকে সরে আসা জায়েয নয়, বরং এ হলো এমন দীনী কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহের অন্যতম যার কোন বিশেষ একটা পথ ও পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসে নির্ধারিত করে দেওয়া হয় নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি হিসাবে এর জন্য যে কোন জায়েয পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।[১]

হযরত নূহ 'আলায়হি সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا -

আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন সমানে ডেকেছি। [সূরা নূহ ঃ ৫]

আরো বলেন ঃ

ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا -

অতঃপর গোপন ও প্রকাশ্য সব ধরনে আমি তাদের জানিয়েছি, বুঝিয়েছি। [সূরা নূহ ঃ ৯]

কুরআন করীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

হে নবী! ডাকুন আপনি আপনার রবের পথে হিকমতের সাথে এবং সুন্দর নসীহতের মাধ্যমে। [সূরা আন্-নাহল ঃ ১২৫]

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের হুকূকুদ-দাওয়াত ও সিফাতু দু'আত এবং তাবলীগ ও দাওয়াত কী মু'জিযানা উসলূব। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত কাঠামোর যত কাছাকাছি হবে, তত বেশি এর দরজা বুলন্দ হবে সন্দেহ নেই।

আমাদের আরেকটি প্রধান কর্তব্য ও দীনী দায়িত্ব হলো॥রাজ্য, সমাজ, জাতি॥সমস্ত পর্যায়েই অপরাপর মুসলিমদের অবস্থার চিন্তা, তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আনন্দ ও নিরানন্দ॥সব কিছুতে যেন নিজেদের শরীক রাখি। কোন পর্যায়েই যেন তাদের সাথে আমাদের শরীকানা লুপ্ত না থাকে। যেখানেই থাকি না কেন, গোটা ইসলামী পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ-অনুভূতির সাথে যেন আমরা শামিল থাকি। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

পরস্পর দয়া, ভালবাসা ও সহমর্মিতায় মুসলিমদের উদাহরণ একটি শরীরের মত। কোন একটি অঙ্গ যদি অসুস্থ হয় তবে অনিদ্রা ও জ্বর সর্বক্ষেত্রেই সমস্ত অঙ্গ তাতে শরীক থাকে। [বুখারী, মুসলিম]

যে সমস্ত কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় মুসলিম সমাজ আজ নিপতিত, আমাদের প্রত্যেককে যেন তা অস্থির করে তোলে। যে সমস্ত নিপীড়ন, নির্যাতন ও কেবল দীনের খাতিরে যে ধরনের পাশবিক অত্যাচার ও হত্যার তারা শিকার–এর চিন্তা যেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে বিষিয়ে তোলে। আমাদের দীনী আত্মমর্যাদাবোধ ও ইসলামী চেতনাবোধ যেন জাগ্রত হয়! ভ্রাতৃসুলভ ও ইসলামী দায়িত্ববোধক কর্তব্য সম্পাদনে আমরা প্রত্যেকেই যেন সামর্থ্যানুযায়ী এগিয়ে আসি।

আল্লাহ্‌র আওয়াজ ও কলেমাকে বুলন্দ করে ধরার পথে, আল্লাহ্‌র দীন বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করার পথে, দীনের উদ্দেশ্যাবলীকে বাস্তবায়নের জন্য, শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের প্রচলনের পথে এবং এই পথের বাধাসমূহ দূর করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার এমন একটা শক্তি হিসাবে, যেন আমাদের উত্থান ঘটে এবং এর ভীতি ও সম্ভ্রম, ক্ষতি ও কল্যাণ সাধনে এর পারঙ্গমতা সুস্পষ্টভাবে সকলের কাজে অনুভূত হতে থাকে। পরিণামে আল্লাহ্‌র যমীনে আমাদের পা যেন সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যায় এবং সকল ফিত্‌না ও ফাসাদ, বাতিল ও অন্যায়কে সমূলে উৎখাত করে দূরে নিক্ষেপ করে দিতে যেন আমরা সক্ষম হয়ে উঠি। আর সকল আনুগত্য ও ফরমাবরদারী যেন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই প্রতিষ্ঠিত থাকে।

حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

শেষে কোন ফিতনা ও কুফরী যেন আর অবশিষ্ট না থাকে এবং দীন সর্বতোভাবেই যেন হয়ে যায় আল্লাহ্‌র। [সূরা আনফাল ঃ ৩৯]

বার. শেষ কথা হলো, হৃদয়ে কোমলতা ও আর্দ্রতা সৃষ্টিতে এবং শরীয়ত যেভাবে চায় সেভাবে দুনিয়াতে যুহ্‌দ ও তাকওয়া, অনাসক্তি ও আল্লাহ্‌ভীতির জীবন যাপন করতে, আখিরাতের জন্য উপকারী বিষয়সমূহে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে এবং লম্বা লম্বা ও সুদীর্ঘ আশা-কল্পনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে যে জিনিসটি সবচেয়ে উপকারী ও প্রভাবশীল তা হলো দুনিয়ার নশ্বরতার ধারণা ও মৃত্যুর চিন্তা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ـ

তোমরা বেশি করে স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুর চিন্তা কর।[১]

প্রতিদিন কিছু না কিছু সময় মৃত্যুর মুরাকাবা ও ধ্যান করা উচিত। খাতিমা বিল-খায়র ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর ভাবনা থাকা কর্তব্য। কারণ শেষ পরিণাম ও খাতিমা বিল খায়রের ওপরই আসলে মর্যাদা ও মুক্তি নির্ভরশীল। এই উম্মতের যে সমস্ত আওলিয়া, আরিফীন, বিদগ্ধ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের দীনি দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁদের মর্যাদা, উচ্চ মরতবা ও জনপ্রিয়তার সর্বজনস্বীকৃত, যাঁদের কারামত ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সকলের মুখে মুখে, সকলের সামনেই যাঁদের প্রশংসা ও গুণাবলী কীর্তিত, সেই সমস্ত আল্লাহ্‌ওয়ালা সত্তার খাতিমা বিল-খায়র ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর চিন্তা এত প্রবল ছিল যে, এ-ই যেন ছিল তাঁদের সকল চিন্তা-ভাবনার মূল কেন্দ্রবিন্দু! এ-ই তাঁদের সব সময় ব্যস্ত করে রাখত। নেক আমল সম্পাদন বা মানুষের ভক্তি ও সুধারণার ওপর তাঁদের কোন গর্ব ছিল না, নিজের মুজাহাদা, সাধনা ও পরিশ্রমেরও কোন ভরসা তাঁরা রাখতেন না। তাঁদের সামনে ও সমক্ষে সব সময়ের জন্য ছিল এই হাদীসটি ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَنْجِىَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهٗ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ سَدِّدُوْا وَ قَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَىْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا ـ

১. তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে এটি হাসান সহীহ্ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কাউকেই তার নেক আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকেও পারবে না? তিনি উত্তরে দিলেন ঃ হ্যাঁ, আমাকেও পারবে না, যদি না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে না দেন। সোজা ও সঠিক পথে চলতে থাক, নিকটবর্তী হয়ে থাক। সকাল-সন্ধ্যা আর রাতের কিছু অংশেও (আল্লাহ্‌র রাহে) চলতে থাক। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, তোমরা (সব সময়ই) মধ্যপন্থা আঁকড়ে থেকো। মনযিলে মকসুদে পৌঁছে যেতে পারবে।[১]

হুসনে খাতিমা ও শুভ পরিণামের আবদেনসম্বলিত এই হাদীসটি এই গ্রন্থটির জন্য শুভ শেষ হিসাবে পরিবেশিত হোক, এই মুনাসিব বলে মনে হয়।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ لِلسَّدَادِ وَالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ ـ

---

১. বুখারী শরীফ, কিতাবুর রিকাক, বাবুল কাসদি ওয়া মুদাওয়ামাতে আলাল আমল।